INTERMEDIATE BENGALI SELECTIONS

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মিত্রতা

সঙ্গলাভের বাসনা আমাদেব স্বভাব-সিদ্ধ এবং সমস্ত সদ্‌গুণ আমাদের আদরণীয়। কাহারও কোন সদ্‌গুণ সন্দর্শন করিলে তাহার প্রতি অনুরাগ-সঞ্চার হয়, এবং অনুরাগ-সঞ্চার হইলেই তাহার সঙ্গলাভ করিবার বাসনা উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে এক জনের প্রতি অন্য জনের শ্রদ্ধা ও প্রীতির উদ্রেক হইতে পারে; কিন্তু উভয়ের সমান ভাব না হইলে প্রকৃতরূপ বন্ধুত্ব-ভাবের উৎপত্তি হয় না। সমান ভাব ও সমান অবস্থা সদ্ভাব-সঞ্চারের মূলীভূত। এই হেতু বালকের সহিত বালকের, যুবার সহিত যুবার এবং প্রাচীনের সহিত প্রাচীন ব্যক্তির সৌহৃদ্য-ভাব সহজে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। এই হেতু পণ্ডিতের সহিত পণ্ডিত লোকের, অজ্ঞের সহিত অজ্ঞ লোকের, সাধুর সহিত সাধু লোকের এবং অসাধুর সহিত অসাধু লোকের মিত্রতা-ভাব অক্লেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই হেতু ধনীর সহিত ধনী লোকের, দুঃখীর সহিত দুঃখী লোকের এবং মধ্য-বিত্তের সহিত মধ্য-বিত্ত লোকের অপেক্ষাকৃত অধিক

সৌহৃদ্য সংঘটিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ মানসিক প্রকৃতির সাম্যভাবই বন্ধুত্ব-গুণোৎপত্তির প্রধান কারণ। যে সমস্ত সুচরিত্র ব্যক্তির মনোবৃত্তি একরূপ হয়, সুতরাং এক বিষয়ে প্রবৃত্তি ও এক কার্য্যে অনুরক্তি জন্মে, তাহাদেরই পরস্পর প্রকৃতরূপ মিত্রতা-লাভের সম্ভাবনা।

কিন্তু মেদিনী-মণ্ডলে দুই ব্যক্তির সর্ব্ববিষয়ে সমান হওয়া সম্ভব নয়। যাহাদের জ্ঞান সমান, তাহাদের অবস্থা সমান নয়। যাহাদের অবস্থা সমান, তাহাদের ধর্ম্ম সমান নয়। যাহাদের ধর্ম্ম সমান, তাহাদের প্রবৃত্তি সমান নয়। যাহাদের প্রবৃত্তি সমান, তাহাদের সম্পত্তি সমান নয়। অনৈক্য-ঘটনার এইরূপ অশেষবিধ হেতু বিদ্যমান থাকাতে এক ব্যক্তির সহিত অন্য ব্যক্তির সমস্ত বিষয়ে মিলন হয় না, সুতরাং সম্পূর্ণরূপে সৌহৃদ্য-ভাবও উৎপন্ন হয় না। যে বিষয়ে যাহাদের অন্তঃকরণের ঐক্য হয়, তাহাদের সেই বিষয় অবলম্বন করিয়া সদ্ভাব হইতে পারে, এবং যে পর্য্যন্ত অন্য বিষয়ে বৈষম্যভাব উপস্থিত না হয়, সে পর্য্যন্ত সেই সদ্ভাব স্থায়ী হইতে পারে। যাহার সহিত কিয়ৎ বিষয়ে ঐক্য হয়, আমরা এ সংসারে তাঁহাকেই বন্ধুত্ব-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মনের ক্ষোভ নিবারণ করি। এরূপ বন্ধুও অতি দুর্লভ।

আমরা যাদৃশ বন্ধু-লাভের নিমিত্ত ব্যাকুল হই, যদিও তাদৃশ বন্ধু ধরণী-মণ্ডলে নিতান্ত দুর্লভ, তথাচ বন্ধু-ব্যতিরেকে জীবিত থাকা দুঃসহ ক্লেশের বিষয়। জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত-শিরোমণি বেকন্ উল্লেখ করিয়াছেন, বন্ধু-ব্যতিরেকে সংসার একটি অরণ্যমাত্র! অপর এক মহাত্মা (সিসিরো) নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বন্ধুহীন জীবন আর সূর্য্য-হীন জগৎ উভয়েই তুল্য। তৃতীয় এক ব্যক্তি (হিতোপদেশ-কর্ত্তা)

লিখিয়া গিয়াছেন, সংসার-রূপ বিষ বৃক্ষে দুইটি সুরস ফল বিদ্যমান আছে—কাব্যরূপ অমৃত-রসের আস্বাদন ও সজ্জনের সহিত সমাগম। যিনি দুঃখের হস্তে পতিত হইয়াও বন্ধুজনের দর্শন পান, দুঃখ কি কঠোর পদার্থ—তিনি তাহা অবগত নহেন। যিনি বন্ধুগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সম্পৎ-সুখ সম্ভোগ করেন, বন্ধু-ব্যতিরেকে বিষয়-সম্পত্তি কেমন অকিঞ্চিৎকর, তাঁহাও তাহার প্রতীত হয় না। বন্ধু-শব্দ যেমন সুমধুর, বন্ধুর রূপ তেমনি মনোহর। বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাপিত চিত্ত শীতল হয়, এবং বিষণ্ণ বদন প্রসন্ন হয়। প্রণয়-পবিত্র সচ্চরিত্র মিত্রের সহিত সহবাস ও সদালাপ করিয়া যেমন পরিতোষ জন্মে, তেমন আর কিছুতেই জন্মে না। তাঁহার সহিত সহসা সাক্ষাৎকার হইলে, কি জানি কি নিমিত্ত শোক-সন্তপ্ত সুদুঃখিত ব্যক্তিরও অধরযুগলে মধুর হাস্যের উদয় হয়। দীর্ঘকাল অনশনের পর অন্ন ভোজন করিলে যেরূপ তৃপ্তি জন্মে, পিপাসায় শুষ্ক-কণ্ঠ হইয়া সুশীতল জল পান করিলে যেরূপ সুখানুভব হয়, এবং তপন-তাপে তাপিত হইয়া সুবিমল সুস্নিগ্ধ সমীরণ সেবন করিলে, অঙ্গ-সন্তাপ দূরীকৃত হইয়া যেরূপ প্রমোদলাভ হয়, সেইরূপ প্রিয় বন্ধুর সুমধুর সান্ত্বনা-বাক্য-দ্বারা দুঃখিত জনের মনের সন্তাপ অন্তরিত হইয়া সন্তোষসহ প্রবোধ-সুধার সঞ্চার হয়।

বন্ধুত্ব-গুণের প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। উহা এমন মনোহর বিষয় যে, শত শত গ্রন্থকার উহার মাধুর্য্য ও মনোহারিত্ব বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিন্তু কেহই তদ্বিষয়ে মনের ক্ষোভ নিবারণ করিতে সমর্থ হন নাই। ফলতঃ এ স্থলে আমাদের মিত্রতা-ঘটিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিবরণ করা যত আবশ্যক মিত্রতার গুণ বর্ণনা করা তত আবশ্যক নয়। কাহারও সহিত মিত্রতা-সূত্রে বদ্ধ হইবার

সময়ে কিরূপ অনুষ্ঠান করা উচিত ; তৎপরে যতকাল তাঁহার সহিত মিত্রতা থাকে ততকাল কিরূপ আচরণ করা বিধেয় ; পরিশেষে যদি বিচ্ছেদ ঘটে, তাহা হইলেই-বা কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য,—এই ত্রিবিধ কর্ত্তব্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ক্রমে ক্রমে লিখিত হইতেছে।

প্রথমতঃ, জ্ঞানবান্ সচ্চরিত্র ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের সহিত মিত্রতা করা কর্ত্তব্য নয়। সাধু-সঙ্গ যেমন গুণকারী, অসাধু-সঙ্গ তেমনি অগুণকারী—ইহা প্রসিদ্ধই আছে। বন্ধুর দোষে আমাদের চরিত্র দূষিত হয়। আমরা যে ব্যক্তিকে একান্ত ভালবাসি ও যাঁহার সহিত সর্ব্বদা সহবাস করি, তাঁহার দোষ-সমুদায়কে দোষ বলিয়া বিবেচনা করি না ; প্রত্যুত, তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া তদনুরূপ অসদাচরণ করিতেই প্রবৃত্ত হই। তাঁহার দোষ-সমুদায় আমাদিগের এমন অক্লেশে অভ্যাস পায় যে, জানিতেও পারি না—কিরূপে অভ্যাস হইল। অতএব যখন আমাদের গুণাগুণ ও সুখদুঃখ মিত্রের গুণাগুণের এত সাপেক্ষ, তখন যে ব্যক্তিকে সচ্চরিত্র ও সদ্বিবেচক বলিয়া নিশ্চয় না জানা যায়, তাঁহার সহিত মিত্রতা করা কোনরূপেই শ্রেয়স্কর নয়। যাঁহার বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি উভয়ই বলবতী, তাঁহারই সহিত মিত্রতা করা কর্ত্তব্য।

মিত্রের দোষে চিরজীবন দুঃখ পাইবার সম্ভাবনা এবং মিত্রের গুণে চিরজীবন সুখী হইবার সম্ভাবনা। যে দুষ্কর্ম্মশালী দুঃশীল ব্যক্তির সহিত কিছুদিন মিত্রতা থাকিয়া বিচ্ছেদ হইয়া যায়, তাহারও সেই অল্প কালের সংসর্গ-দোষে আমাদের চরিত্র এমন দূষিত হইতে পারে যে, জন্মের মত দোষী থাকিয়া, অশেষবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়া কালহরণ করিতে হয়। যদি কিয়ৎক্ষণ হাস্য-কৌতুক ও প্রমোদ-সম্ভোগমাত্র বন্ধুত্ব-করণের উদ্দেশ্য হইত,

তবে কেবল পরিহাস-পটু সুরসিক ব্যক্তি দেখিয়া তাঁহারই সহিত বন্ধুত্ব করিতাম। যদি কাহারও নিকট কিছু সাংসারিক উপকার-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে শিষ্টতা ও সৌজন্য-প্রকাশমাত্র বন্ধুত্ব-করণের প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে কেবল উদার-স্বভাব ঐশ্বর্য্যশালী অথবা ক্ষমতাপন্ন পদস্থ ব্যক্তি দেখিয়া তাঁহারই সহিত বন্ধুত্ব করিতাম। যদি লোক-সমাজে মান্য লোকের মিত্র বলিয়া গণ্য হওয়া বন্ধুত্ব-করণের অভিসন্ধি হইত, তাহা হইলে কোন লোক-মান্য বিখ্যাত ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব করিবার জন্য, অথবা লোকের নিকট তাঁহার বন্ধু বলিয়া কথঞ্চিৎ পরিচিত হইবার নিমিত্ত অশেষমত চেষ্টা পাইতাম। কিন্তু যদি মিত্রের সহিত মিত্রের মনোমিলনের নাম মিত্রতা হয়, যদি মিত্রের ক্লেশে ও মিত্রের বিপদে বিপন্ন হওয়া বিধেয় হয়, যদি মিত্রের দোষ গোপন করিয়া সুস্পষ্ট পক্ষপাতদোষে দূষিত হওয়া আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ হয়, যদি পাপিষ্ঠ মিত্রের সংসর্গবশতঃ পাপকর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অনুরক্তি হওয়া সম্ভাবিত হয়, যদি বন্ধুজনের কদাচার-জনিত কলঙ্ক শুনিয়া লজ্জিত ও সন্তপ্ত হওয়া অকপট-হৃদয় সুহৃদ্বর্গের প্রকৃতি-সিদ্ধ হয়, তবে কাহারও সহিত মিত্রতা-গুণে বদ্ধ হইবার পূর্ব্বে, তাঁহার গুণ ও চরিত্র যত্নপূর্ব্বক নিরূপণ করা কর্ত্তব্য, তাহার সন্দেহ নাই। যিনি তোমার সহিত আত্মীয়তা করিবার বাসনা করেন, তিনি আপনি আপনার আত্মীয় কি না, বিচার করিয়া দেখ।

ধরণী-মণ্ডলে ধর্ম্ম-ব্যতিরেকে আর কিছুই স্থায়ী নহে। ধর্ম্ম যে মিত্রতার মূলীভূত নয়, তাহা কদাচ স্থায়ী হয় না। বন্ধু যেমন বিশ্বাসস্থল, এমন আর কেহই নয়। কিন্তু অপাত্রে বিশ্বাস করিলে অবিলম্বেই প্রতিফল পাইতে হয়। যে ব্যক্তি স্বার্থ-লাভ-প্রত্যাশায়

কাহারও সহিত মিলন করে, যদি বন্ধুজন-সম্পর্কীয় কোন গুহ্য কথা ব্যক্ত করিলে স্বার্থ-লাভ হয়, তবে সে কথা কেন না প্রকাশ করিবে? যে ব্যক্তি অধর্ম্মাচরণ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হয না, সে বন্ধুজন-সমীপেই-বা বিশ্বাস-ঘাতকতা করিতে কেন কুণ্ঠিত হইবে? যে ব্যক্তি আমাদের আকস্মিক দারিদ্র্য-দশা উপস্থিত দেখিয়া, আমাদের নিকট উপকার-প্রত্যাশা-রহিত হইল বলিয়া চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত হয়, সে ব্যক্তি আমাদের দুঃখানলে সান্ত্বনা-সলিল সেচন করিতে কেন ব্যগ্র হইবে? এমন ব্যক্তি যদি আমাদের অপযশ ঘোষণা করিয়া স্বার্থলাভ করিতে পারে, তবে আমাদিগের চরিত্রে অসত্য-কলঙ্ক আরোপণ-পূর্ব্বক সুখ্যাতি লোপ করিতেই-বা কেন পরাঙ্মুখ হইবে? অনেক ব্যক্তি বিশ্বাস-ঘাতক বন্ধুর বিষম অত্যাচার-জনিত দুঃসহ ক্লেশে কাতর হইয়া থাকেন, এ কথা যথার্থ বটে; কিন্তু ঐ ক্লেশ কেবল সেই বন্ধুর দোষে নয়, নিজ দোষেও উৎপন্ন হইয়া থাকে। অপাত্রে বিশ্বাস-স্থাপন করাতেই তাঁহাকে ঐ প্রতিফল প্রাপ্ত হইতে হয। বন্ধুত্ব-ঘটনার প্রারম্ভ-সময়ে যে সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করা উচিত, তাহা না করাতেই উক্তরূপ ক্লেশ-পরম্পরা ভোগ করিতে হয়। অতএব অসাধু লোকের সহিত বন্ধুতা করা কোনরূপেই শ্রেয়স্কর নয়। সদ্‌বিদ্যাশালী সচ্চরিত্র দেখিয়া বন্ধু করিবে।

দ্বিতীয়তঃ, যে সময়ে কোন ব্যক্তিকে মিত্র বলিয়া অবধারণ করা যায়, সেই সময় অবধি তৎসংক্রান্ত কতকগুলি অতি মনোহর অভিনব ব্রতে আমাদিগকে ব্রতী হইতে হয়। সেই সমুদায় পবিত্র ব্রতই-বা কি, এবং কিরূপেই-বা পালন করিতে হয়, পশ্চাৎ তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইতেছে। যতকাল তাঁহার সহিত

মিত্রতা থাকে, তাবৎ তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার সম্পাদন করিতে হয়, তাহা অগ্রে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। তাঁহার বিচ্ছেদ- বা প্রাণত্যাগ-জনিত সুদারুণ শোক-সন্তাপ যদি আমাদের ভাগ্যে ঘটে, তাহা হইলে, তৎপরে যাবৎকাল জীবিত থাকিতে হয়, তাবৎ-কাল তদীয় সদ্ভাব-সংক্রান্ত যে যে নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য, তাহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে।

আমরা যাঁহার সহিত যথানিয়মে বন্ধুত্ব-বন্ধনে বদ্ধ হই, তাঁহাকে অসঙ্কুচিত-চিত্তে অব্যাহতভাবে বিশ্বাস করা প্রথম কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যখন আমরা তাঁহাকে নিতান্ত বিশ্বাস-ভাজন বিবেচনা করিয়া, তাঁহার সহিত সৌহৃদ্য-রূপ বিশুদ্ধ ব্রত অবলম্বন করিয়াছি, তখন তাঁহার নিকট অকপটহৃদয়ে হৃদয়-কবাট উদ্ঘাটন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। রোমক-দেশীয় কোন নীতি-প্রদর্শক (সেনেকা) নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—"তুমি যাঁহাকে আত্মবৎ বিশ্বাস না কর, তাঁহাকে যদি বন্ধু বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাক, তবে তুমি বন্ধুত্ব-গুণের প্রকৃত প্রভাব প্রতীতি করিতে সমর্থ হও নাই; তুমি যাঁহার প্রতি অনুরক্ত হও, তিনি তোমার হৃদয়-নিলয়ে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত কি না, দীর্ঘকাল বিবেচনা করিবে। কিন্তু যখন বিচার করিয়া তাঁহাকে যথার্থরূপ উপযুক্ত বলিয়া স্থির করিবে, তখন তাঁহাকে অন্তঃকরণের অভ্যন্তরে স্থান প্রদান করিবে।" বাস্তবিক মিত্র-সদৃশ প্রত্যয়-স্থল আর কেহই নাই। প্রকৃত মিত্রের অকপট হৃদয় বিশ্বাস-রূপ পরম পদার্থের জন্ম-ভূমি বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। তাঁহার হস্তে ধন-প্রাণাদি সমুদায়ই বিশ্বাস করিয়া অর্পণ করা যায়। কোন বিষয়ই তাঁহার নিকট গোপন রাখিবার বিষয় নয়। যে বিষয় পিতার নিকট ব্যক্ত করিতে শঙ্কা উপস্থিত হয়, ভ্রাতার নিকট

প্রকাশ করিতে সংশয় জন্মে, এবং ভার্য্যা-সমীপেও সময়-বিশেষে গোপন রাখিতে হয়, মিত্র-সন্নিধানে তাহা অসঙ্কুচিত-চিত্তে অক্লেশে ব্যক্ত করা যায়।

যে ব্যক্তি একান্ত প্রীতি-ভাজন ও নিতান্ত বিশ্বাস-পাত্র, তাঁহার কল্যাণ-সাধন-বিষয়ে সহজেই অনুরাগ হইয়া থাকে, এবং বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তদর্থে যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হয়; তাঁহার যদি কোন বিষয়ের অপ্রতুল উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সে অপ্রতুল-পরিহারার্থ সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যদি তিনি শোক-সন্তাপে সন্তপ্ত হন, তাহা হইলে প্রীতি-বচন ও স্নেহ-বিতরণ-দ্বারা সেই সন্তাপের শান্তি করিতে সযত্ন হওয়া উচিত। যদিও আমরা তাঁহার শোক-দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তি করিতে সমর্থ না হই, তথাচ কিছু-না-কিছু শমতা করিতে পারি, তাহার সন্দেহ নাই। কখন কখন প্রণয়-পবিত্র প্রবোধ-বচন-দ্বারা তাঁহার দুঃখের উপর সুখের ছায়া পাতিত করিয় শোকের বিষয় কিয়ৎক্ষণ বিস্মৃত রাখিতে পারি। যদি তিনি নিরপরাধে লোকের নিকট নিন্দিত হন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে নির্দ্দোষ জানিয়া প্রবোধ দিতে ও তাঁহার মিথ্যাপবাদ-জনিত মানসিক গ্লানির শমতা করিতে সমর্থ হই, এবং জন-সন্নিধানে তদীয় নির্দ্দোষতা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত সাধ্যানুসারে চেষ্টা পাইতে পারি। তাঁহার উল্লিখিত-রূপ অশেষ প্রকার উপকার সম্পাদন করা, আমাদের উচিত কর্ম্ম। তাঁহার উপকার-সাধনে সযত্ন ও সমর্থ হওয়া, আমাদের সুখের কার্য্য ও সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

বন্ধুর পাপাঙ্কুর উৎপাটন করা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

আমরা তাঁহার যত প্রকার উপকার-সাধন করিতে পারি, তন্মধ্যে কোন প্রকারই উহার তুল্য কল্যাণকর নয়। মনুষ্যের পক্ষে কোন পদার্থ ধর্ম্ম অপেক্ষা হিতকারী নহে; অতএব হৃদয়াধিক প্রিয়তম সুহৃজ্জনের হৃতপ্রায় ধর্ম্মরত্ন উদ্ধার করিয়া দেওয়া অপেক্ষা অন্য কোন প্রকারে তাঁহার অধিকতর উপকার করিতে সমর্থ হওয়া যায় না। যে সময়ে যাঁহাকে বন্ধুত্ব-পদে বরণ করা যায়, সেই সময়ে তিনি যথার্থ সচ্চরিত্র থাকিলেও পরে অসচ্চরিত্র হওয়া অসম্ভব নহে। মনুষ্যের মন নিরন্তর একরূপ থাকা সহজ নয়; পুণ্য-পদবীতে ভ্রমণ করিতে করিতে দৈবাৎ পদ-স্খলন হইয়া বিপথগামী হইবার সম্ভাবনা আছে। বন্ধুজনের এতাদৃশ অকল্যাণকর বিড়ম্বনা ঘটিলে, তাঁহাকে পুণ্যপথে পুনরানয়ন করিবার নিমিত্ত সাধ্যানুসারে যত্ন করা কর্ত্তব্য। পাপাসক্ত ব্যক্তিকে হিত-বাক্য কহিলে, কি জানি সে বিপরীত ভাবিয়া রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হয়, এই বিবেচনায় অনেকে মিত্রগণের দোষসংশোধন করিতে প্রবৃত্ত হন না; কিন্তু তাঁহাদের এরূপ ব্যবহার উচিত নয়। পীড়িত ব্যক্তি কটু ও তিক্ত ঔষধ ভক্ষণ করিতে সম্মত না হইলেও তাহাকে ঐ সমুদায় রোগনাশক সামগ্রী সেবন করান যেমন অবশ্যই কর্ত্তব্য, অধর্ম্ম-স্বরূপ মানসিক রোগে রুগ্‌ণ ব্যক্তিকেও উপদেশ-ঔষধ সেবন করান সেইরূপ অবশ্যই কর্ত্তব্য ও পুণ্যকর্ম্ম। সে বিষয়ে পরাঙ্মুখ হইলে বন্ধুত্ব-ব্রত লঙ্ঘন করা হয়। তাঁহার সন্তোষ-সাধন ও রোগোৎপত্তি-নিবারণ-উদ্দেশ্যে মৃদুবচনে সুমধুরভাবে উপদেশ দেওয়া বিধেয়। যদি তিনি বন্ধুত্ব-গুণের প্রকৃত মর্য্যাদা গ্রহণ করিতে ও আমাদের উপদেশ-বাক্যের অভিসন্ধি বুঝিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে তিনি আপনার অবলম্বিত অধর্ম্ম-পথ পরিত্যাগ

করিতে সচেষ্ট হইবেন ও আমাদের প্রতি রুষ্ট না হইয়া সমধিক সন্তুষ্ট হইবেন। আমরা তাঁহার ধর্ম্ম-রূপ অমূল্য রত্ন উদ্ধারার্থ প্রবৃত্ত হইযাছি বলিয়া তিনি আমাদেব প্রতি অধিকতর অনুবাগ প্রকাশ করিবেন, এবং প্রণয়ের সহিত কৃতজ্ঞতা-রস মিলিত করিয়া অপূর্ব্ব মাধুর্য্য-ভাব প্রদর্শন করিবেন।

যাঁহারা সবলান্তঃকরণে প্রিয়-বচনে মিত্রগণের দোষোল্লেখ করিয়া সদুপদেশ প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ হন, তাঁহারা প্রকৃত মিত্র-পদের বাচ্য নহেন। যাঁহারা কোন মিত্রের কু-প্রবৃত্তি-সমুদায় বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া তাঁহার রোষোৎপত্তির আশঙ্কায় বাক্যমাত্র ব্যয় করেন না, স্পষ্টবাদী শত্রুসকল তাঁহাদের অপেক্ষা হিতকারী সুহৃদ্ বলিয়া গণ্য হইতে পাবে। রোমক-রাজ্যের এক পণ্ডিত কহিয়া গিয়াছেন,—"অনেক ব্যক্তি প্রিয়ংবদ মিত্র অপেক্ষা বদ্ধবৈব শত্রু-সমীপে অধিক উপকাব প্রাপ্ত হইয়াছেন।" কারণ, তাঁহারা উক্তরূপ শত্রুর নিকট সবল যথার্থ কথা শ্রবণ করিযাছেন, কিন্তু উক্তরূপ মিত্রগণের নিকট কস্মিন্ কালে শুনেন নাই। তাঁহাদের বিরাগ ও অনুরাগ উভয়ই বিপরীত: কেন-না, তাঁহারা অধর্ম্মে অনুরক্তি ও সদুপদেশ-গ্রহণে বিরক্তি প্রকাশ করেন। ধনাঢ্যদিগের মধ্যে অনেকেই, অথবা প্রায সকলেই, উক্তরূপ মিত্র-মণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত থাকেন। তাঁহারা আপনার তুষ্টিকর ভিন্ন অন্য বাক্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন না এবং তাঁহারা যে সমস্ত পদানত বন্ধুকে বন্ধু-সম্বোধন করেন, তাহারাও তাঁহাদের সন্তোষ-জনক ব্যতীত অন্য বাক্য উল্লেখ করিতে সাহসী হয় না। ধনী মহাশয়েরা চতুর্দ্দিক্ হইতে আপন ধ্বনির প্রতিধ্বনি শুনিতেই ভালবাসেন এবং তদীয় আজ্ঞাবহ মিত্র মহাশয়েরা প্রতি বাক্যতেই

তাঁহাদের সে বাসনা সুসিদ্ধ করিতে থাকেন। পূজ্য ও পূজক উভয় বন্ধুর মধ্যে এক জন পরিচারণা ও অন্য জন অর্থলাভমাত্র অভিলাষ করেন। তাঁহারা যদি পরস্পর মিত্র শব্দের বাচ্য হইতে পারেন, তবে ক্রীতদাস ও ক্রেতা স্বামীই বা সেই শব্দের প্রতিপাদ্য কেন না হইবে? অকপট-হৃদয়ে অকুণ্ঠিত-ভাবে সদুপদেশ প্রদান করা এবং সাতিশয় আগ্রহ-প্রকাশ-পূর্ব্বক সেই উপদেশ গ্রহণ করা, বন্ধুত্ব-গুণের প্রকৃত লক্ষণ। সে স্থলে যদি চাটুকারিতা-দোষ উপস্থিত হয়, তবে সে চাটুকারিতা যেমন অনিষ্টকর হইয়া উঠে, বিদ্বেষীদিগের সুস্পষ্ট বিদ্বেষ-বচন কদাচ সেইরূপ অনিষ্টকর নয়।

তৃতীয়তঃ, কাহারও সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে বদ্ধ হইতে হইলে, সে সময়ে কিরূপ আচরণ করিতে হয় এবং বদ্ধ হইবার পরেই-বা তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, এই দুই বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত লিখিত হইল। এক্ষণে বন্ধুত্ব-ঘটিত চরম ক্রিয়ার বিষয় অতি সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

সৎপাত্রে প্রণয় সংস্থাপন করিলে, কস্মিন্ কালে সে প্রণয়ের বিচ্ছেদ হওয়া সম্ভব নয়। যাঁহারা পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট পবিত্র নিয়মানুসারে পরস্পর বন্ধুত্ব-ব্রত অবলম্বন করেন, তাঁহাদের মধ্যে এক জনের অন্তিম দশা উপস্থিত না হইলে, তদীয় বন্ধুত্বেরও অন্তিম দশা উপস্থিত হয় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, মিত্র-পরিগ্রহ-সময়ে যিনি যত বিবেচনা করুন না কেন ও যত সাবধান হউন না কেন, লক্ষণাক্রান্ত সুজন মিত্র নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া সুকঠিন কর্ম্ম। অবনী-মণ্ডলে জ্ঞান-পবিত্র সুচরিত্র মিত্র-সদৃশ সুদুর্লভ পদার্থ আর কিছুই নাই। আমরা এক সময়ে যাঁহাকে নিতান্ত নিষ্কলঙ্ক জানিয়া সুহৃদ্ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, অন্য সময়ে তাঁহার

এমন কলঙ্ক প্রকাশিত হইয়া পড়ে যে, তাঁহার সহিত সৌহৃদ্য রাখিবার আর পথ থাকে না। যদিও তিনি কোন গুরুতর দুষ্টদোষে দূষিত না হন, তথাচ এরূপ সন্দিগ্ধ, সারল্য-হীন ও কোপন-স্বভাব হইতে পারেন যে, তাঁহার প্রণয়-পাত্র ও বিশ্বাস-ভাজন হওয়া একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠে। অতএব যাঁহারা পরস্পরের গুণাগুণ বুঝিতে অসমর্থ হইয়া বন্ধুত্ব-বন্ধনে বদ্ধ হন, কোন-না-কোন কালে তাঁহাদের সেই বন্ধন একেবারে ছিন্ন হওয়া সম্ভব। যদিও ভাগ্য-দোষ-বশতঃ এতাদৃশ নিদারুণ ঘটনা নিতান্তই ঘটিয়া উঠে, তথাচ তাঁহাদিগের বন্ধুত্ব-ঘটিত কর্ত্তব্য-কর্ম্ম-সাধনের সমাপ্তি হয় না। আমরা জন্মাবধি কস্মিন্ কালে যাহার মুখাবলোকন করি নাই, আর যাহার সহিত সহবাস ও সদালাপ করিয়া পুলকিত-চিত্তে কিয়ৎকাল অতিপাত করিয়াছি, সেই উভয়ই আমাদের সমান যত্নের পাত্র বা সমান অবজ্ঞার বিষয় বলিয়া কখনই গণ্য হইতে পারে না। যদিও ঐ শেষোক্ত সুহৃদ্ মহাশয় আমাদের সহিত নিতান্ত ন্যায়-বিরুদ্ধ ব্যবহার করিয়া আমাদের অনুরাগ-লাভের একান্তই অযোগ্য হন, তথাচ তিনি সদ্ভাবের সময়ে বিশ্বাস করিয়া আমাদিগকে যে, কোন গোপনীয় বিষয় অবগত করিয়াছিলেন, সেই সদ্ভাবের অসদ্ভাব হইলেও তাহা কদাচ ব্যক্ত করা উচিত নয়। যে সময়ে কাহারও সহিত সৌহৃদ্য থাকে, সে সময়ে তিনি আপনার মনের কবাট উদ্ঘাটন করিয়া আমাদের নিকট এতাদৃশ গুহ্য বিষয় প্রকাশ করিতে পারেন যে, তাহা ব্যক্ত হইলে, তাঁহার অশেষ অনর্থের উৎপত্তি হইতে পারে। যদি তাঁহার উক্তরূপ অনর্থের অথবা কিছুমাত্র অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা না-ও থাকে, তথাচ যখন আমরা তাঁহার নিকট স্বীকার করিয়াছি—

অমুক বিষয় অপ্রকাশ রাখিব, তখন তাহা প্রাণসত্ত্বে প্রকাশ করা বিধেয় নয়। যদি তাঁহার সমীপে উক্তরূপ বাচনিক অঙ্গীকার নাই করিয়া থাকি, তথাচ যাঁহার সহিত প্রণয়-পাশে বদ্ধ থাকিতে হয়, তাঁহার নিকট উক্তরূপ অঙ্গীকার করা প্রথমাবধিই সিদ্ধ হইয়া থাকে। বন্ধুজনের গুহ্য বিষয় ব্যক্ত করা বিহিত নয়,—ইহা বন্ধুত্ব-বিষয়ক এক প্রধান নিয়ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। অতএব তিনি সদ্ভাব-সত্ত্বে বিশ্বাস করিয়া সংগোপনে যে বিষয় আমাদিগকে অবগত করিয়াছেন, সদ্ভাবের অসদ্ভাব হইলেও তাহা চিরকালই হৃদয়-মধ্যে যত্নপূর্ব্বক নিহিত রাখা বিধেয়।

প্রায় সকল বিধিরই স্থল-বিশেষে সঙ্কোচ করিতে হয়। সৌহৃদ্যের বিভেদ হইলেও সুহৃজ্জনের গুহ্য বিষয় প্রকাশ করা নিতান্ত নিষিদ্ধ, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু একটি স্থলে উহা নিষিদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করা যায় না। যদি তিনি দ্বেষ-পরবশ হইয়া মিথ্যাপবাদ দিয়া আমাদের নির্দ্দোষ চরিত্রকে দূষিত বলিয়া প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন, আর তাহার পূর্ব্ব-কথিত কোন গোপনীয় বিষয় ব্যক্ত না করিলে, সে দোষে উদ্ধার পাইবার সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে, সে বিষয় প্রকাশ করা কদাচ অবৈধ বলিয়া অঙ্গীকার করা যায় না। তিনি যখন অনর্থক অপবাদ দিয়া আমাদের অকলঙ্কিত চরিত্রকে কলঙ্কিতবৎ প্রতীয়মান করিতে উদ্যত হইলেন, তখন বলিতে হইবে, আমরা যে তাঁহার পূর্ব্ব-কথিত গুপ্ত বিষয় গোপন রাখিব, তিনি আর এরূপ প্রত্যাশা করেন না।

এতাদৃশ সুহৃদ্ভেদ সমধিক যন্ত্রণার বিষয়। কিন্তু অনেকের বন্ধুত্ব ইহা অপেক্ষাও স্থায়ী ও সুখকর হইয়া থাকে। জীবনান্ত-ব্যতিরেকে

তাঁহাদের সৌহৃদ্য-ভাবের অন্ত হয় না। সুহৃদ্ভাগ্যশালী উভয় মিত্রের মধ্যে এক জন যদি দুর্ব্বিপাক-বশতঃ প্রাণত্যাগ করেন, তাহা হইলে, অন্য জন তখনও একেবারে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না; এবং নিষ্কৃতি পাইতে বাসনাও করেন না। তিনি মিত্রের শোকে বিমুগ্ধ হইয়া অশ্রু-জলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিলেও সে জলে তাঁহার হৃদয়-স্থিত প্রীতির চিহ্ন প্রক্ষালিত হয় না। তিনি বন্ধুর দেহ দীপ্ত চিতায় দগ্ধ হইতে দেখিলেও সে বন্ধুর কথনোন্মুখ মনোহর মূর্ত্তি তাঁহার চিত্তপথ হইতে অপনীত হয় না। তিনি অতি দুঃসহ শোক-সন্তাপে সন্তপ্ত হইলেও তাহার অন্তঃকরণে প্রেমের অঙ্কুর কদাচ দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হয় না। বন্ধুর মান, বন্ধুর যশ ও বন্ধুর পরিজন তখন তাঁহার প্রীতি ও স্নেহ অধিকার করিয়া থাকে। তিনি মৃত বন্ধুর পরিবার ও দেশান্তরনিবাসী অজ্ঞাত-কুল-শীল ব্যক্তির পরিবার, এই উভয়ের প্রতি কদাচ সমান ভাব প্রকাশ করিতে পারেন না। তিনি অপরিচিত ব্যক্তির দুরবস্থার বিষয় শুনিয়া যেমন উদাসীন থাকেন, মৃত বন্ধুর সন্তানের বিপৎ পতনের সমাচার শুনিয়া সেরূপ উদাসীন থাকিতে কদাচ সমর্থ হন না। মৃত বন্ধুকে স্মরণ রাখা, তাঁহার সদ্‌গুণ-সমূহ কীর্ত্তন করিয়া তদীয় যশঃ-শশধর বিমল রাখিতে চেষ্টা পাওয়া এবং তাঁহার পরিজনবর্গের প্রতি অনুরক্ত থাকিয়া তাহাদের প্রতি সৌজন্য ও করুণা-ভাব প্রকাশ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

অক্ষয়কুমার দত্ত

সীতার বনবাস

রথ ভাগীরথী-তীরে উপস্থিত হইল। ভাগীরথীর অপর পারে লইয়া গিয়া সীতাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইবে, ইহা ভাবিয়া লক্ষ্মণ অগাধ ও অপার শোক-সাগরে নিক্ষিপ্ত হইলেন। আর তিনি ভাব গোপন বা অশ্রু-বেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না। সীতা তাহা দেখিয়া সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! কি কারণে তোমার এরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইল, বল।" তখন লক্ষ্মণ অশ্রু মার্জ্জন করিয়া কহিলেন, "আর্য্যে! আপনি ব্যাকুল হইবেন না; বহু কালের পর ভাগীরথীদর্শন করিয়া আমার অন্তঃকরণে কেমন এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইয়াছে, তাহাতেই অকস্মাৎ আমার নয়ন-যুগল হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইল। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ কপিল-শাপে ভস্মাবশেষ হইয়াছিলেন, ভগীরথ কত কষ্টে গঙ্গাদেবীকে ভূমণ্ডলে আনিয়া তাঁহাদের উদ্ধার-সাধন করেন;—বোধ হয় তাহাই স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে আমার একরূপ চিত্ত-বৈকল্য উপস্থিত হইয়াছিল।" সীতা একান্ত মুগ্ধস্বভাবা ও নিতান্ত সরলহৃদয়া,—লক্ষ্মণের এই তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যাতেই তিনি সন্তুষ্ট হইলেন এবং গঙ্গানদীর অপর পারে অবতরণ করিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়া লক্ষ্মণকে বারংবার তাহার উদ্যোগ করিতে বলিলেন; কিন্তু গঙ্গা-পারে গমন করিলেই যে এ জন্মের মত তিনি দুস্তর শোকসাগরে

পরিক্ষিপ্ত হইবেন, তখন পর্য্যন্তও তাহা তিনি কিছুমাত্র বুঝিতে পারেন নাই।

কিয়ৎক্ষণ পরেই তরণী-সংযোগ হইল। লক্ষ্মণ সুমন্ত্রকে সেই স্থানে রথ স্থাপন করিতে কহিয়া সীতাকে তরণীতে আরোহণ করাইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ-মধ্যেই তাঁহাকে ভাগীরথীর অপর পারে উত্তীর্ণ করাইলেন। সীতা তপোবন-দর্শনের নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়া তদভিমুখে প্রস্থান করিবাব উপক্রম করিলেন। তখন লক্ষ্মণ কহিলেন, "আর্য্যে! কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করুন, আমার কিছু বক্তব্য বিষয় আছে, এই স্থানেই ইহা নিবেদন করি।" ইহা বলিয়া তিনি অধোবদনে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সীতা চকিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! কিছু বলিবে বলিয়া এত ব্যাকুল হইলে কেন? কি বলিবে সত্বর বল, তোমার ভাবান্তর দেখিয়া আমার চিত্ত একান্ত অস্থির হইতেছে, যাহা বলিবে অবিলম্বেই বল, আমার প্রাণ আকুল হইতেছে। তুমি কি আসিবার সময়ে আর্য্যপুত্রের কোন অশুভ ঘটনা শুনিয়া আসিয়াছ, না অন্য কোন প্রকার সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, শীঘ্রই বল।" তখন লক্ষ্মণ কহিলেন, "দেবি! বলিব কি, বলিতে আমার বাক্য-নিঃসরণ হইতেছে না; আর্য্যের আজ্ঞাবহ হওয়াতে আমার অদৃষ্টে যে এরূপ ঘটিবে, তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা মনে করায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। ইতিপূর্ব্বে আমার মৃত্যু হইলে আমি সৌভাগ্য জ্ঞান করিতাম; যদি মৃত্যু অপেক্ষা কোন ঘোরতর দুর্ঘটনা থাকে তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর ছিল,—তাহা হইলে আজি আমায় আর্য্যের ধর্ম্ম-বহিভূর্ত আদেশ প্রতিপালন

করিতে হইত না। হা বিধাতঃ! আমার অদৃষ্টে এই ছিল!” ইহা বলিয়া উন্মূলিত তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়া লক্ষ্মণ হাহাকার করিতে লাগিলেন।

সীতা লক্ষ্মণের ঈদৃশ অভাবিত ভাবান্তর অবলোকন করিয়া কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন; অনন্তর হস্তধারণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে ভূতল হইতে উঠাইয়া তিনি স্বীয় অঞ্চল-দ্বারা তদীয় নয়নের অশ্রু মার্জ্জন করিয়া দিলেন। লক্ষ্মণ কিঞ্চিৎ শান্ত হইলে সীতা কাতর-বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস! কি কারণে তুমি এত ব্যাকুল হইলে? কি জন্যই-বা তুমি আপনার মৃত্যু-কামনা করিলে? তোমাকে একান্ত বিকল-চিত্ত দেখিতেছি; অল্প কারণে তুমি কখনই এত আকুল ও অস্থির হও না। বলি, আর্য্যপুত্রের ত কোন অমঙ্গল ঘটে নাই? তুমি তদ্গত-প্রাণ, তোমার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, তাঁহারই অমঙ্গল ঘটিয়াছে। আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি, এই জন্যই গত দিবস অপরাহ্ণে আমার তাদৃশ চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটিয়াছিল। যাহা হয়, তুমি তাহা সত্বর বলিয়া আমার জীবন দান কর,—আমার যাতনার একশেষ হইতেছে। শীঘ্রই বল, আর বিলম্ব করিও না। আমি স্পষ্টই বুঝিতেছি, আমারই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, তাহা না ঘটিলে এমন সময়ে তুমি এত ব্যাকুল হইতে না।”

সীতার এইরূপ ব্যাকুলতা ও কাতরতা দর্শন করায় লক্ষ্মণের শোকানল শতগুণ প্রবল হইয়া উঠিল,—নয়ন-যুগল হইতে অনর্গল অশ্রুধারা নির্গত হইতে লাগিল, এবং কণ্ঠরোধ হওয়াতে বাক্য-নিঃসরণ রহিত হইয়া গেল। যতই নিষ্ঠুর বাক্য হউক না কেন,

অবশেষে তাহা অবশ্যই বলিতে হইবে, ইহা ভাবিয়া লক্ষ্মণ ইহা বলিবার নিমিত্ত বারংবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনক্রমেই তাঁহার মুখ হইতে তাদৃশ নিষ্ঠুর বাক্য নির্গত হইল না। তাঁহাকে এতাদৃশ অবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া সীতা তাঁহার হস্ত ধরিয়া ব্যাকুল-চিত্তে ও কাতর-বচনে বারংবার এই অনুরোধ করিতে লাগিলেন, "বৎস! আর বিলম্ব করিও না, আর্য্যপুত্র যে আদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা যতই নিষ্ঠুর হউক না কেন, শীঘ্রই বল, তুমি কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিও না; আমি অনুমতি দিতেছি, তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে বল। আমার মাথা খাও, তোমার আর্য্যপুত্রের দোহাই, শীঘ্র বল। আর অধিক বিলম্ব করিলে তুমি অধিকক্ষণ আমায় জীবিত দেখিতে পাইবে না। যদি যাতনা দিয়া আমার প্রাণ বধ করা তোমার অভিপ্রেত না হয়, তবে সত্বর বল, আর বিলম্ব করিও না।"

সীতার এইরূপ অবস্থা অবলোকন করিয়া লক্ষ্মণ ভাবিলেন, আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে। তখন তিনি বহু যত্নে চিত্তের অপেক্ষাকৃত স্থৈর্য্য সম্পাদন করিয়া অতি কষ্টে বাক্য-নিঃসরণ করিলেন, এবং কহিলেন, "আর্য্যে! বলিব কি, বলিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আপনি বহু দিন একাকিনী রাবণ-গৃহে বাস করিয়াছিলেন, সেই হেতু পৌরগণ ও জানপদবর্গ আপনার চরিত্র-বিষয়ে সন্দিহান হইয়া অপবাদ ঘোষণা করিয়া থাকে। আর্য্য তাহা শুনিয়া একেবারে স্নেহ, দয়া ও মমতা বিসর্জ্জন দিয়া অপবাদ-বিমোচনার্থ আপনাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি আমায় এই আদেশ করিয়াছেন, তুমি তপোবন-দর্শনচ্ছলে সীতাকে লইয়া গিয়া বাল্মীকির আশ্রমে পরিত্যাগ করিয়া আসিবে। এই সেই বাল্মীকির আশ্রম।"

এই বলিয়া লক্ষ্মণ ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। সীতাও লক্ষ্মণের কথা শ্রবণ করিবামাত্র হতচেতনা হইয়া বাতাভিহতা কদলীর ন্যায় ভূতলশায়ী হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে লক্ষ্মণ সংজ্ঞালাভ করিয়া অনেক যত্নে জানকীর চৈতন্য-সম্পাদন করিলেন। জানকী চেতনালাভ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় স্থিরনয়নে লক্ষ্মণের বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ হতবুদ্ধির ন্যায় চিত্রার্পিত-প্রায় অধোবদনে গলদশ্রু-নয়নে দণ্ডায়মান রহিলেন। এইভাবে কিয়ৎক্ষণ অতীত হইবার পরে সীতা চিত্তের অপেক্ষাকৃত স্থৈর্য্য-সম্পাদন করিয়া কহিলেন, "লক্ষ্মণ! কাহার দোষ দিব? সমস্ত আমারই অদৃষ্টের দোষ; নতুবা রাজার কন্যা, রাজার বধূ ও রাজার মহিষী হইয়া কে কখন্ আমার মত চিরদুঃখিনী হইয়াছে বল? বুঝিলাম, যাবজ্জীবন দুঃখভোগ করিবার নিমিত্তই আমার নারী-জন্ম হইয়াছিল। বৎস! অবশেষে আমার যে এরূপ অবস্থা ঘটিবে, তাহা কাহার মনে ছিল? বহু কাল পরে আর্য্য-পুত্রের সহিত সমাগম হইলে ভাবিয়াছিলাম বুঝি এই পর্য্যন্তই দুঃখের অবসান হইল; কিন্তু বিধাতা যে আমার কপালে সহস্রগুণ অধিক দুঃখ লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা স্বপ্নেও জানিতাম না। হায় রে বিধাতঃ! তোমার মনে কি এতই ছিল!"

এইরূপ বলিতে বলিতে জানকীর কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। তিনি কিয়ৎক্ষণ বাক্য-নিঃসরণ করিতে পারিলেন না। অনন্তর দীর্ঘনিঃশ্বাস-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কহিলেন, "লক্ষ্মণ! আমি জন্মান্তরে কত মহাপাতক করিয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না; নতুবা বিধাতা আমার কপালে এত দুঃখভোগ লিখিলেন কেন? বিধাতারই-বা অপরাধ কি? সকলেই আপন আপন কর্ম্মের ফল

ভোগ করে; আমি জন্মান্তরে যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছিলাম, এ জন্মে সেইরূপ ফলই ভোগ করিতেছি। বোধ করি, পূর্ব্বজন্মে কোন পতিপ্রাণা কামিনীকে পতি-বিয়োজিতা করিয়াছিলাম, সেই মহাপাপেই আজ আমার এই দুরবস্থা ঘটিল; নতুবা আর্য্যপুত্রের হৃদয় স্নেহ, দয়া ও মমতায় পরিপূর্ণ; আমিও যে একান্ত পতিপ্রাণা ও শুদ্ধাচারিণী, তাহাও তিনি বিলক্ষণ জানেন; তথাপি যে এমন অবস্থায় তিনি আমায় পরিত্যাগ করিলেন, সে কেবল আমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের ফলভোগ মাত্র।"

এইরূপ আক্ষেপ ও বিলাপ করিতে করিতে সীতা দীর্ঘনিঃশ্বাস-সহকারে "হায় কি হইল" বলিয়া পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিতা ও ভূতলে পতিতা হইলেন। সুশীল লক্ষ্মণ ইহা দেখিয়া-শুনিয়া দুঃখে নিতান্ত কাতর ও শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া অবিরল-ধারে বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, এবং রামচন্দ্রের অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব লোকানুরাগ-প্রিয়তাই এই অভূতপূর্ব্ব অনর্থের মূল, ইহা ভাবিয়া তিনি যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ ও ম্রিয়মাণ প্রায় হইয়া কহিতে লাগিলেন, "যদি ইতিপূর্ব্বে আমার মৃত্যু হইত, তাহা হইলে এই লোক-বিগর্হিত ও ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত বিষম কাণ্ড দেখিতে হইত না। আর্য্যের আজ্ঞা-প্রতিপালনে সম্মত হইয়া আমি অতি অসৎ কর্ম্মই করিয়াছি। আমি অতি পাষণ্ড ও পাষাণ-হৃদয়, নতুবা এরূপ নিষ্ঠুর কাণ্ডের ভারগ্রহণ করিলাম কেন?"

কিয়ৎক্ষণ এইরূপ আক্ষেপ করিয়া লক্ষ্মণ উচ্ছলিত শোকাবেগ সংবরণ-পূর্ব্বক সীতার চৈতন্য-সম্পাদনে সযত্ন হইলেন। চেতনা-সঞ্চার হইলে সীতা কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া স্নেহভরে লক্ষ্মণকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, "বৎস! ধৈর্য্য অবলম্বন কর, আর

বিলাপ ও পরিতাপ করিও না। সকলই অদৃষ্টায়ত্ত,—আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহাই ঘটিয়াছে, তুমি আর তজ্জন্য কাতর হইও না; শোক সংবরণ কর। আমার ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া তুমি সত্বর আর্য্যপুত্রের নিকট যাও। তিনি আমায় পরিত্যাগ করিয়া কাতর ও অস্থির হইয়াছেন, সন্দেহ নাই; যাহাতে তাঁহার শোক নিবারণ ও চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন হয়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান্ হও। তাঁহাকে কহিবে, আমায় পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া ক্ষোভ করিবার তাঁহার আবশ্যকতা নাই,—তিনি সদ্বিবেচনারই কর্ম্ম করিয়াছেন। প্রাণপণে প্রজারঞ্জন করাই রাজার প্রধান ধর্ম্ম,—আমায় পরিত্যাগ করিয়া তিনি রাজ-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়াছেন। আমি তাঁহার মন জানি, তিনি যে কেবল লোকাপবাদ-ভয়েই এই কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহাতে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি যেন শোক ও ক্ষোভ পরিত্যাগ করিয়া প্রশস্ত মনে প্রজাপালন করেন। তাঁহার চরণে আমার প্রণাম জানাইয়া কহিবে যে, যদিও আমি লোকাপবাদ-ভয়ে অযোধ্যানগরী হইতে নির্ব্বাসিত হইলাম, তথাপি যেন তাঁহার চিত্ত-রাজ্য হইতে একেবারে অপসারিত না হই। আমি তপোবনে থাকিয়া এই উদ্দেশ্যে ঐকান্তিক চিত্তে তপস্যা করিব, যেন জন্মান্তরেও তিনি আমার পতি হন। আর তাঁহাকে বিশেষ করিয়া কহিবে, যদিও তিনি ভার্য্যা-ভাবে আমায় পরিত্যাগ করিলেন, তথাপি যেন তাঁহার সামান্য প্রজা বলিয়াও গণ্য হই। তিনি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর,—যেখানেই থাকি, তাঁহার অধিকার-বহির্ভূত নহি।"

এই বলিয়া একান্ত শোকাকুলা হইয়া সীতা কিয়ৎক্ষণ

মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর তিনি অত্যন্ত কাতর-স্বরে কহিতে লাগিলেন, "লক্ষ্মণ! আমার অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছে, আমি তজ্জন্য তত কাতর নহি; পাছে আর্য্যপুত্রের মনে ক্লেশ হয়, সেই ভাবনাতেই আমি অস্থির হইতেছি। বৎস! আমি তোমায় এই অনুরোধ করিতেছি, তুমি সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিবে,—ক্ষণকালও তাঁহাকে একাকী থাকিতে দিবে না—একাকী থাকিলেই তাঁহার উৎকণ্ঠা ও অসুখ বাড়িবে। তিনি ভাল থাকিলেই আমার ভাল। যাহাতে তিনি সুখে থাকেন, সে বিষয়ে সর্ব্বদা যত্ন করিবে।"—ইহা বলিয়া লক্ষ্মণের হস্ত ধরিয়া বাষ্প-পরিপ্লুত-লোচনে ও করুণ-বচনে কহিলেন, "তুমি আমার নিকটে শপথ করিয়া বল, এ বিষয়ে কদাপি ঔদাস্য প্রকাশ করিবে না। আমি তপোবনে থাকিয়া যদি লোক-মুখে শুনিতে পাই,—আর্য্যপুত্র কুশলে আছেন, তাহা হইলেই আমার সকল দুঃখ দূরীভূত হইবে। বৎস! শোকাবেগ সংবরণ করিয়া তুমি আর্য্যপুত্রের নিকট সত্বর যাও, বিলম্ব করিও না।" তখন লক্ষ্মণ প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং গলদশ্রু-লোচনে ও কাতর-বচনে কহিতে লাগিলেন, "আর্য্যে! আপনি পূর্ব্বাপর দেখিয়া আসিতেছেন, আমি আর্য্যের একান্ত আজ্ঞাবহ; তিনি যখন যাহা আদেশ করেন, দ্বিরুক্তি না করিয়া আমি তৎক্ষণাৎ তাহা প্রতিপালন করি। প্রাণান্ত স্বীকার করিয়াও অগ্রজের আজ্ঞা প্রতিপালন করা অনুজের প্রধান ধর্ম্ম। আমি সেই অনুজ-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে আসিয়াছিলাম; আমি যে পাষাণ-হৃদয়ের কর্ম্ম করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহা সম্পন্ন করিয়াছি। এক্ষণে প্রার্থনা এই, আমার প্রতি আপনার

যে অনির্ব্বচনীয় স্নেহ ও বাৎসল্য আছে, তাহাব যেন কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য না হয়। আর, আর্য্যের আদেশানুসারে এরূপ নৃশংস ব্যবহার করিয়া আমি যে বিষম অপরাধ করিয়াছি, কৃপা করিয়া আপনি আমার সেই অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।”

লক্ষ্মণকে এইরূপ শোকাভিভূত দেখিয়া সীতা কহিলেন, “বৎস! তোমার অপরাধ কি? তুমি কেন অকারণে এত কাতর হইতেছ ও পরিতাপ করিতেছ? তোমার উপর রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবার কথা দূরে থাকুক, আমি কায়মনোবাক্যে দেবতাদিগেব নিকটে নিয়ত এই প্রার্থনা করিব যেন জন্মান্তরে তোমার মত গুণের দেবর পাই; তুমি চিরজীবী হও। তুমি অযোধ্যায় গিয়া আর্য্য-পুত্র-চরণে আমার প্রণাম জানাইবে—ভরত-শত্রুঘ্ন ও আমার ভগিনীদিগকে আমার সস্নেহ-সম্ভাষণ কহিবে, এবং শ্বশ্রূদেবীগণ ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম হইতে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহাদের চরণে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত নিবেদন করিবে। বৎস! তোমায় আর একটি কথা বলিয়া দিই,—আমি চিরদুঃখিনী,—বিধাতা আমার অদৃষ্টে সুখ লিখেন নাই, অতএব আমার যে সর্ব্বনাশ ঘটিল, তাহাতে আমি দুঃখিত নহি। কিন্তু ইহাই করিও, যেন আমার ভগিনীগুলি দুঃখ না পায়। তাহারা আমার জন্য অত্যন্ত শোকাকুলা হইবে; যাহাতে সত্বর তাহাদের শোক নিবৃত্তি হয়, সে বিষয়ে তোমরা তিন জনে সতত যত্ন করিও; তাহারা সুখে থাকিলেই আমার অনেক দুঃখ-নিবারণ হইবে। তাহাদিগকে বলিবে, আমি স্বীয় অদৃষ্টের ফলভোগ করিতেছি, অতএব আমার জন্য তাহাদের শোকাকুল হইবার ও ক্লেশভোগ করিবার প্রয়োজন নাই।”

ইহা বলিয়া স্নেহভরে বারংবার আশীর্ব্বাদ করিয়া সীতা লক্ষ্মণকে প্রস্থান করিতে বলিলেন। লক্ষ্মণ বাষ্পাকুল-লোচনে ও গদগদ-বচনে অঞ্জলিবদ্ধ-পূর্ব্বক কহিলেন, "আর্য্যে! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।"—তিনি এই কথা বলিয়া এবং পুনর্ব্বার তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া নৌকায় আরোহণ করিলেন। সীতা অবিচলিত-নয়নে লক্ষ্মণের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। নৌকা ক্ষণকাল-মধ্যে ভাগীরথীর অপর পারে সংলগ্ন হইল। লক্ষ্মণ তীরে উত্তীর্ণ হইলেন, এবং কিয়ৎক্ষণ নিস্পন্দ-নয়নে জানকীকে নিরীক্ষণ করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে রথে আরোহণ করিলেন। রথ চলিতে আরম্ভ করিল। যতক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, ততক্ষণ লক্ষ্মণ অনিমেষ-নয়নে সীতাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; সীতাও স্থির-নয়নে সেই রথে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। রথ ক্রমে ক্রমে দূরবর্ত্তী হইতে লাগিল। তখন লক্ষ্মণ সীতাকে আর দেখিতে না পাইয়া শিরোদেশে করাঘাত করিয়া কাতর-স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। রথ নয়ন-পথের অতীত হইবামাত্র সীতাও যূথ-বিরহিতা কুররীর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ধর্ম্মপ্রণালী

কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ-জ্ঞান মনুষ্যের প্রকৃতি-সিদ্ধ সংস্কারমূলক। কোন দেশে কোন কালে এমন কোন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে নাই, যাহার মনে অতি শৈশবাবধিই এই জ্ঞানের অঙ্কুর দেখিতে না পাওয়া গিয়াছে। আর যদিই এমত কেহ থাকে, তবে তাহার তাদৃশ অবস্থা মানসিক পীড়ার মধ্যে গণ্য করা আবশ্যক। যাহা কিছু দেখি তাহারই মূলানুসন্ধানে সকলেই প্রবৃত্ত হই। বিনা কারণে কিছু হইয়াছে বলিলে কদাপি বিশ্বাস করি না।

যেমন কার্য্যকারণের অনুসন্ধান করা বুদ্ধিবৃত্তির প্রকৃতি-সিদ্ধ, তেমনি যাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারা যায়, তদবলোকনে বিস্মিত এবং চমৎকৃত হওয়াও মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। স্থল-বিশেষে ঐ বিস্ময়, ভয় ও ভক্তির সহিত সংযুক্ত হইয়া মনোমধ্যে একটি অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব করে। সেই ভাবের নাম "আরাধনা", এবং ঐ ভাব যাহাকে লক্ষ্য করিয়া উদিত হইয়া থাকে সেই "আরাধ্য" বস্তু। যদি আরাধ্য বস্তুর স্থানে কোন অভিপ্রেত যাচ্ঞা করা যায়, তাহা হইলে উহার পূজা করা হয়। এই ভাবপরিশূন্য মনুষ্য কোথাও কখন জন্মে নাই। ইহাই ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির মূল। অতএব যেমন ক্ষুধা, তৃষ্ণা আমাদিগের শরীরধর্ম্ম, তেমনি ধর্ম্মানুষ্ঠানও আমাদিগের মানসিক প্রকৃতি-সিদ্ধ ব্যাপার। কিন্তু যাহার যেমন বুদ্ধি, যেমন জ্ঞান, তাহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তিও তেমনি বিশুদ্ধ অথবা মলীমস হইয়া থাকে। এই নিয়মের কদাপি অন্যথা-

ভাব ঘটিতে পারে না। পুরাবৃত্তানুসন্ধান-দ্বারা বিভিন্ন দশাপন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যে যে যে প্রকার ধৰ্ম্মপ্রণালীর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা ইহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে।

প্রাকৃতিক ব্যাপার সমস্ত যত অধিক পর্য্যবেক্ষিত হয় ততই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক একটি কারণ হইতে বহুবিধ কার্য্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সেই এক একটি কারণকে পণ্ডিতেরা "প্রাকৃতিক নিয়ম" বলিয়া অভিহিত করেন। নিয়ম বলিয়া অভিহিত করিলেই বোধ হয়, যেন ঐ সকল কার্য্যের সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য অবগত হওয়া গিয়াছে, বস্তুতঃ তাহা নহে। উহাদিগের নিয়ম-প্রকাশের পূর্ব্বেও ঐ সকল ব্যাপার যেমন বুদ্ধির অগম্য ছিল, নিয়ম-প্রকাশ হইলেও উহারা সেইরূপ থাকে। নিয়ম জানাতে কেবল আপনাদিগের কার্য্যের কতক সুবিধা হয়, এই মাত্র লাভ। কিন্তু যখন প্রাকৃতিক ব্যাপারের সমধিক অনুসন্ধান না হইয়াছে তখন প্রত্যেক প্রকৃতি-কার্য্যই অতি অদ্ভুত রসাস্বাদ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। অগ্নি-দ্বারা দহন হইতেছে, আলোক দ্বারা প্রকাশ হইতেছে, মেঘ হইতে বারি পড়িতেছে ইত্যাদি যাবৎ ব্যাপারই নিতান্ত বিস্ময়জনক হয়। অদ্যাপি ঐ বিস্ময়ের যে সম্পূর্ণরূপ অপগম হইয়াছে তাহাও নহে; কিন্তু এক্ষণে জনগণ উহাদিগের এক একটি নিয়মরূপ কারণ-নির্দ্দেশ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন।

তখন ঐ সকল নিয়মের নামও জানা ছিল না। সুতরাং অন্য কোন কারণ-নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া উক্ত কার্য্য-সমুদয়ে অবিচিন্তনীয় বিশেষ বিশেষ শক্তির প্রাদুর্ভাব স্বীকার করা হইত। ঐ সকল শক্তির উপাসনাই মনুষ্যদিগের আদিম ধৰ্ম্ম। এই আদিম ধৰ্ম্ম এক্ষণে "জড়োপাসনা" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যখন

জড়োপাসনার প্রথা প্রথম প্রচলিত হয়, তখন উপাসকেরা স্ব স্ব দেবশরীরকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি এইরূপ বোধ করিয়া থাকে। যে জল বা অগ্নি তাহারা সম্মুখে দেখে, তাহাকেই মূর্ত্তিমদ্দেবতা-বিশেষ ভাবে। কিন্তু অতি শীঘ্রই এই বুদ্ধির কিঞ্চিৎ অন্যথা হয়। সকল জলই এক, সকল অগ্নিই এক, সকল মৃত্তিকাই এক ইত্যাদি জ্ঞান উপস্থিত হইলে, ঐ সকল ভূতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাও একজন আছেন, এমত বোধ হইতে থাকে। তখনকার ধর্ম্মপ্রণালীকেও জড়োপাসনা বলা যায়, কিন্তু ইহা প্রথমকার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চ। ইহাতে পূজাকালীন দেবতার আবাহন এবং পূজাবসানে বিসর্জ্জন আবশ্যক হয়। সুতরাং ইহাকেই নিরাকার ঈশ্বরোপাসনার প্রথম সোপান বলা যাইতে পারে। ঐ কাল হইতে গগনবিহারী জ্যোতিষ্ক-সমুদয়ের উপাসনা প্রবল হইতে আরম্ভ হয়। মর্ত্ত্যের বায়ু, জল, মৃত্তিকা, বহ্নি অপেক্ষা ঐ সকল জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ যে অবশ্য উৎকৃষ্ট তাহার কোন সন্দেহ হয় না। বিশেষতঃ, আলোকের সহিত জীবমাত্রের এমত সম্বন্ধ যে, তদ্দর্শনেই সকলে পুলকপূর্ণ হইয়া উঠে। সূর্য্যের প্রকাশে যেন জগতে পুনর্জীবন্যাস হয়। অতএব প্রথমাবধিই আলোকের সহিত জীবনের বিশিষ্ট সৌসাদৃশ্য প্রতীয়মান হইয়া থাকে। সূর্য্যাতপ-সংযোগে পুষ্পাদি প্রস্ফুটিত হয়, ফল-সকল পরিণত হয়, শৈত্য নিবারিত হয়, অতএব সূর্য্য মনুষ্যের যেমন হিতকারী এমন আর কেহই নাই। যাজকেরাও ঐ সময় হইতে জ্যোতির্বিদ্যার অনুশীলন আরম্ভ করেন। সুতরাং জ্যোতিষ্ক-উপাসনাই এই সময়ে পরম ধর্ম্ম হইয়া থাকে।

এই ধর্ম্মপ্রণালী পূর্ব্ব অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। ইহাতে সাকার উপাসনা হয় বটে, কিন্তু ইহার উপাস্য পদার্থ, দূরবর্ত্তী অবিনশ্বর ও

হিতকারী বলিয়া প্রতীত হয়। অতএব ইহাদের উপাসনাধীন চিত্ত বিশুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। ইহাই জগৎপাতা ঈশ্বরের উপাসনার দ্বিতীয় সোপান।

মনুষ্যের ধর্ম্মজ্ঞান এই পর্য্যন্ত বিকশিত হইয়া উঠিলেই ক্রমে ক্রমে আর এক প্রকার উপাসনার আরম্ভ হয়। মানবগণ জল, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতির শক্তি-সমুদয় স্ব স্ব বুদ্ধির অগম্য দেখিয়া তৎসমুদয়কে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করেন, কিন্তু জীবন পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর চমৎকার-জনক। জীবন কি? কেহই এ প্রশ্নের সমগ্র উত্তর-প্রদানে সমর্থ নহেন।

অতএব সর্ব্বস্থলেই জড়োপাসনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণি-উপাসনারও আরম্ভ হইয়া থাকে। তখন যত প্রকার পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ দৃষ্ট হয় সকলেতেই কোন গুহ্য দেব-শক্তি বর্ত্তমান আছে এমত প্রতীত হয়। বিশেষতঃ, যে সকল জীব মনুষ্যের অধিক হিতকারী, অথবা বিশিষ্ট শক্তি-সম্পন্ন তাহাদিগের উপাসনায় সমধিক গৌরব হয়।

এইরূপ প্রাণিপূজা এবং পূর্ব্বোক্ত জ্যোতিষ্কপূজা—উভয় পূজা কিছুকাল একত্র হইলেই উপাসনার আর একটি নূতন প্রণালী জন্মে। যে সকল ব্যক্তি সমধিক পরাক্রম প্রকাশ করিয়া শত্রু-জয় করেন, অথবা প্রয়োজনোপযোগী শিল্প-নির্ম্মাণ করেন, তাঁহারা জনসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া দেবতা বলিয়া পূজ্য হন। এইরূপে মনুষ্যোপাসনা আরম্ভ হয়। কিন্তু ইহার সহিত পূর্ব্বপ্রণালীর সংযোগ রাখা আবশ্যক। এই হেতু প্রথম প্রথম যে সকল মনুষ্য দেবতা বলিয়া পূজিত হন, তাঁহারা প্রায়ই জ্যোতিষ্কদিগের নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইহাও সাকার

উপাসনা বটে, কিন্তু ইহার বিষয়ীভূত যে সকল পদার্থ তাহারা চিজ্জড়াত্মক, কেবল জড়মাত্র নহে। অতএব ইহা চিন্ময় ব্রহ্মোপাসনার তৃতীয় সোপান বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

মনুষ্যোপাসনার আরম্ভ হইয়া সভ্যাবস্থার উন্নতি হইলে যখন শত্রু-জয় এবং শিল্প-নির্ম্মাণমাত্র মনুষ্যের প্রয়োজনীয় থাকে না, সর্ব্বাপেক্ষা ধর্ম্মোপদেশই সমধিক আবশ্যক বোধ হয়, তখন যে সকল মহাত্মা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-জ্ঞানের উপদেশ করেন তাঁহাদিগকে এই সকলের অপেক্ষাই বড় বলিয়া বোধ হয়। জল, বায়ু, বহ্নি অতি আশ্চর্য্য পদার্থ; জ্যোতিষ্কগণ তদপেক্ষাও অধিক চমৎকার-জনক; জীবন আরও রহস্য বস্তু; বৈষয়িক সুখ-দুঃখের ব্যাপার সকলের চিত্তাকর্ষক, কিন্তু কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-জ্ঞান যেমন অতীব গুহ্য এবং বিস্ময়-জনক এমত আর কিছুই নাই। অতএব যাঁহারা মূর্ত্তিমৎ জ্ঞানস্বরূপ তাঁহারা যে নরগণের অবশ্য পূজ্য হইবেন, তাহার আর সন্দেহ কি? তাঁহারা চিন্ময় ঈশ্বরের অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। এই অবস্থায় যে ধর্ম্মপ্রণালী প্রচলিত হয় তাহার নাম অবতারোপাসনা। অবতার-উপাসনা আরম্ভ হইলে মনুষ্যদিগের দিন দিন ধর্ম্মবৃদ্ধির উপায় হয়; কারণ উক্ত অবতারেরা নরজাতির সমীপে চিন্ময় ঈশ্বরের প্রতিরূপ-স্বরূপে পরিচিত হন; এবং ঐ আদর্শ প্রাপ্ত হইয়া জনগণ ধর্ম্মপথের পথিক হইতে পারে।

মনুষ্যের মন কার্য্যকারণ-সম্বন্ধে আরও সূক্ষ্মদর্শন-ক্ষম হইলে উহাতে ক্রমশঃ দ্বৈতভাবের হ্রাস হইয়া অদ্বৈতবাদ-গ্রহণে উন্মুখতা জন্মিতে থাকে। অদ্বৈতবাদী ভক্তিপরিষিক্ত হৃদয়ে জড়-জগৎকেও সেই একমাত্র অদ্ভুতময় শক্তি হইতে অভিন্ন দেখিতে

চেষ্টা করেন এবং প্রকৃত জ্ঞানলাভ হইলে সেই চিন্ময় পরমেশ্বরকে আপনাতেই দেখিতে পান।

এই বিষয়োপলক্ষ্যে আরও একটি কথা বক্তব্য আছে। ধর্ম্ম-প্রণালীর পরিবর্ত্তন হইলে কোথাও পূর্ব্ব প্রথা একেবারে অপ্রচলিত হইয়া যায় না। পূর্ব্ব ধর্ম্মের সহিত পর ধর্ম্মটির সংযোগ হইয়া কিছুকাল দুই-ই এক সময়ে চলিতে থাকে। ক্রমে দ্বিতীয়টির প্রতি বিশেষ মনোযোগ হয়, প্রথমটি তাদৃশ প্রবল থাকে না। যেমন বালকদিগকে প্রথমে বর্ণমালা পড়াইতে হয়, তাহার পর তাহারা বানান, ফলা প্রভৃতি শিখে, কিন্তু সেইগুলি শিখিবার সময় যে বর্ণমালা ভুলিয়া যায় এমত নহে, বস্তুতঃ ঐ বর্ণমালা-শিক্ষা হইয়াছে বলিয়াই তাহারা অপরগুলি শিখিতে পারে। ধর্ম্ম-শিক্ষাতেও ঠিক সেইরূপ ঘটে। জড়োপাসনার পর জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর উপাসনা আরম্ভ হয়, পরন্তু তৎকালে জড়োপাসনাও একেবারে পরিত্যক্ত হয় না। প্রত্যুত জড়োপাসনাধীনা উপাসনায় যে সমস্ত বিধির শিক্ষা হইয়াছে, জ্যোতিষ্ক-উপাসনায়ও সেই সকল বিধিই প্রচলিত হয়। এইরূপ সর্ব্বত্র ঘটিয়া থাকে।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

সেকাল

অদ্যকার বক্তৃতার বিষয় "সেকাল আর একাল।" ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে হিন্দুকালেজ এই মহানগরে সংস্থাপিত হয়। ১৮৩০ সালে ঐ বিদ্যালয়ের প্রথম ফল ফলে। ঐ বৎসরে কতকগুলি যুবক ইংরাজীতে কৃতবিদ্য হইয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। তাঁহারা সেই সময়ে ইউরোপীয় বিদ্যার আলোক লাভ করিয়া সমাজসংস্কারকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। সেই সময়ে একটি নূতন ভাব হিন্দুসমাজে প্রবিষ্ট হয়। ইংরাজী আমলের প্রথম হইতে হিন্দুকালেজ-সংস্থাপন পর্য্যন্ত যে সময়, তাহা "সেকাল" এবং তাহার পরের কাল "একাল" শব্দে নির্দ্ধারণ করিলাম।

সেকালের বিষয় বলিতে হইলে সেকালের সাহেবদের বিষয় অগ্রে বলিতে হয়। আপনারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, বাঙ্গালীদের বিষয়ে বলিতে গিয়া সাহেবদের কথা প্রথমে বলা হয় কেন। তাহার বিশিষ্ট কারণ আছে। সাহেবেরা আমাদিগের শাসনকর্ত্তা ও তাঁহাদের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সাহেবদের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকার জন্য, সেকালের সাহেবেরা কি প্রকৃতির লোক ছিলেন ও সেকালের বাঙ্গালীদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতেন, তাহা না জানিলে সেকালের বাঙ্গালীদের অবস্থা ভাল জানা যাইতে পারে না, অতএব সেকালের সাহেবদিগের বর্ণনা সর্ব্বাগ্রে করা কর্ত্তব্য।

সেকালে সাহেবেরা অর্দ্ধেক হিন্দু ছিলেন। পূর্ব্বে মুসলমানেরা এই ভারতবর্ষকে আপনাদের গৃহস্বরূপ জ্ঞান করিতেন। তাঁহাদের অনুরাগ এইখানেই বদ্ধ থাকিত। ইংরাজের আমলের প্রথম সাহেবেরা অনেক পরিমাণে ঐরূপ ছিলেন। তাহার এক কারণ এই, তখন বিলাতে যাতায়াতের এমন সুবিধা ছিল না। যাঁহারা এখানে আসিতেন, তাঁহাদের সর্ব্বদা বাটী যাওয়া ঘটিয়া উঠিত না। আর এক কারণ এই, তাঁহারা অতি অল্প লোকই এখানে থাকিতেন; সুতরাং এখানকার লোকদিগের সহিত তাঁহারা অনেক পরিমাণে এ দেশীয়দের আচার-ব্যবহার পালন করিতেন। তখন সকাল-বিকাল কাছারী হইত, মধ্যাহ্ন-কালে সকলে বিশ্রাম করিত। মধ্যাহ্নকালে কলিকাতা দ্বিপ্রহরা রজনীর ন্যায় নিস্তব্ধ হইত। তখনকার সাহেবেরা পান খাইতেন, আল্‌বোলা ফুঁকিতেন ও হুলি খেলিতেন। ষ্টুয়ার্ট নামে একজন প্রধান সৈনিক সাহেব ছিলেন; হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ছিল। তজ্জন্য অন্যান্য সাহেবেরা তাঁহাকে হিন্দু ষ্টুয়ার্ট বলিয়া ডাকিত। তাঁহার বাটীতে শালগ্রামশিলা ছিল। তিনি প্রত্যহ পূজারী ব্রাহ্মণের দ্বারা তাঁহার পূজা করাইতেন। বাল্যকালে শুনিতাম, কালীঘাটের কালীর মন্দিরে প্রথমে কোম্পানীর পূজা হইয়া তৎপরে অন্যান্য লোকের পূজা হইত। ইহা সত্য না হইতে পারে, কিন্তু ইহা-দ্বারা প্রতীত হইতেছে যে, তৎকালের সাহেবেরা বাঙ্গালীদের সহিত এতদূর ঘনিষ্ঠতা করিতেন যে, তাঁহাদিগের ধর্ম্মের পর্য্যন্ত অনুমোদন করিতেন। একালেও গবর্নর জেনেরল লর্ড এলেনবরা সাহেব বাহাদুর আফগানিস্থানের যুদ্ধে জয়ী হইয়া ফিরিয়া আসিবার সময় বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি

স্থানের প্রধান প্রধান দেবালয়ে দান করিয়া আসিয়াছিলেন। সেকালের সাহেবেরা আমলাদের উপর এমন সদয় ছিলেন যে, শুনা গিয়াছে, তাঁহারা তাঁহাদের দেওয়ানদের বাটীতে গিয়া তাঁহাদের ছেলেদিগকে হাঁটুর উপর বসাইয়া আদর করিতেন ও চন্দ্রপুলি খাইতেন। তাঁহারা অন্যান্য আমলাদের বাসায়ও যাইয়া কে কেমন আছে, জিজ্ঞাসা করিতেন। এখন সে কাল গিয়াছে। এখনকার সাহেবদিগকে দেখিলে, তাঁহাদিগকে সেই সকল সাহেবদের হইতে এক স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া বোধ হয়। ইঁহাদের আর এ দেশীয়দের সহিত সেরূপ ব্যথার ব্যথিত্ব নাই, তাঁহাদের প্রতি ইঁহাদিগের সেরূপ স্নেহ নাই, সেরূপ মমতা নাই। অবশ্য অনেক সদাশয় ইংরাজ আছেন, যাঁহারা এই কথার ব্যভিচারস্থল-স্বরূপ। কিন্তু আমি যেরূপ বর্ণনা করিলাম, এরূপ সাহেবই অধিক। পূর্ব্বে যে সকল ইংরাজ মহাপুরুষেরা এখানে আসিয়া এ দেশের যথেষ্ট উন্নতি করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের নাম এ দেশীয়দের হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে। কোন উদ্ভট-কবিতাকার হিন্দুদিগের প্রাতঃস্মরণীয় স্ত্রীলোকদিগের নাম যে শ্লোকে উল্লিখিত আছে, তাহার পরিবর্ত্তে সেকালের কতিপয় ইংরাজ মহাত্মার নাম উল্লেখ করিয়া একটি শ্লোক প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আদর্শ ও নকল দুইটি শ্লোকই নিম্নে লিখিত হইল।

আদর্শ

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চ কন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্॥

নকল

হেয়ার্ কম্বিন্ পামরশ্চ কেরি মার্শমেনস্তথা।
পঞ্চ গোরাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্ ॥

এই সকল মহাপুরুষদিগের বিষয় মহাশয়েরা অনেকেই অবগত আছেন। ডেভিড হেয়ার এই দেশে ঘড়ীর ব্যবসায়-দ্বারা লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার স্বদেশ স্কট্‌লণ্ডে ফিরিয়া না গিয়া সেই সমস্ত অর্থ এতদ্দেশীয় লোকের হিতসাধনে ব্যয় করিয়া পরিশেষে দরিদ্রদশায় উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে এতদ্দেশীয়দের ইংরাজী শিক্ষার প্রথম সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি হেয়ার-স্কুল সংস্থাপন করেন ও হিন্দু-কালেজ-সংস্থাপনের একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। আমি তাঁহার একজন ছাত্র ছিলাম। আমি যেন দেখিতেছি, তিনি ঔষধ হস্তে লইয়া পীড়িত বালকের শয্যার পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, অথবা যেখানে যাত্রা হইতেছে, তথায় হঠাৎ আসিয়া অভিনেতা বালককে নীচ আমোদক্ষেত্র হইতে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছেন। কম্বিন্ সাহেব এই কলিকাতা নগরের একজন প্রধান সওদাগর ছিলেন। তিনি অত্যন্ত পরোপকারী ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পুত্র উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লেফ্‌টেনণ্ট গবর্নর হইয়াছিলেন। তিনি সিপাইদের বিদ্রোহের সময় অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। তিনিও একজন অতি দয়াশীল ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। এতদ্দেশীয়দের প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ স্নেহ ছিল। জন পামরকে লোকে "Prince of Merchants" অর্থাৎ সওদাগরদের রাজা

বলিয়া ডাকিত। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার গোরের উপরে "Here lies John Palmer, Friend of the Poor."—"এখানে দরিদ্র-জন-বন্ধু জন পামর আছেন," কেবল এই বাক্যটি লিখিত হইয়াছিল। কেরি ও মার্শমেন সাহেব খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-প্রচারক ছিলেন। তাঁহারা শ্রীরামপুরে বাস করিতেন। তাঁহারা বাঙ্গালা অভিধান, বাঙ্গালা সংবাদপত্র ও উন্নত প্রণালীর বাঙ্গালা পাঠশালার সৃষ্টিকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহারা অনেক প্রকারে বঙ্গদেশের মহোপকার-সাধন করিয়া গিয়াছেন। সেকালের এই সকল মহান্তঃকরণ সাহেবেরা চিরকাল বাঙ্গালীদিগের স্মৃতিক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকিবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

অতঃপর সেকালের বাঙ্গালীদের বিষয় বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। সেকালের বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর লোকদিগের বর্ণনা করিতে গেলে আমাদের দৃষ্টি গুরুমহাশয়ের উপর প্রথম পতিত হয়। গুরুমহাশয়দিগের শিক্ষাপ্রণালী উন্নত ছিল না এবং তাঁহাদের অবলম্বিত ছাত্রদিগের দণ্ডের বিধানটি বড় কঠোর ছিল। নাড়ুগোপাল অর্থাৎ হাঁটু গাড়িয়া বসাইয়া হাতে প্রকাণ্ড ইষ্টক অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রাখানো, বিছুটি গায়ে দেওয়া ইত্যাদি অনেক প্রকার নির্দ্দয় দণ্ড-প্রদানের রীতি প্রচলিত ছিল। পাঁচ বৎসর বয়স্ হইতে দশ বৎসর বয়স্ পর্য্যন্ত তালপাতে; তারপর পনর বৎসর বয়স্ পর্য্যন্ত কলার পাতে; তারপর কুড়ি বৎসর বয়স্ পর্য্যন্ত কাগজে লেখা হইত। সামান্য অঙ্ক কষিতে, সামান্য পত্র লিখিতে, আর গুরুদক্ষিণা ও দাতাকর্ণ নামক পুস্তক পড়িতে সমর্থ করা, গুরুমহাশয়দিগের শিক্ষার শেষ সীমা ছিল। গুরুমহাশয় অতি ভীষণ পদার্থ ছিলেন।

অতঃপর সেকালের ভট্টাচার্য্যগণ আমাদিগের বর্ণনার বিষয় হইতেছেন। তখনকার ভট্টাচার্য্যগণ অতি সরলস্বভাব ছিলেন। এখনকার ভট্টাচার্য্যগণ যেমন বিষয়বুদ্ধিতে বিষয়ী লোকের ঘাড়ে যান, সেকালের ভট্টাচার্য্যেরা সেরূপ ছিলেন না। তাঁহারা সংস্কৃত শাস্ত্র অতি প্রগাঢ়রূপে জানিতেন এবং অতি সরল ও সদাশয় ছিলেন। সেকালের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সমকালবর্ত্তী রামনাথ নামে একজন পণ্ডিত ছিলেন। তিনি নবদ্বীপের নিকটস্থ একটি গ্রামে বাস করিতেন। তিনি রাজ-সভাবিচরণকারী চাটুকার ভট্টাচার্য্যদিগের ন্যায় সভ্যতার নিয়ম পরিজ্ঞাত ছিলেন না। এই জন্য লোকে তাঁহাকে বুনো রামনাথ বলিয়া ডাকিত। একদিন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অমাত্য-সমভি-ব্যাহারে তাঁহার সহিত সক্ষাৎ করিতে গেলেন। রাজা তাঁহার অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে কিছু অর্থ সাহায্য করিতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু তাঁহার কি প্রয়োজন তাহা জানিতে হইবে, এ জন্য ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের কিছু অনুপপত্তি আছে?" এখন, ন্যায়শাস্ত্রে অনুপপত্তির অর্থ, যাহার কোন সিদ্ধান্ত হয় না। ভট্টাচার্য্য তাহাই বুঝিয়া লইলেন এবং বলিলেন, "কৈ না, আমার কিছুই অনুপপত্তি নাই।" রাজা তাহা বুঝিতে পারিয়া অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের কিছু অসঙ্গতি আছে?" এখন, অসঙ্গতি শব্দের ন্যায়শাস্ত্রোল্লিখিত অর্থ অসমন্বয়। ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "না, কিছুই অসঙ্গতি নাই, সকলই সমন্বয় করিতে সমর্থ হইয়াছি।" রাজা দেখিলেন, মহা মুস্কিল। তখন তিনি স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাংসারিক বিষয়ে আপনার কোন অনটন

আছে?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, "না, কিছুই অনটন নাই: আমার কয়েক বিঘা ভূমি আছে, তাহাতে যথেষ্ট ধান্য উৎপন্ন হয়, আর সম্মুখে এই তিন্তিড়ী বৃক্ষ দেখিতেছেন,—ইহার পত্র আমার গৃহিণী দিব্য পাক করেন, অতি সুন্দর লাগে, আমি স্বচ্ছন্দে তাহা দিয়া অন্ন আহার করি।"

আমি আশ্চর্য্য বোধ করি যে, এমন সরল সাধু সন্তুষ্টচিত্ত ব্যক্তিকে লোকে বুনো বলিত। ইনি যদি বুনো, তবে সভ্য কে? আর এক ভট্টাচার্য্য ছিলেন, তাঁহার স্ত্রী ডাইল পাক করিতেছিলেন। তিনি স্বামীকে রন্ধনশালায় বসাইয়া পুষ্করিণীতে জল আনিতে গেলেন। এ দিকে ডাইল উথলিয়া উঠিল। ভট্টাচার্য্য দেখিলেন, বিষম বিপদ্! ডাইল উথলিয়া পড়া কি প্রকারে নিবারণ করিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া হাতে পৈতা জড়াইয়া পতনোন্মুখ ডাইলের অব্যবহিত উপরিস্থ শূন্যে তাহা স্থাপন করিয়া চণ্ডীপাঠ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাতেও তাহা নিবারিত হইল না। এমন সময় তাঁহার ব্রাহ্মণী পুষ্করিণী হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি কহিলেন, "এ কি! ইহাতে একটু তেল ফেলিয়া দিতে পার নাই?" এই বলিয়া তিনি ডাইলে একটু তেল ফেলিয়া দিলেন। ডাইলের উথলিয়া পড়া নিবারিত হইল। এই ব্যাপার দেখিয়া ভট্টাচার্য্য গললগ্নবাস হইয়া করযোড়ে ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, "তুমি কে আমার গৃহে অধিষ্ঠিতা, বল; অবশ্য কোন দেবী হইবে, নতুবা এই অদ্ভুত ব্যাপার কি প্রকারে সাধন করিতে পারিলে?" যদ্যপি এই গল্পে বাহুল্য-বর্ণনার সুস্পষ্ট চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে, তথাপি উহা যে সেকালের ভট্টাচার্য্যদিগের অসামান্য সারল্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

ভট্টাচার্য্যদিগের অবৈষয়িকতার আর একটি সুন্দর গল্প আছে। একজন ভট্টাচার্য্য পুথি পড়িতেছিলেন; পড়িতে পড়িতে অনেক রাত্রি হইলে তাঁহার তামাক খাইবার বড় ইচ্ছা হইল। তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় একখানি টীকা লইয়া বাটীর বাহির হইলেন। দেখিলেন দূরে একটা পাঁজা পুঁড়িতেছে। তিনি আস্তে আস্তে সেই স্থানে টীকা ধরাইতে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু ঘরে যে প্রদীপ জ্বলিতেছিল তাহা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

অতঃপর সেকালের রাজকর্ম্মচারীদিগের বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। ইংরাজের আমলের প্রথমে আমলাদিগের বড় প্রাদুর্ভাব ছিল। এক এক জন আমলার উপর অনেক কর্ম্মের ভার থাকিত। তাঁহারা অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতেন। এক এক জন দেওয়ান বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। ঢাকা নগরের একজন দেওয়ানের কথা এইরূপ শুনা যায়, তিনি আহারের সময় একটি প্রকাণ্ড ঘণ্টা বাজাইয়া দিতেন, নগরের সমুদায় বাসাড়ে লোক সেই ঘণ্টার রব শুনিয়া তাঁহার বাসায় আসিয়া আহার করিত। তখন ঐ সকল পদ এক প্রকার বংশপরম্পরাগত ছিল। একজন দেওয়ানের মৃত্যু হইলে প্রায়ই তাঁহার সন্তান অথবা অন্য কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কীয় লোক দেওয়ান হইত। শুনা আছে, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামবাসী এক দেওয়ানের মৃত্যুর পর তাঁহার সপ্তদশ-বৎসর-বয়স্ক কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাণের মাকৃড়ী ও হাতের বালা খুলিয়া দেওয়ানী করিতে গেলেন। সাহেবেরা তাঁহাদিগের দেওয়ানদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেন, তাহা পূর্ব্বে

বলিয়াছি। সে সময়ে উৎকোচ লইবার বাড়াবাড়ি ছিল। শুদ্ধ বাঙ্গালীরা যে উৎকোচ লইতেন এমন নহে, বড় বড় সাহেবেরাও উৎকোচ লইতেন। এখন সেরূপ নহে। এ বিষয়ে অবশ্যই উন্নতি দেখিতেছি।

পরিশেষে সেকালের ধনী লোকদিগের বর্ণনা করা হইতেছে। তাঁহারা অত্যন্ত বদান্য ছিলেন। পুষ্করিণী-খননাদি পূর্ত্তকর্ম্মে তাঁহারা বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তাঁহারা সন্ন্যাসী ও দরিদ্রদিগকে বিলক্ষণ দান করিতেন। তাঁহারা অতিথিসেবায় তৎপর ছিলেন। তাঁহারা গুণী লোকদিগকে বিলক্ষণরূপে পালন করিতেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও প্রসিদ্ধ গায়কদিগকে বিশিষ্ট অর্থানুকূল্য করিতেন। কোন কোন স্থলে উপযুক্ত পাত্রে তাঁহাদিগের দানশীলতা প্রযোজিত হইত না বটে, কিন্তু তাঁহারা যে অত্যন্ত বদান্য ছিলেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

রাজনারায়ণ বসু

চন্দ্রাপীড়ের যৌবরাজ্যে অভিষেক

কিছু দিনের পর রাজা চন্দ্রাপীড়কে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে অভিলাষ করিলেন। রাজকুমার যুবরাজ হইবেন এই ঘোষণা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। রাজবাটী মহোৎসবময় ও নগর আনন্দকোলাহলে পরিপূর্ণ হইল। অভিষেকের সামগ্রীসম্ভার সংগ্রহের নিমিত্ত লোক-সকল দিগ্‌দিগন্তে গমন করিল।

একদা কার্য্যক্রমে চন্দ্রাপীড় অমাত্যের বাটীতে গিয়াছেন। তথায় শুকনাস তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া মধুর বচনে কহিলেন,—"কুমার! তুমি সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন ও সমুদায় বিদ্যা অভ্যাস করিয়াছ, সকল কলা শিখিয়াছ, ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া যাহা জ্ঞাতব্য সমুদায় জানিয়াছ। তোমার অজ্ঞাত ও উপদেষ্টব্য কিছুই নাই। তুমি যুবা, মহারাজ তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত ও ধনসম্পত্তির অধিকারী করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। সুতরাং যৌবন, ধনসম্পত্তি, প্রভুত্ব—তিনেরই অধিকারী হইলে। কিন্তু যৌবন অতি বিষম কাল। যৌবন-রূপ বনে প্রবেশিলে বন্য জন্তুর ন্যায় ব্যবহার হয়। যুবা পুরুষেরা কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি পশুধর্ম্মকে সুখের হেতু ও স্বর্গের সেতু জ্ঞান করে। যৌবনপ্রভাবে মনে এক প্রকার তম উপস্থিত হয়, উহা কিছুতেই নিরস্ত হয় না। যৌবনের আরম্ভে অতি নির্ম্মল বুদ্ধিও বর্ষাকালীন নদীর ন্যায় কলুষিতা হয়। বিষয়তৃষ্ণা ইন্দ্রিয়গণকে আক্রমণ করে। তখন অতিগর্হিত অসৎ কর্ম্মকেও দুষ্কর্ম্ম বলিয়া বোধ হয় না। তখন

লোকের প্রতি অত্যাচার করিয়া স্বার্থ সম্পাদন করিতেও লজ্জা বোধ হয় না। সুরাপান না করিলেও, চক্ষুর দোষ না থাকিলেও ধনমদে মত্ততা ও অন্ধতা জন্মে। ধনমদে উন্মত্ত হইলে হিতাহিত বা সদসদ্বিবেচনা থাকে না। অহঙ্কার ধনের অনুগামী। অহঙ্কৃত পুরুষেরা মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে না। আপনাকেই সর্ব্বাপেক্ষা গুণবান্, বিদ্বান্ ও প্রধান বলিয়া ভাবে, অন্যের নিকটও সেইরূপ প্রকাশ করে। তাহার স্বভাব এরূপ উদ্ধত হয় যে, আপন মতের বিপরীত কথা শুনিলে তৎক্ষণাৎ খড়্গহস্ত হইয়া উঠে। প্রভুত্ব-রূপ হলাহলের ঔষধ নাই। প্রভুজনেরা অধীন লোকদিগকে দাসের ন্যায় জ্ঞান করে। আপন সুখে সন্তুষ্ট থাকিয়া পরের দুঃখ, সন্তাপ কিছুই দেখিতে পায় না। তাহারা প্রায় স্বার্থপর ও অন্যের অনিষ্টকারক হইয়া উঠে। যৌবরাজ্য, যৌবন, প্রভুত্ব ও অতুল ঐশ্বর্য্য—এ সকল কেবল অনর্থপরম্পরা। অসামান্যধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই ইহার তরঙ্গ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি-রূপ দৃঢ় নৌকা না থাকিলে উহার প্রবল প্রবাহে মগ্ন হইতে হয়। এক বার মগ্ন হইলে আর উঠিবার সামর্থ্য থাকে না।

"সদ্বংশে জন্মিলেই যে, সৎ ও বিনীত হয়—এ কথা অগ্রাহ্য। উর্ব্বরাভূমিতে কি কণ্টকী বৃক্ষ জন্মে না? চন্দনকাষ্ঠের ঘর্ষণে যে অগ্নি নির্গত হয় উহার কি দাহশক্তি থাকে না? ভবাদৃশ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরাই উপদেশের যথার্থ পাত্র। মূর্খকে উপদেশ দিলে কোন ফল হয় না। দিবাকরের কিরণ কি স্ফটিকমণির ন্যায় মৃৎপিণ্ডে প্রতিফলিত হইতে পারে? সদুপদেশ অমূল্য ও অসমুদ্র-সম্ভূত রত্ন। উহা শরীরের বৈরূপ্য প্রভৃতি জরার কার্য্য প্রকাশ না করিয়াও বৃদ্ধত্ব সম্পাদন করে। ঐশ্বর্য্যশালীকে উপদেশ দেয়,

এমন লোক অতিবিরল। যেমন গিরিগুহার নিকটে শব্দ করিলে প্রতিশব্দ হয়, সেইরূপ পার্শ্ববর্ত্তী লোকের মুখে প্রভুবাক্যের প্রতিধ্বনি হইতে থাকে; অর্থাৎ প্রভু যাহা কহেন, পারিষদেরা তাহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া অঙ্গীকার করে। প্রভুর নিতান্ত অসঙ্গত ও অন্যায় কথাও পারিষদদিগের নিকট সুসঙ্গত ও ন্যায়ানুগত হয়, এবং সেই কথার পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিয়া তাহারা প্রভুর কতই প্রশংসা করিতে থাকে। তাঁহার কথার বিপরীত কথা বলিতে কাহারও সাহস হয় না। যদি কোন সাহসিক পুরুষ ভয় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার কথা অন্যায় ও অযুক্ত বলিয়া বুঝাইয়া দেন তথাপি তাহা গ্রাহ্য হয় না। প্রভু সে সময় বধির হন অথবা ক্রোধান্ধ হইয়া আত্মমতের বিপরীতবাদীর অপমান করেন। অর্থ অনর্থের মূল। মিথ্যা অভিমান, অকিঞ্চিৎকর অহঙ্কার ও বৃথা ঔদ্ধত্য প্রায় অর্থ হইতে উৎপন্ন হয়।

"প্রথমতঃ লক্ষ্মীর প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া দেখ। ইনি অতি দুঃখে লব্ধ ও অতি যত্নে রক্ষিত হইলেও কখন এক স্থানে স্থির হইয়া থাকেন না। রূপ, গুণ, বৈদগ্ধ্য, কুল, শীল কিছুই বিবেচনা করেন না। রূপবান্, গুণবান্, বিদ্বান্, সদ্বংশজাত, সুশীল ব্যক্তিকেও পরিত্যাগ করিয়া জঘন্য দুরাচার পুরুষাধমের আশ্রয় লন। লক্ষ্মী যাহাকে আশ্রয় করেন, সে স্বার্থনিষ্পাদনপর ও লুব্ধ-প্রকৃতি হইয়া দ্যূতক্রীড়াকে বিনোদ, পশুধর্ম্মকে রসিকতা, যথেচ্ছা-চারকে প্রভুত্ব ও মৃগয়াকে ব্যায়াম বলিয়া গণনা করে। মিথ্যা স্তুতিবাদ করিতে না পারিলে ধনীদের নিকটে জীবিকা লাভ করা কঠিন। যাহারা অন্যকার্য্যপরাঙ্মুখ ও কার্য্যাকার্য্যবিবেকশূন্য হয় এবং সর্ব্বদা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ধনেশ্বরকে জগদীশ্বর বলিয়া

বর্ণনা করে, তাহারাই ধনিগণের সন্নিধানে বসিতে পায় ও প্রশংসাভাজন হয়। প্রভু স্তুতিবাদককে যথার্থবাদী বলিয়া জ্ঞান করেন, তাহার সহিতই আলাপ করেন, তাহাকেই সদ্বিবেচক ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া ভাবেন, তাহার পরামর্শক্রমেই কার্য্য করিয়া থাকেন। স্পষ্টবক্তা উপদেষ্টাকে নিন্দক বলিয়া অবজ্ঞা করেন, নিকটেও বসিতে দেন না। তুমি দুরবগাহ নীতি প্রয়োগ ও দুর্ব্বোধ রাজ্যতন্ত্রের ভার গ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়াছ; সাবধান! যেন সাধুদিগের উপহাসাস্পদ ও চাটুকারের প্রতারণাস্পদ হইও না। চাটুকারের প্রিয় বচনে তোমার যেন ভ্রান্তি জন্মে না। যথার্থবাদীকে নিন্দক বলিয়া যেন অবজ্ঞা করিও না। রাজারা আপন চক্ষে কিছুই দেখিতে পান না এবং এরূপ হতভাগ্য লোকদ্বারা পরিবৃত থাকেন,—প্রতারণা করাই যাহাদিগের সম্পূর্ণ মানস; তাহারা প্রভুকে প্রতারণা করিয়া আপন অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে পারিলেই চরিতার্থ হয় ও সর্ব্বদা উহারই চেষ্টা পায়। বাহ্য ভক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক আপনাদিগের দুষ্ট অভিপ্রায় গোপন করিয়া রাখে, সময় পাইলেই চাটুবচনে প্রভুকে প্রতারিত করিয়া লোকের সর্ব্বনাশ করে। তুমি স্বভাবতঃ ধীর; তথাপি তোমাকে বারংবার উপদেশ দিতেছি, সাবধান! যেন ধন- ও যৌবন-মদে উন্মত্ত হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ ও অসদাচরণে প্রবৃত্ত হইও না। এক্ষণে মহারাজের ইচ্ছাক্রমে অভিনব যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া কুলক্রমাগত ভূভার বহন কর, অরাতিমণ্ডলের মস্তক অবনত কর, এবং সমুদায় দেশ জয় করিয়া অখণ্ড ভূমণ্ডলে আপন আধিপত্য স্থাপনপূর্ব্বক প্রজাদিগের প্রতিপালন কর।” —এইরূপ উপদেশ দিয়া অমাত্য ক্ষান্ত হইলেন। চন্দ্রাপীড়

শুকনাসের গভীর অর্থযুক্ত উপদেশ-বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে উহারই আন্দোলন করিতে করিতে বাটী গমন করিলেন।

অভিষেকসামগ্রী সমাহৃত হইলে অমাত্য ও পুরোহিতের সহিত রাজা শুভ দিনে ও শুভ লগ্নে তীর্থ, নদী ও সাগর হইতে আনীত মন্ত্রপূত বারি-দ্বারা রাজকুমারের অভিষেক করিলেন। লতা যেরূপ এক বৃক্ষ হইতে শাখা-দ্বারা বৃক্ষান্তর আশ্রয় করে, সেইরূপ রাজ-সংক্রান্ত রাজলক্ষ্মী অংশক্রমে যুবরাজকে অবলম্বন করিলেন। পবিত্র তীর্থজলে স্নান করিয়া রাজকুমার উজ্জ্বল শ্রী প্রাপ্ত হইলেন। অভিষেকানন্তর ধবল বসন, উজ্জ্বল ভূষণ ও মনোহর মাল্য ধারণপূর্ব্বক অঙ্গে সুগন্ধি গন্ধদ্রব্য লেপন করিলেন। অনন্তর সভামণ্ডপে প্রবেশপূর্ব্বক শশধর যেরূপ সুমেরুশৃঙ্গে আরোহণ করিলে শোভা হয়, যুবরাজ সেইরূপ রত্নসিংহাসনে উপবেশন করিয়া সভার পরম শোভা সম্পাদন করিলেন। নব নব উপায়-দ্বারা প্রজাদিগের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি ও রাজ্যের সুনিয়ম সংস্থাপন করিয়া পরম সুখে যৌবরাজ্য সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। রাজাও পুত্রকে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

তারাশঙ্কর তর্করত্ন

একা

(শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীর উক্তি)

"কে গায় ওই ?"

বহুকাল-বিস্মৃত সুখস্বপ্নের স্মৃতির ন্যায় ঐ মধুর গীতি কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। এত মধুর লাগিল কেন? এই সঙ্গীত যে অতি সুন্দর, এমত নহে। পথিক পথ দিয়া আপন মনে গায়িতে গায়িতে যাইতেছে। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি দেখিয়া তাহার মনে আনন্দ উছলিয়া উঠিতেছে। স্বভাবতঃ তাহার কণ্ঠ মধুর;—মধুর কণ্ঠে, এই মধুমাসে, আপনার মনেব সুখের মাধুর্য্য বিকীর্ণ করিতে করিতে যাইতেছে। তবে বহুতন্ত্রীবিশিষ্ট বাদ্যের তন্ত্রীতে অঙ্গুলী-স্পর্শের ন্যায় ঐ গীতিধ্বনি আমার হৃদয়কে আলোড়িত করে কেন?

কেন, কে বলিবে? রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী—নদী-সৈকতে কৌমুদী হাসিতেছে। রাজপথে কেবল আনন্দ—বালক, বালিকা, যুবক, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা বিমল চন্দ্রকিরণে স্নাত হইয়া আনন্দ করিতেছে। (আমিই কেবল নিরানন্দ—তাই ঐ সঙ্গীতে আমার হৃদয়-যন্ত্র বাজিয়া উঠিল।)

আমি একা—তাই এই সঙ্গীতে আমার শরীর কণ্টকিত হইল। এই বহুজনাকীর্ণ নগরীমধ্যে, এই আনন্দময় অনন্ত

জনস্রোতোমধ্যে, আমি একা। আমিও কেন ঐ অনন্ত জনস্রোতোমধ্যে মিশিয়া, এই বিশাল আনন্দতরঙ্গ-তাড়িত জলবুদ্‌বুদসমূহের মধ্যে আর একটি বুদ্‌বুদ না হই? বিন্দু বিন্দু বারি লইয়া সমুদ্র, আমি বারিবিন্দু, এ সমুদ্রে মিশাই না কেন?

তাহা জানি না—কেবল ইহাই জানি যে, আমি একা। কেহ একা থাকিও না। যদি অন্য কেহ তোমার প্রণয়ভাগী না হইল, তবে তোমার মনুষ্যজন্ম বৃথা। পুষ্প সুগন্ধি, কিন্তু যদি ঘ্রাণ-গ্রহণকর্ত্তা না থাকিত, তবে পুষ্প সুগন্ধি হইত না। পুষ্প আপনার জন্যও ফুটে না। পরের জন্য তোমার হৃদয়-কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।

কিন্তু বারেকমাত্র শ্রুত ঐ সঙ্গীত আমার কেন এত মধুর লাগিল, তাহা বলি নাই। অনেক দিন আনন্দোত্থিত সঙ্গীত শুনি নাই—অনেক দিন আনন্দানুভব করি নাই। যৌবনে যখন পৃথিবী সুন্দরী ছিল, যখন প্রতি পুষ্পে সুগন্ধ পাইতাম, প্রতি পত্রমর্ম্মরে মধুর শব্দ শুনিতাম, প্রতি নক্ষত্রে চিত্রারোহিণীর শোভা দেখিতাম, প্রতি মনুষ্য-মুখে সরলতা দেখিতাম, তখন আনন্দ ছিল। পৃথিবী এখনও তাই আছে, সংসার এখনও তাই আছে, মনুষ্যচরিত্র এখনও তাই আছে, কিন্তু এ হৃদয় আর তাই নাই। তখন সঙ্গীত শুনিয়া আনন্দ হইত, আজি এই সঙ্গীত শুনিয়া সেই আনন্দ মনে পড়িল। যে অবস্থায়, যে সুখে, সেই আনন্দ অনুভব করিতাম,—সেই অবস্থা, সেই সুখ মনে পড়িল। মুহূর্ত্তজন্য আবার যৌবন ফিরিয়া পাইলাম। আবার তেমনি করিয়া মনে মনে সমবেত বন্ধুমণ্ডলীমধ্যে বসিলাম; আবার সেই অকারণসঞ্জাত উচ্চ হাসি হাসিলাম, যে কথা নিষ্প্রয়োজনীয় বলিয়া এখন

বলি না, নিষ্প্রয়োজনেও চিত্তের চাঞ্চল্য-হেতু তখন বলিতাম,—আবার সেই সকল বলিতে লাগিলাম; আবার অকৃত্রিম হৃদয়ে পরের প্রণয় অকৃত্রিম বলিয়া মনে মনে গ্রহণ করিলাম। ক্ষণিক ভ্রান্তি জন্মিল—তাই এ সঙ্গীত এত মধুর লাগিল। শুধু তাই নয়। তখন সঙ্গীত ভাল লাগিত—এখন লাগে না—চিত্তের যে প্রফুল্লতার জন্য ভাল লাগিত, সে প্রফুল্লতা নাই বলিয়া ভাল লাগে না। আমি মনের ভিতর মন লুকাইয়া সেই গত যৌবন-সুখ চিন্তা করিতেছিলাম—সেই সময়ে এই পূর্ব্বস্মৃতিসূচক সঙ্গীত কর্ণে প্রবেশ করিল, তাই এত মধুর বোধ হইল।

সে প্রফুল্লতা, সে সুখ আর নাই কেন? সুখের সামগ্রী কি কমিয়াছে? অর্জ্জন এবং ক্ষতি উভয়ই সংসারের নিয়ম। কিন্তু ক্ষতি অপেক্ষা অর্জ্জন অধিক, ইহাও নিয়ম। তুমি জীবনের পথ যতই অতিবাহিত করিবে, ততই সুখদ সামগ্রী সঞ্চয় করিবে। তবে বয়সে স্ফূর্ত্তি কমে কেন? পৃথিবী আর তেমন সুন্দরী দেখা যায় না কেন? আকাশের তারা আর তেমন জ্বলে না কেন? আকাশের নীলিমায় আর সে উজ্জ্বলতা থাকে না কেন? যাহা তৃণপল্লবময়, কুসুমসুবাসিত, স্বচ্ছ-কল্লোলিনী-শীকর-সিক্ত বসন্ত-পবনবিধূত বলিয়া বোধ হইত, এখন তাহা বালুকাময়ী মরুভূমি বলিয়া বোধ হয় কেন? কেবল রঙ্গিল কাচ নাই বলিয়া। আশা সেই রঙ্গিল কাচ। যৌবনে অর্জ্জিত সুখ অল্প, কিন্তু সুখের আশা অপরিমিতা। এখন অর্জ্জিত সুখ অধিক, কিন্তু সেই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী আশা কোথায়? (তখন জানিতাম না, কিসে কি হয়,—অনেক আশা করিতাম। এখন জানিয়াছি, এই সংসার-চক্রে আরোহণ করিয়া যেখানকার, আবার সেইখানে ফিরিয়া আসিতে

হইবে; যখন মনে ভাবিতেছি, এই অগ্রসর হইলাম, তখন কেবল আবর্ত্তন করিতেছি মাত্র।) এখন বুঝিয়াছি যে, সংসার-সমুদ্রে সন্তরণ আরম্ভ করিলে, তরঙ্গে তরঙ্গে আমাকে প্রহত করিয়া আবার আমাকে কূলে ফেলিয়া যাইবে। এখন জানিয়াছি যে, এ অরণ্যে পথ নাই, এ প্রান্তরে জলাশয় নাই, এ নদীর পার নাই, এ সাগরে দ্বীপ নাই, এ অন্ধকারে নক্ষত্র নাই। এখন জানিয়াছি যে, কুসুমে কীট আছে, কোমল পল্লবে কণ্টক আছে, আকাশে মেঘ আছে, নির্ম্মলা নদীতে আবর্ত্ত আছে, ফলে বিষ আছে, উদ্যানে সর্প আছে, মনুষ্যহৃদয়ে কেবল আত্মাদর আছে। এখন জানিয়াছি যে, বৃক্ষে বৃক্ষে ফল ধরে না, ফুলে ফুলে গন্ধ নাই, মেঘে মেঘে বৃষ্টি নাই, বনে বনে চন্দন নাই, গজে গজে মৌক্তিক নাই। (এখন বুঝিতে পারিয়াছি যে, (কাচও হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল, পিত্তলও সুবর্ণের ন্যায় ভাস্বর, পঙ্কও চন্দনের ন্যায় স্নিগ্ধ, কাংস্যও রজতের ন্যায় মধুরনাদী)—

কিন্তু কি বলিতেছিলাম, ভুলিয়া গেলাম। সেই গীতধ্বনি! উহা ভাল লাগিয়াছিল বটে, কিন্তু আর দ্বিতীয় বার শুনিতে চাহি না। উহা যেমন মনুষ্যকণ্ঠজাত সঙ্গীত, তেমনি সংসারের এক সঙ্গীত আছে, সংসাররসে রসিকেরাই তাহা শুনিতে পায়। সেই সঙ্গীত শুনিবার জন্য আমার চিত্ত বড়ই আকুল। সে সঙ্গীত আর কি শুনিব না? শুনিব, কিন্তু নানাবাদ্যধ্বনি-সম্মিলিত, বহুকণ্ঠপ্রসূত সেই পূর্ব্বশ্রুত সংসারগীত আর শুনিব না। সে গায়কেরা আর নাই—সে বয়স্ নাই, সে আশা নাই। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যাহা শুনিতেছি, তাহা অধিকতর প্রীতিকর। অনন্যসহায় একমাত্র-গীতি-ধ্বনিতে কর্ণবিবর পরিপূরিত হইতেছে। প্রীতি সংসারে

সর্ব্বব্যাপিনী—প্রীতিই ঈশ্বর। প্রীতিই আমার কর্ণে এক্ষণকার সংসারসঙ্গীত। অনন্তকাল সেই মহাসঙ্গীত-সহিত মনুষ্য-হৃদয়তন্ত্রী বাজিতে থাকুক। মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আমার দুর্গোৎসব

(শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীর উক্তি)

সপ্তমী পূজার দিন আমি কেন প্রতিমা দেখিতে গেলাম! যাহা কখন দেখিব না, তাহা কেন দেখিলাম! এ কুহক কে দেখাইল!

দেখিলাম—অকস্মাৎ কালের স্রোত দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রবলবেগে ছুটিতেছে—আমি ভেলায় চড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছি। দেখিলাম—অনন্ত, অকূল অন্ধকারে বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গসঙ্কুল সেই স্রোত—মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রগণ উদয় হইতেছে, নিবিতেছে—আবার উঠিতেছে। আমি নিতান্ত একা—একা বলিয়া ভয় করিতে লাগিল—নিতান্ত একা—মাতৃহীন—'মা! মা!' করিয়া ডাকিতেছি। আমি এই কাল-সমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা? কই আমার মা? কোথায় কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি! এ ঘোর কাল-সমুদ্রে কোথায় তুমি?—সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল—দিঙ্মণ্ডলে প্রভাতারুণোদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল—স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল—সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে, দূরপ্রান্তে দেখিলাম—সুবর্ণমণ্ডিতা, এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা! জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে! এই কি মা? হাঁ, এই মা! চিনিলাম, এই আমার জননী—জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী—অনন্ত-

রত্নভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশ ভুজ—দশ দিক্—দশ দিকে প্রসারিত; তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত—পদাশ্রিত বীরজন-কেশরী শত্রু-নিপীড়নে নিযুক্ত! এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না—কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না;—কিন্তু একদিন দেখিব—দিগ্‌ভুজা, নানা-প্রহরণপ্রহারিণী শত্রুমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠ-বিহারিণী,—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যা-বিজ্ঞান-মূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোতোমধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা।

কোথায় ফুল পাইলাম, বলিতে পারি না—কিন্তু সেই প্রতিমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম,—ডাকিলাম, সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে, আমার সর্ব্বার্থসাধিকে! অসংখ্যসন্তানকুল-পালিকে! ধর্ম্ম-অর্থ-সুখ-দুঃখ-দায়িকে! আমার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ কর। এই ভক্তি-প্রীতি-বৃত্তি-শক্তি করে লইয়া তোমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছি, তুমি এই অনন্তজলমণ্ডল ত্যাগ করিয়া এই বিশ্ববিমোহিনী মূর্ত্তি একবার জগৎসমীপে প্রকাশ কর। এসো মা! নবরাগরঙ্গিণি, নব-বলধারিণি, নবদর্পে দর্পিণি, নবস্বপ্নদর্শিনি!—এসো মা, গৃহে এসো —ছয় কোটি সন্তানে একত্রে এককালে, দ্বাদশ কোটি কর যোড় করিয়া তোমার পাদপদ্ম পূজা করিব। ছয় কোটি মুখে ডাকিব,—মা প্রসূতি অম্বিকে! ধাত্রি ধরিত্রি ধনধান্যদায়িকে! নগাঙ্ক-শোভিনি নগেন্দ্রবালিকে! শরৎসুন্দরি চারুপূর্ণচন্দ্রভালিকে! ডাকিব,—সিন্ধু-সেবিতে সিন্ধু-পূজিতে সিন্ধু-মথনকারিণি! শত্রুবধে দশভুজে দশপ্রহরণধারিণি অনন্তশ্রীঃ অনন্তকাল-স্থায়িনি! শক্তি দাও সন্তানে, অনন্তশক্তি-প্রদায়িনি! তোমায় কি বলিয়া ডাকিব,

মা? এই ছয় কোটি মুণ্ড ঐ পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত করিব—এই ছয় কোটি কণ্ঠে ঐ নাম করিয়া হুঙ্কার করিব—এই ছয় কোটি দেহ তোমার জন্য পতন করিব—না পারি, এই দ্বাদশ কোটি চক্ষে তোমার জন্য কাঁদিব। এসো মা, গৃহে এসো—যাঁহার ছয় কোটি সন্তান, তাঁহার ভাবনা কি?

দেখিতে দেখিতে আর দেখিলাম না—সেই অনন্ত কাল-সমুদ্রে সেই প্রতিমা ডুবিল! অন্ধকারে সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশি ব্যাপিল, জলকল্লোলে বিশ্বসংসার পূরিল! তখন যুক্তকরে সজল-নয়নে ডাকিতে লাগিলাম,—উঠ মা হিরণ্ময়ি বঙ্গভূমি! উঠ মা! এবার সুসন্তান হইব, সৎপথে চলিব—তোমার মুখ রাখিব। উঠ মা, দেবি দেবানুগৃহীতে! এবার আপনা ভুলিব—ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব—অধর্ম্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব—উঠ মা, একা রোদন করিতেছি, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল মা!

উঠ উঠ মা! উঠ বঙ্গজননি!—মা উঠিলেন না। উঠিবেন না কি?

এসো ভাই-সকল! আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই! এসো আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া, ছয় কোটি মাথায় বহিয়া ঘরে আনি। এসো, অন্ধকারে ভয় কি? ঐ যে নক্ষত্র মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে, নিবিতেছে, উহারা পথ দেখাইবে—চল! চল! অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে এই কাল-সমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়া আমরা সন্তরণ করি—সেই স্বর্ণপ্রতিমা মাথায় করিয়া আনি। ভয় কি? না হয় ডুবিব, মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি? আইস, প্রতিমা তুলিয়া আনি, বড় পূজার ধূম বাধিবে। দ্বেষক-ছাগকে হাড়িকাঠে ফেলিয়া সৎকীর্ত্তি-খড়্গে

মায়ের কাছে বলি দিব—কত পুরাবৃত্তকার-ঢাকী ঢাক ঘাড়ে করিয়া বঙ্গের বাজনা বাজাইয়া আকাশ ফাটাইবে—কত ঢোল, কাঁসি, কাড়ানাগরায় বঙ্গের জয় বাদিত হইবে। কত সানাই পোঁ ধরিয়া গাইবে, "কত নাচ গো!"—বড় পূজার ধূম বাধিবে। কত ব্রাহ্মণপণ্ডিত লুচি-মণ্ডার লোভে বঙ্গপূজায় আসিয়া পাতড়া মারিবে—কত দেশ-বিদেশী ভদ্রাভদ্র আসিয়া মায়ের চরণে প্রণামি দিবে—কত দীন-দুঃখী প্রসাদ খাইয়া উদর পূরিবে! কত নর্ত্তকী নাচিবে, কত গায়কে মঙ্গল গায়িবে, কত কোটি ভক্ত ডাকিবে, 'মা! মা! মা!'

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিড়াল

(শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীর উক্তি)

আমি শয়ন-গৃহে চারপায়ীর উপর বসিয়া, হুঁকা-হাতে ঝিমাইতে ছিলাম। একটু মিট্ মিট্ করিয়া ক্ষুদ্র আলো জ্বলিতেছে—দেয়ালের উপর চঞ্চল ছায়া প্রেতবৎ নাচিতেছে। আহার প্রস্তুত হয় নাই—এ জন্য হুঁকা-হাতে, নিমীলিত-লোচনে আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি নেপোলেয়ন হইতাম, তবে ওয়াটালু জিতিতে পারিতাম কি না? এমন সময়ে একটি ক্ষুদ্র শব্দ হইল, 'মেও'।

চাহিয়া দেখিলাম—হঠাৎ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। প্রথমে মনে হইল, ওয়েলিংটন হঠাৎ বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া আমার নিকট আফিঙ্গ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। প্রথম উদ্যমে পাষাণবৎ কঠিন হইয়া বলিব মনে করিলাম যে, ডিউক মহাশয়কে ইতি-পূর্ব্বে যথোচিত পুরস্কার দেওয়া গিয়াছে, এক্ষণে আর অতিরিক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে না। বিশেষ অপরিমিত লোভ ভাল নহে। ডিউক বলিল, 'মেও'।

তখন চক্ষু চাহিয়া ভাল করিয়া দেখিলাম যে, ওয়েলিংটন নহে, একটি ক্ষুদ্র মার্জ্জার। প্রসন্ন আমার জন্য যে দুগ্ধ রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা নিঃশেষ করিয়া উদরসাৎ করিয়াছে,—আমি ওয়াটালুর মাঠে ব্যূহ রচনায় ব্যস্ত, অত দেখি নাই; এক্ষণে মার্জ্জার-সুন্দরী নির্জ্জল দুগ্ধ-পানে পরিতৃপ্ত হইয়া আপন মনের

সুখ এ জগতে প্রকটিত করিবার অভিপ্রায়ে অতি মধুর স্বরে বলিতেছেন, 'মেও'। বলিতে পারি না, বুঝি তাহার ভিতর একটু ব্যঙ্গ ছিল; বুঝি মার্জ্জার মনে মনে হাসিয়া আমার পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল, "কেহ মরে বিল ছেঁচে, কেহ খায় কই।" বুঝি সে 'মেও' শব্দে একটু মন বুঝিবার অভিপ্রায় করিয়াছিল! বুঝি বিড়ালের মনের ভাব—'তোমার দুধ ত খাইয়া বসিয়া আছি এখন বল কি?' বলি কি? আমি ত ঠিক করিতে পারিলাম না, দুধ আমার বাপেরও নয়। দুধ মঙ্গলার, দুহিয়াছে প্রসন্ন। অতএব সে দুগ্ধে আমারও যে অধিকার, বিড়ালেরও তাই; সুতরাং রাগ করিতে পারি না। তবে চিরাগত একটি প্রথা আছে যে, বিড়াল দুধ খাইয়া গেলে, তাহাকে তাড়াইয়া মারিতে যাইতে হয়। আমি সেই চিরাগত প্রথার অবমাননা করিয়া মনুষ্যকুলে কুলাঙ্গার-স্বরূপ পরিচিত হইব, ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে। কি জানি, এই মার্জ্জারী যদি স্বজাতি-মণ্ডলে কমলাকান্তকে কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করে? অতএব পুরুষের ন্যায় আচরণ করাই বিধেয়। ইহা স্থির করিয়া, সকাতর চিত্তে হস্ত হইতে হুঁকা নামাইয়া, অনেক অনুসন্ধানে এক ভগ্ন যষ্টি আবিষ্কৃত করিয়া সগর্ব্বে মার্জ্জারীর প্রতি ধাবমান হইলাম।

মার্জ্জারী কমলাকান্তকে চিনিত। সে যষ্টি দেখিয়া বিশেষ ভীত হওয়ার কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না; কেবল আমার মুখপানে চাহিয়া হাই তুলিয়া একটু সরিয়া বসিল। বলিল, 'মেও'। প্রশ্ন বুঝিতে পারিয়া যষ্টি ত্যাগ করিয়া পুনরপি শয্যায় আসিয়া হুঁকা লইলাম। তখন দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইয়া মার্জ্জারীর বক্তব্য-সকল বুঝিতে পারিলাম।

বুঝিলাম যে, বিড়াল বলিতেছে, "মারপিট কেন? স্থির হইয়া, হুঁকা হাতে করিয়া, একটু বিচার করিয়া দেখ দেখি! এ সংসারে ক্ষীর, সর, দুগ্ধ, দধি, মৎস্য, মাংস সকলই তোমরা খাইবে, আমরা কিছু পাইব না কেন? তোমরা মনুষ্য, আমরা বিড়াল, প্রভেদ কি? তোমাদের ক্ষুৎপিপাসা আছে, আমাদের কি নাই? তোমরা খাও, আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু আমরা খাইলেই তোমরা কোন্ শাস্ত্রানুসারে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে আইস, তাহা আমি বহু অনুসন্ধানে পাইলাম না। তোমরা আমার কাছে কিছু উপদেশ গ্রহণ কর। বিজ্ঞ চতুষ্পদের কাছে শিক্ষালাভ ব্যতীত তোমাদের জ্ঞানোন্নতির উপায়ান্তর দেখি না। তোমাদের বিদ্যালয়-সকল দেখিয়া আমার বোধ হয়, তোমরা এত দিনে এ কথাটা বুঝিতে পারিয়াছ।

"দেখ, শয্যাশায়ী মনুষ্য! ধর্ম্ম কি? পরোপকারই পরম ধর্ম্ম। এই দুগ্ধটুকু পান করিয়া আমার পরম উপকার হইয়াছে। তোমার আহৃত দুগ্ধে এই পরোপকার সিদ্ধ হইল—অতএব তুমি সেই পরম ধর্ম্মের ফলভাগী—আমি চুরিই করি আর যাই করি, আমি তোমার ধর্ম্ম-সঞ্চয়ের মূলীভূত কারণ। অতএব আমাকে প্রহার না করিয়া, আমার প্রশংসা কর। আমি তোমার ধর্ম্মের সহায়।

"দেখ, আমি চোর বটে, কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি? খাইতে পাইলে কে চোর হয়? দেখ, যাঁহারা বড় বড় সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা অনেকে চোর অপেক্ষাও অধার্ম্মিক। তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও চোরের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহেন না, ইহাতেই চোরে

চুরি করে। চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শত গুণে দোষী।

"দেখ, আমি প্রাচীরে প্রাচীরে মেও মেও করিয়া বেড়াই, কেহ আমাকে মাছের কাঁটাখানাও ফেলিয়া দেয় না। মাছের কাঁটা, পাতের ভাত নর্দ্দমায় ফেলিয়া দেয়, জলে ফেলিয়া দেয়, তথাপি আমাকে ডাকিয়া দেয় না। তোমাদের পেট ভরা, আমার পেটের ক্ষুধা কি প্রকারে জানিবে? হায়! দরিদ্রের জন্য ব্যথিত হইলে তোমাদের কি কিছু অগৌরব আছে? আমার মত দরিদ্রের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। যে কখন অন্ধকে মুষ্টিভিক্ষা দেয় না, সেও একটা বড় রাজা ফাঁপরে পড়িলে রাত্রে ঘুমায় না—সকলেই পরের ব্যথায় ব্যথিত হইতে রাজি। তবে ছোট-লোকের দুঃখে কাতর! ছি! কে হইবে?

"দেখ, যদি অমুক শিরোমণি, কি অমুক ন্যায়ালঙ্কার আসিয়া তোমার দুধটুকু খাইয়া যাইতেন, তবে তুমি কি তাঁহাকে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে আসিতে? বরং যোড় হাত করিয়া বলিতে, 'আর একটু কি আনিয়া দিব?' তবে আমার বেলা লাঠি কেন? তুমি বলিবে তাঁহারা অতি বড় পণ্ডিত, বড় মান্য লোক। পণ্ডিত বা মান্য বলিয়া কি আমার অপেক্ষা তাঁহাদের ক্ষুধা বেশী? তা ত নয়—তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্যজাতির রোগ—দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না। যে খাইতে বলিলে বিরক্ত হয়, তাহার জন্য ভোজের আয়োজন কর—আর যে ক্ষুধার জ্বালায় বিনা আহ্বানেই তোমার অন্ন খাইয়া ফেলে, চোর বলিয়া তাহার দণ্ড কর—ছি! ছি!

"দেখ, আমাদের দশা দেখ। দেখ, প্রাচীরে প্রাচীরে, প্রাঙ্গণে

প্রাঙ্গণে, প্রাসাদে প্রাসাদে, মেও মেও করিয়া আমরা চারি দিক্ দৃষ্টি করিতেছি—কেহ আমাদিগের মাছের কাঁটাখানা ফেলিয়া দেয় না। যদি কেহ তোমাদের সোহাগের বিড়াল হইতে পারিল—গৃহ-মার্জ্জার হইয়া মূর্খ ধনীর কাছে সতরঞ্চ খেলোয়াড়ের স্থানীয় হইয়া থাকিতে পারিল—তবেই তাহার পুষ্টি।

"আর আমাদিগের দশা দেখ—আহারাভাবে উদর কৃশ, অস্থি পরিদৃশ্যমান, লাঙ্গুল বিনত, দাঁত বাহির হইয়াছে—জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে—অবিরত আহারাভাবে ডাকিতেছি, মেও! মেও! খাইতে পাই না। আমাদের কাল চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না! এ পৃথিবীর মৎস্য-মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও—নহিলে চুরি করিব। আমাদের কৃষ্ণ চর্ম্ম, শুষ্ক মুখ, ক্ষীণ সকরুণ মেও মেও শুনিয়া তোমাদের কি দুঃখ হয় না? চোরের দণ্ড আছে, নির্দ্দয়তার কি দণ্ড নাই? দরিদ্রের আহার-সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন? পাঁচ শত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া এক জনে পাঁচ শত লোকের আহার্য্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, তবে সে তাহার খাইয়া যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে; কেন-না, অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।"

আমি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলাম, "থাম! থাম! মার্জ্জার-পণ্ডিতে! তোমার কথাগুলি ভারি সোশিয়ালিষ্টিক! সমাজ-বিশৃঙ্খলার মূল! যদি যাহার যত ক্ষমতা, সে তত ধন সঞ্চয় করিতে না পায়, অথবা সঞ্চয় করিয়া চোরের জ্বালায় নির্ব্বিঘ্নে

ভোগ করিতে না পায়, তবে কেহ আর ধন-সঞ্চয়ে যত্ন করিবে না। তাহাতে সমাজে ধনবৃদ্ধি হইবে না।"

মার্জ্জার বলিল, "না হইল ত আমার কি? সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি। ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের ক্ষতি কি?"

আমি বুঝাইয়া বলিলাম যে, সামাজিক ধনবৃদ্ধি ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই।

বিড়াল রাগ করিয়া বলিল, "আমি যদি খাইতে না পাইলাম, তবে সমাজের উন্নতি লইয়া কি করিব?"

বিড়ালকে বুঝান দায় হইল। (যে বিচারক বা নৈয়ায়িক, কস্মিন্ কালে কেহ তাহাকে কিছু বুঝাইতে পারে না। এ মার্জ্জার সুবিচারক, এবং সুতার্কিকও বটে, সুতরাং না বুঝিবার পক্ষে ইহার অধিকার আছে।) অতএব ইহার উপর রাগ না করিয়া বলিলাম, "সমাজের উন্নতিতে দরিদ্রের প্রয়োজন না থাকিলে না থাকিতে পারে, কিন্তু ধনীদিগের বিশেষ প্রয়োজন; অতএব চোরের দণ্ডবিধান কর্ত্তব্য।"

মার্জ্জারী মহাশয়া বলিলেন, "চোরকে ফাঁসি দাও তাহাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে আর একটি নিয়ম কর। যে বিচারক চোরকে সাজা দিবেন, তিনি আগে তিন দিবস উপবাস করিবেন। তাহাতে যদি তাঁহার চুরি করিয়া খাইতে ইচ্ছা না করে, তবে তিনি স্বচ্ছন্দে চোরকে ফাঁসি দিবেন। তুমি আমাকে লাঠি তুলিয়াছিলে, তুমি অদ্য হইতে তিন দিবস উপবাস করিয়া দেখ। তুমি যদি ইতিমধ্যে কাহারও ভাণ্ডার-ঘরে ধরা না পড়, তবে আমাকে ঠেঙ্গাইয়া মারিও, আমি আপত্তি করিব না।"

বিজ্ঞ লোকের মত এই যে, যখন বিচারে পরাস্ত হইবে, তখন গম্ভীরভাবে উপদেশ প্রদান করিবে। আমি সেই প্রথানুসারে মার্জ্জারকে বলিলাম, "এ সকল অতি নীতিবিরুদ্ধ কথা, ইহার আন্দোলনেও পাপ আছে। মন হইতে এ সকল দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মাচরণে মন দাও। এক্ষণে স্বস্থানে গমন কর। প্রসন্ন কাল কিছু ছানা দিবে। জলযোগের সময় আসিও, উভয়ে ভাগ করিয়া খাইব। অদ্য আর কাহারও হাঁড়ি খাইও না; বরং ক্ষুধায় যদি নিতান্ত অধীরা হও, তবে পুনর্ব্বার আসিও, এক সরিষাভোর আফিঙ্গ দিব।"

মার্জ্জার বলিল, "আফিঙ্গের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তবে হাঁড়ি খাওয়ার কথা ক্ষুধানুসারে বিবেচনা করা যাইবে।"

মার্জ্জার বিদায় হইল।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ললিতগিরি

এক পারে উদয়গিরি, অপর পারে ললিতগিরি, মধ্যে স্বচ্ছসলিলা কল্লোলিনী বিরূপা নদী নীল বারিরাশি লইয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিয়াছে। গিরিশিখরদ্বয়ে আরোহণ করিলে নিম্নে সহস্র সহস্র তালবৃক্ষ-শোভিত ধান্ত বা হরিৎক্ষেত্রে চিত্রিত পৃথিবী অতিশয় মনোমোহিনী দেখা যায়—শিশু যেমন মার কোলে উঠিলে মাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দেখে, মনুষ্য পর্ব্বতারোহণ করিয়া পৃথিবী দর্শন করিলে সেইরূপ দেখে। উদয়গিরি (বর্ত্তমান আল্‌তিগিরি) বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ, কিন্তু ললিতগিরি (বর্ত্তমান নাল্‌তিগিরি) বৃক্ষশূন্য প্রস্তরময়। এককালে ইহার শিখর ও সানুদেশ অট্টালিকা, স্তূপ এবং বৌদ্ধ মন্দিরাদিতে শোভিত ছিল। এখন শোভার মধ্যে শিখরদেশে চন্দনবৃক্ষ, আর মৃত্তিকা-প্রোথিত ভগ্ন গৃহাবশিষ্ট প্রস্তর, ইষ্টক বা মনোমুগ্ধকর প্রস্তরগঠিত মূর্ত্তিরাশি। তাহার দুই-চারিটা কলিকাতার বড় বড় ইমারতের ভিতর থাকিলে কলিকাতার শোভা হইত! হায়! এখন কি না হিন্দুকে ইণ্ডষ্ট্রীয়ল স্কুলে পুতুল-গড়া শিখিতে হয়! কুমারসম্ভব ছাড়িয়া সুইন্‌বর্ন পড়ি, গীতা ছাড়িয়া মিল পড়ি, আর উড়িষ্যার প্রস্তর-শিল্প ছাড়িয়া সাহেবদের চীনের পুতুল হাঁ করিয়া দেখি। আরও কি কপালে আছে, বলিতে পারি না।

আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাই লিখিতেছি। সেই ললিতগিরি আমার চিরকাল মনে থাকিবে। চারি দিকে—যোজনের পর যোজন ব্যাপিয়া—হরিদ্বর্ণ ধান্যক্ষেত্র—মাতা বসুমতীর অঙ্গে বহু-যোজন-বিস্তৃতা পীতাম্বরী শাটী! তাহার উপর মাতার অলঙ্কার-স্বরূপ তালবৃক্ষ-শ্রেণী সহস্র সহস্র, তারপর সহস্র সহস্র তালবৃক্ষ,—সরল, সুপত্র, শোভাময়! মধ্যে নীলসলিলা বিরূপা নীল-পীত পুষ্পময় হরিৎক্ষেত্রমধ্য দিয়া বহিতেছে—সুকোমল গালিচার উপর কে নদী আঁকিয়া দিয়াছে! তাহাকে—চারি পাশে মৃত মহাত্মাদের মহীয়সী কীর্ত্তি। পাথর এমন করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল, সে কি এই আমাদের মত হিন্দু? এমন করিয়া বিনাবন্ধনে যে গাঁথিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু? আর এই প্রস্তরমূর্ত্তি-সকল যে খোদিয়াছিল,—এই দিব্য পুষ্পমাল্যাভরণভূষিত বিকম্পিত-চেলাঞ্চলপ্রবৃদ্ধ সৌন্দর্য্য, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্ত্তিমান্ সম্মিলন-স্বরূপ পুরুষমূর্ত্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? এইরূপ কোপ-প্রেমগর্ব্ব সৌভাগ্যস্ফুরিতাধরা, চীনাম্বরা, তরলিত-রত্নহারা—

> "তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
> মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ···"

এই সকল স্ত্রীমূর্ত্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? তখন হিন্দুকে মনে পড়িল।

তখন মনে পড়িল, উপনিষদ্, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল,

বেদান্ত, বৈশেষিক ; এ সকল হিন্দুর কীর্ত্তি—এ পুতুল কোন্ ছার! তখন মনে করিলাম, হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।

সেই ললিতগিরির পদতলে বিরূপা-তীরে গিরির শরীরমধ্যে হস্তিগুম্ফা নামে এক গুহা ছিল। গুহা বলিয়া, আবার ছিল বলিতেছি কেন? পর্ব্বতের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কি আবার লোপ পায়? কাল বিগুণ হইলে সবই লোপ পায়। গুহাও আর নাই! ছাদ পড়িয়া গিয়াছে, স্তম্ভ-সকল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—তলদেশে ঘাস গজাইতেছে। সর্ব্বস্ব লোপ পাইয়াছে, গুহাটার জন্য দুঃখে কাজ কি?

কিন্তু গুহা বড় সুন্দর ছিল। পর্ব্বতাঙ্গ হইতে ক্ষোদিত স্তম্ভ, প্রাকার প্রভৃতি বড় রমণীয় ছিল। চারি দিকে অপূর্ব্ব প্রস্তরে ক্ষোদিত নরমূর্ত্তি-সকল শোভা করিত। তাহারই দুই-চারিটি আজও আছে। কিন্তু ছাতা পড়িয়াছে, রং জ্বলিয়া গিয়াছে, কাহারও নাক ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও হাত ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও পা ভাঙ্গিয়াছে। পুতুলগুলাও আধুনিক হিন্দুর মত অঙ্গহীন হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দস্যুকবলে কল্যাণী

জ্যৈষ্ঠ মাস, দারুণ রৌদ্র, পৃথিবী অগ্নিময়, বায়ুতে আগুন ছড়াইতেছে, আকাশ তপ্ত তামার চাঁদোয়ার মত, পথের ধূলি-সকল অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ। কল্যাণী ঘামিতে লাগিলেন, কখনও বাব্‌লা গাছের ছায়ায়, কখনও খেজুর গাছের ছায়ায় বসিয়া বসিয়া, শুষ্ক পুষ্করিণীর কর্দ্দমময় জল পান করিয়া, কত কষ্টে পথ চলিতে লাগিলেন। মেয়েটি মহেন্দ্রের কোলে—এক একবার মহেন্দ্র মেয়েকে বাতাস দেন। একবার এক নিবিড়-শ্যামল-পত্ররঞ্জিত সুগন্ধ-কুসুম-সংযুক্ত লতা-বেষ্টিত বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া দুইজনে বিশ্রাম করিলেন। মহেন্দ্র কল্যাণীর শ্রম-সহিষ্ণুতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। বস্ত্র ভিজাইয়া মহেন্দ্র নিকটস্থ পল্বল হইতে জল আনিয়া আপনার ও কল্যাণীর মুখে, হাতে, পায়ে, কপালে সেচন করিলেন। কল্যাণী কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু দুইজনে ক্ষুধায় বড় আকুল হইলেন। তাও সহ্য হয়—মেয়েটির ক্ষুধা-তৃষ্ণা সহ্য হয় না।

অতএব আবার তাহারা পথ বাহিয়া চলিলেন। সেই অগ্নিতরঙ্গ সন্তরণ করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে এক চটীতে পৌছিলেন। মহেন্দ্রের মনে মনে বড় আশা ছিল, চটীতে গিয়া স্ত্রী-কন্যার মুখে শীতল জল দিতে পারিবেন, প্রাণরক্ষার জন্য মুখে আহার দিতে পারিবেন। কিন্তু কই? চটীতে ত মনুষ্য নাই! বড় বড় ঘর পড়িয়া আছে, মানুষ-সকল পলাইয়াছে!

মহেন্দ্র ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া স্ত্রী-কন্যাকে একটি ঘরের ভিতর শোয়াইলেন। বাহির হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাক-হাঁক করিতে লাগিলেন। কাহারও উত্তর পাইলেন না। তখন মহেন্দ্র কল্যাণীকে বলিলেন, "তুমি একটু সাহস করিয়া একা থাক, দেশে যদি গাই থাকে, শ্রীকৃষ্ণ দয়া করুন, আমি দুধ আনিব।" এই বলিয়া একটি মাটির কলসী হাতে করিয়া মহেন্দ্র নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কলসী অনেক পড়িয়াছিল।

মহেন্দ্র চলিয়া গেলেন। কল্যাণী একা বালিকা লইয়া সেই জনশূন্য স্থানে প্রায়-অন্ধকার কুটীরমধ্যে চারি দিক্ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহার মনে বড় ভয় হইতেছিল। কেহ কোথাও নাই, মনুষ্য মাত্রের কোন শব্দ পাওয়া যায় না, কেবল শৃগাল-কুক্কুরের রব। ভাবিতেছিলেন, কেন তাঁহাকে যাইতে দিলাম, না হয় আর কিছুক্ষণ ক্ষুধা-তৃষ্ণা সহ্য করিতাম। মনে করিলেন, চারি দিকে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসি। কিন্তু একটি দ্বারেও কপাট বা অর্গল নাই। এইরূপ চারি দিক্ চাহিয়া দেখিতে দেখিতে সম্মুখস্থ দ্বারে একটা কি ছায়ার মত দেখিলেন। মনুষ্যাকৃতি বোধ হয়, কিন্তু মনুষ্যও বোধ হয় না। অতিশয় শুষ্ক, শীর্ণ, অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ, উলঙ্গ, বিকটাকার মনুষ্যের মত কি আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরে, সেই ছায়া যেন একটা হাত তুলিল; অস্থিচর্ম্ম-বিশিষ্ট, অতি দীর্ঘ, শুষ্ক হস্তের দীর্ঘ শুষ্ক অঙ্গুলি-দ্বারা কাহাকে যেন সঙ্কেত করিয়া ডাকিল। কল্যাণীর প্রাণ শুকাইল। তখন সেইরূপ আর একটা ছায়া—শুষ্ক, কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘাকার, উলঙ্গ—প্রথম ছায়ার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর একটা আসিল। তারপর আর একটা আসিল। কত আসিল। ধীরে ধীরে নিঃশব্দে তাহারা

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। সেই প্রায়-অন্ধকার গৃহ নিশীথ-শ্মশানের মত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। তখন সেই প্রেতবৎ মূর্ত্তি-সকল কল্যাণী এবং তাঁহার কন্যাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কলাণী প্রায় মূর্চ্ছিতা হইলেন। কৃষ্ণবর্ণ শীর্ণ পুরুষেরা তখন কল্যাণী এবং তাঁহার কন্যাকে ধরিয়া তুলিয়া, গৃহের বাহির করিয়া; মাঠ পার হইয়া এক জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিল। কিছুক্ষণ পরে মহেন্দ্র কলসী করিয়া দুগ্ধ লইয়া সেইখানে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই, ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিলেন, কন্যার নাম ধরিয়া—শেষে স্ত্রীর নাম ধরিয়া অনেক ডাকিলেন, কোন উত্তর, কোন সন্ধান পাইলেন না।

যে বনমধ্যে দস্যুরা কল্যাণীকে নামাইল, সে বন অতি মনোহর। আলো নাই, শোভা দেখে এমন চক্ষুও নাই, দরিদ্রের হৃদয়ান্তর্গত সৌন্দর্য্যের ন্যায় সে বনের সৌন্দর্য্য অদৃষ্ট রহিল। দেশে আহার থাকুক বা না থাকুক, বনে ফুল আছে, ফুলের গন্ধে সে অন্ধকারেও আলো বোধ হইতেছিল। মধ্যে পরিষ্কৃত সুকোমল শষ্পাবৃত ভূমিখণ্ডে দস্যুরা কল্যাণী ও তাঁহার কন্যাকে নামাইল। তাহারা তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া বসিল। তখন তাহারা বাদানুবাদ করিতে লাগিল যে, ইহাদিগকে লইয়া কি কবা যায়—যে কিছু অলঙ্কার কল্যাণীর কাছে ছিল, তাহা পূর্ব্বেই তাহারা হস্তগত করিয়াছিল। একদল তাহার বিভাগে ব্যতিব্যস্ত। অলঙ্কারগুলি বিভক্ত হইলে একজন দস্যু বলিল, “আমরা সোণা-রূপা লইয়া কি করিব, একখা যা গহনা লইয়া কেহ আমাকে এক মুঠা চাল দাও, ক্ষুধায় প্রাণ যায়—আজ কেবল গাছের পাতা খাইয়া আছি।” একজন এই কথা বলিলে, সকলেই সেইরূপ বলিয়া গোল করিতে

লাগিল—"চাল দাও," "চাল দাও," "ক্ষুধায় প্রাণ যায়, সোণা-রূপা চাহি না।" দলপতি তাহাদিগকে থামাইতে লাগিল, কিন্তু কেহ থামে না, ক্রমে উচ্চ উচ্চ কথা হইতে লাগিল, গালাগালি হইতে লাগিল, মারামারির উপক্রম। যে, যে অলঙ্কার ভাগ পাইয়াছিল, সে, সে অলঙ্কার রাগে তাহার দলপতির গায়ে ছুড়িয়া মারিল। দলপতি দুই এক জনকে মারিল, তখন সকলে দলপতিকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল। দলপতি অনাহারে শীর্ণ এবং ক্লিষ্ট ছিল, দুই এক আঘাতেই ভূপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তখন ক্ষুধিত, রুষ্ট, উত্তেজিত, জ্ঞানশূন্য দস্যুদলের মধ্যে একজন বলিল, "শৃগাল-কুক্কুরের মাংস খাইয়াছি, ক্ষুধায় প্রাণ যায়, এস ভাই! আজ এই বেটাকে খাই।" তখন সকলে 'জয় কালী!' বলিয়া উচ্চনাদ করিয়া উঠিল। 'বম্ কালী! আজ নরমাংস খাইব!'—এই বলিয়া সেই বিশীর্ণদেহ কৃষ্ণকায় প্রেতবৎ মূর্ত্তি-সকল অন্ধকারে খল খল হাস্য করিয়া, করতালি দিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। দলপতির দেহ পোড়াইবার জন্য একজন অগ্নি জ্বালিতে প্রবৃত্ত হইল। শুষ্ক লতা, কাষ্ঠ, তৃণ আহরণ করিয়া চকমকি-সোলায় আগুন করিয়া, সেই তৃণ-কাষ্ঠ জ্বালিয়া দিল। তখন অল্প অল্প অগ্নি জ্বলিতে জ্বলিতে, পার্শ্ববর্ত্তী আম্র, জম্বীর, পনস, তাল, তিন্তিড়ী, খর্জ্জুর প্রভৃতি বৃক্ষের শ্যামল পল্লবরাজি অল্প অল্প প্রভাসিত হইতে লাগিল। কোথাও পাতা আলোতে জ্বলিতে লাগিল, কোথাও ঘাস উজ্জ্বল হইল। কোথাও অন্ধকার আরও গাঢ় হইল। অগ্নি প্রস্তুত হইলে, একজন শবের পা ধরিয়া টানিয়া আগুনে ফেলিতে গেল। তখন আর একজন বলিল, "রাখ; রও, রও, যদি মহামাংস খাইয়াই আজ প্রাণ রাখিতে হইবে, তবে

এই বুড়ার শুক্না মাংস কেন খাই? আজ যাহা লুটিয়া আনিয়াছি, তাহাই খাইব, এসো ঐ কচি মেয়েটাকে পোড়াইয়া খাই।" আর একজন বলিল, "যাহা হয় পোড়া বাপু, আর ক্ষুধা সয় না।" তখন সকলে লোলুপ হইয়া যেখানে কল্যাণী কন্যা লইয়া শুইয়াছিল, সেই দিকে চাহিল। দেখিল যে, সে স্থান শূন্য,—কন্যাও নাই, মাতাও নাই। দস্যুদিগের বিবাদের সময় সুযোগ দেখিয়া, কল্যাণী কন্যাকে কোলে করিয়া কন্যার মুখে স্তনটি দিয়া বনমধ্যে পলাইয়াছেন। শিকার পলাইয়াছে দেখিয়া মার মার শব্দ করিয়া, সেই প্রেতমূর্ত্তি দস্যুদল চারি দিকে ছুটিল। অবস্থাবিশেষে মনুষ্য হিংস্র জন্তু মাত্র!

বন অত্যন্ত অন্ধকার, কল্যাণী তাহার ভিতর পথ পান না। বৃক্ষলতা-কণ্টকের ঘনবিন্যাসে একে পথ নাই, তাহাতে আবার ঘনান্ধকার। বৃক্ষলতা-কণ্টক ভেদ করিয়া কল্যাণী বনমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। মেয়েটির গায়ে কাঁটা ফুটিতে লাগিল, মেয়েটি মধ্যে মধ্যে কাঁদিতে লাগিল, শুনিয়া দস্যুরা আরও চীৎকার করিতে লাগিল। কল্যাণী এইরূপে রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া অনেক দূর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে চন্দ্রোদয় হইল। এতক্ষণ কল্যাণীর মনে কিছু ভরসা ছিল যে, অন্ধকারে তাঁহাকে দস্যুরা দেখিতে পাইবে না, কিয়ৎক্ষণ খুঁজিয়া নিরস্ত হইবে; কিন্তু এক্ষণে চন্দ্রোদয় হওয়ায় সে ভরসা গেল। চাঁদ আকাশে উঠিয়া বনের মাথার উপর আলো ঢালিয়া দিল; ভিতরে বনের অন্ধকার আলোতে ভিজিয়া উঠিল। অন্ধকার উজ্জ্বল হইল। মাঝে মাঝে ছিদ্রের ভিতর দিয়া আলো বনের ভিতর প্রবেশ করিয়া, উঁকি-ঝুঁকি মারিতে লাগিল। চাঁদ যত উঁচুতে উঠিতে লাগিল, তত আরও আলো বনে ঢুকিতে

লাগিল, অন্ধকার-সকল আরও বনের ভিতর লুকাইতে লাগিল। কল্যাণী কন্যা লইয়া আরও বনের ভিতর লুকাইতে লাগিলেন। তখন দস্যুরা আরও চীৎকার করিয়া চারি দিক্ হইতে ছুটিয়া আসিতে লাগিল, কন্যাটি ভয় পাইয়া আরও চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কল্যাণী তখন নিরস্ত হইয়া আর পলায়নের চেষ্টা করিলেন না। এক বৃহৎ বৃক্ষতলে কণ্টকশূন্য তৃণময় স্থানে বসিয়া কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া কেবল ডাকিতে লাগিলেন, "কোথায় তুমি! যাহাকে আমি নিত্য পূজা করি, নিত্য নমস্কার করি, যাহার ভরসায় এই বনমধ্যেও প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলাম, কোথায় তুমি, হে মধুসূদন!" এই সময়ে ভয়ে, ভক্তির প্রগাঢ়তায়, ক্ষুধাতৃষ্ণার অবসাদে কল্যাণী ক্রমে বাহ্যজ্ঞান-শূন্য, আভ্যন্তরিক চৈতন্যময় হইয়া শুনিতে লাগিলেন, অন্তরীক্ষে স্বর্গীয় স্বরে গীত হইতেছে—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে,
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে!
হরে মুরারে মধুকৈটভারে!"

কল্যাণী বাল্যকালাবধি পুরাণে শুনিয়াছিলেন যে, দেবর্ষি গগন-পথে বীণা-যন্ত্রে হরিনাম করিতে করিতে ভুবন-ভ্রমণ করিয়া থাকেন; তাঁহার মনে সেই কল্পনা জাগরিত হইতে লাগিল। মনে মনে দেখিতে লাগিলেন, শুভ্র-শরীর, শুভ্র-কেশ, শুভ্র-শ্মশ্রু, শুভ্র-বসন, মহাশরীর মহামুনি বীণা হস্তে চন্দ্রালোক-প্রদীপ্ত নীলাকাশ-পথে গায়িতেছেন,—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে!"

ক্রমে গীত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, আরও স্পষ্ট শুনিতে লাগিলেন, "হরে মুরারে মধুকৈটভারে," ক্রমে আরও নিকট, আরও স্পষ্ট—"হরে মুরারে মধুকৈটভারে," শেষে কল্যাণীর মাথার উপর বনস্থলী প্রতিধ্বনিত করিয়া গীত বাজিল, "হরে মুরারে মধুকৈটভারে!" কল্যাণী তখন নয়নোন্মীলন করিলেন। সেই অর্দ্ধস্ফুট বনান্ধকার-বিমিশ্র চন্দ্র-রশ্মিতে দেখিলেন, সম্মুখে সেই শুভ্র-শরীর, শুভ্র-কেশ, শুভ্র-শ্মশ্রু, শুভ্র-বসন ঋষিমূর্ত্তি! অন্যমনে তথাভূতচেতনে কল্যাণী মনে করিলেন প্রণাম করিব, কিন্তু প্রণাম করিতে পারিলেন না, মাথা নোয়াইতে একেবারে চেতনাশূন্য হইয়া ভূতলশায়িনী হইলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাহুবল ও বাক্যবল

বাহুবল কাহাকে বলি এবং বাক্যবল কাহাকে বলি, তাহা প্রথমে বুঝাইব। তৎপরে এই বলের প্রয়োগ বুঝাইব, এবং এই দুই বলের প্রভেদ ও তারতম্য দেখাইব।

কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না যে, যে বলে ব্যাঘ্র হরিণ-শিশুকে হনন করিয়া ভোজন করে, আর যে বলে অস্তর্লিজ বা সেডান জিত হইয়াছিল, তাহা একই বল ;—দুই-ই বাহুবল।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, কেবল বাহুবলে কখনও কোন সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় নাই—কেবল বাহুবলে পানিপত বা সেডান জিত হয় নাই—কেবল বাহুবলে নেপোলেয়ন বা মার্লবরো বীর নহে। স্বীকার করি, কিছু কৌশল—অর্থাৎ বুদ্ধিবল—বাহুবলের সঙ্গে সংযুক্ত না হইলে কার্য্যকারিতা ঘটে না। কিন্তু ইহা কেবল মনুষ্যবীরের কার্য্য নহে। কেহ কি মনে করে যে, বিনাকৌশলে টিক্‌টিকি মাছি ধরে, কি বিড়াল ইঁদুর ধরে? বুদ্ধিবলের সহযোগ ভিন্ন বাহুবলের স্ফূর্ত্তি নাই—এবং বুদ্ধিবল ব্যতীত জীবের কোন বলেরই স্ফূর্ত্তি নাই।

অতএব ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে যে, যে বলে পশুগণ এবং মনুষ্যগণ উভয়ে প্রধানতঃ স্বার্থ-সাধন করে, তাহাই বাহুবল। প্রকৃতপক্ষে ইহা পশুবল, কিন্তু কার্য্যে সর্ব্বক্ষম, এবং সর্ব্বত্রই শেষ-নিষ্পত্তি-স্থল। যাহার আর কিছুতেই নিষ্পত্তি হয় না—তাহার নিষ্পত্তি বাহুবলে। এমন গ্রন্থি নাই যে, ছুরিতে কাটা যায় না—এমন প্রস্তর নাই যে, আঘাতে ভাঙ্গে না। বাহুবল ইহজগতের

উচ্চ আদালত—সকল আপীলের উপর আপীল এইখানে; ইহার উপর আর আপীল নাই। বাহুবল পশুর বল; কিন্তু মনুষ্য অদ্যাপি কিয়দংশে পশু, এ জন্য বাহুবল মনুষ্যের প্রধান অবলম্বন।

কিন্তু পশুগণের বাহুবলে এবং মনুষ্যের বাহুবলে একটু গুরুতর প্রভেদ আছে। পশুগণের বাহুবল নিত্য ব্যবহার করিতে হয়—মনুষ্যের বাহুবল নিত্য ব্যবহারের প্রয়োজন নাই। ইহার কারণ দুইটি। বাহুবল অনেক পশুগণের একমাত্র উদর-পূর্ত্তির উপায়। দ্বিতীয় কারণ, পশুগণ প্রযুক্ত-বাহুবলের বশীভূত বটে, কিন্তু প্রয়োগের পূর্ব্বে প্রয়োগ-সম্ভাবনা বুঝিয়া উঠে না; এবং সমাজবদ্ধ নহে বলিয়া বাহুবল-প্রয়োগের প্রয়োজন নিবারণ করিতে পারে না। উপন্যাসে কথিত আছে যে, এক বনের পশুগণ কোন সিংহ-কর্ত্তৃক বন্যপশুগণ নিত্য হত হইতেছে দেখিয়া, সিংহের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিল যে, প্রত্যহ পশুগণের উপর পীড়ন করিবার প্রয়োজন নাই—একটি একটি পশু প্রত্যহ তাঁহার আহার-জন্য উপস্থিত হইবে। এ স্থলে পশুগণ সমাজনিবদ্ধ মনুষ্যের ন্যায় আচরণ করিল,—সিংহ-কর্ত্তৃক বাহুবলের নিত্য-প্রয়োগ নিবারণ করিল। মনুষ্য বুদ্ধি-দ্বারা বুঝিতে পারে যে, কোন্ অবস্থায় বাহুবল প্রযুক্ত হইবার সম্ভাবনা, এবং সামাজিক শৃঙ্খলের দ্বারা তাহাকে নিবারণ করিতে পারে। রাজা মাত্রই বাহুবলে রাজা, কিন্তু নিত্য বাহুবল-প্রয়োগের দ্বারা তাঁহাদিগকে প্রজাপীড়ন করিতে হয় না। প্রজাগণ দেখিতে পায় যে, এই এক লক্ষ সৈনিক পুরুষ রাজার আজ্ঞাধীন; রাজাজ্ঞার বিরোধ তাহাদের কেবল ধ্বংসের কারণ হইবে। অতএব প্রজা বাহুবল-প্রয়োগ-সম্ভাবনা দেখিয়া, রাজাজ্ঞা-বিরোধী হয় না, বাহুবলও প্রযুক্ত হয় না। অথচ বাহুবল-

প্রয়োগের যে উদ্দেশ্য, তাহা সিদ্ধ হয়। এ দিকে এক লক্ষ সৈন্য যে রাজার আজ্ঞাধীন, তাহারও কারণ রাজার অর্থ অথবা অনুগ্রহ। রাজার অর্থ যে রাজার কোষগত, বা প্রজার অনুগ্রহ যে তাঁহার হস্তগত, সেটুকু সামাজিক নিয়মের ফল। অতএব এ স্থলে বাহুবল যে প্রযুক্ত হইল না, তাহার মুখ্য কারণ মনুষ্যের দূরদৃষ্টি, গৌণ কারণ সমাজ-বন্ধন।

আমরা এ প্রবন্ধে গৌণ কারণটি ছাড়িয়া দিলেও দিতে পারি। সামাজিক অত্যাচার যে যে বলে নিরাকৃত হয়, তাহার আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত। সমাজ নিবদ্ধ না হইলে সামাজিক অত্যাচারের অস্তিত্ব নাই; সমাজবন্ধন সকল সামাজিক অবস্থার নিত্য কারণ। যাহা নিত্য কারণ, বিকৃতির কারণানুসন্ধানে তাহা ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে।

ইহা বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, এইরূপ করিলে আমাদিগের শাসনের জন্য বাহুবল প্রযুক্ত হইবে—এই বিশ্বাসই বাহুবল-প্রয়োগ-নিবারণের মূল। কিন্তু মনুষ্যের দূরদৃষ্টি সকল সময়ে সমান নহে—সকল সময়ে বাহুবল-প্রয়োগের আশঙ্কা করে না। অনেক সময়েই যাঁহারা সমাজের মধ্যে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি তাঁহারাই বুঝিতে পারেন যে, এই এই অবস্থায় বাহুবল-প্রয়োগের সম্ভাবনা; তাঁহারা অন্যকে সেই অবস্থা বুঝাইয়া দেন। লোকে তাহাতে বুঝে। বুঝে যে, যদি আমরা এই সময়ে কর্ত্তব্য-সাধন না করি, তবে আমাদিগের উপর বাহুবল-প্রয়োগের সম্ভাবনা। বুঝে যে, বাহুবল-প্রয়োগে কতকগুলি অশুভ ফলের সম্ভাবনা। সেই সকল অশুভ ফল আশঙ্কা করিয়া যাহারা বিপরীতপথগামী, তাহারা গন্তব্য পথে গমন করে।

অতএব যখন সমাজের এক ভাগ অপর ভাগকে পীড়িত করে, তখন সেই পীড়ন-নিবারণের দুইটি উপায়। প্রথম, বাহুবল-প্রয়োগ। যখন রাজা প্রজাকে উৎপীড়ন করিয়া সহজে নিরস্ত হয়েন না, তখন প্রজা বাহুবল-প্রয়োগ করে। কখনও কখনও রাজাকে যদি কেহ বুঝাইতে পারে যে, এইরূপ উৎপীড়নে প্রজাগণ-কর্তৃক বাহুবল-প্রয়োগের আশঙ্কা, তবে রাজা অত্যাচার হইতে নিরস্ত হয়েন।

ইংলণ্ডের প্রথম চার্লস্ যে, প্রজাগণের বাহুবলে শাসিত হইয়াছিলেন, তাহা সকলে অবগত আছেন। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় জেম্‌স্, বাহুবল-প্রয়োগের উদ্যম দেখিয়াই দেশপরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু এরূপ বাহুবল-প্রয়োগের প্রয়োজন সচরাচর ঘটে না। বাহুবলের আশঙ্কাই যথেষ্ট। অসীমপ্রতাপশালী ভারতীয় ইংরেজগণ যদি বুঝেন যে, কোন কার্য্যে প্রজাগণ অসন্তুষ্ট হইবে, তবে সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না। ১৮৫৭।৫৮ সালে দেখা গিয়াছে, ভারতীয় প্রজাগণ বাহুবলে তাঁহাদিগের সমকক্ষ নহে। তথাপি প্রজার সঙ্গে বাহুবলের পরীক্ষা সুখদায়ক নহে। সুতরাং তাঁহারা বাহুবল-প্রয়োগের আশঙ্কা দেখিলে বাঞ্ছিত পথে গতি করেন না।

অতএব কেবল ভাবী ফল বুঝাইতে পারিলেই, বিনাপ্রয়োগে বাহুবলের কার্য্য সিদ্ধ হয়। এই প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিদায়িনী শক্তি আর একটি দ্বিতীয় বল—কথায় বুঝাইতে হয়। এই জন্য আমি ইহাকে বাক্যবল নাম দিয়াছি।

এই বাক্যবল অতিশয় আদরণীয় পদার্থ। বাহুবল মনুষ্য-সংহার প্রভৃতি বিবিধ অনিষ্ট-সাধন করে; কিন্তু বাক্যবল বিনা-

রক্তপাতে বিনা-অস্ত্রাঘাতে বাহুবলের কার্য্য সিদ্ধ করে। অতএব এই বাক্যবল কি, এবং তাহার প্রয়োগ-লক্ষণ ও বিধান কি প্রকার তাহা বিশেষ প্রকারে সমালোচিত হওয়া কর্ত্তব্য। সামাজিক অত্যাচার-নিবারণের পক্ষে বাক্যবল একমাত্র উপায়। অতএব বাক্যবলের বিশেষ প্রকারে উন্নতির প্রয়োজন।

বস্তুতঃ বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবল সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। এ পর্য্যন্ত বাহুবল পৃথিবীর কেবল অবনতিই সাধন করিয়াছে—যাহা কিছু উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা বাক্যবলে। সভ্যতার যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে, তাহা বাক্যবলে। সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প—যাহারই উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা বাক্যবলে। যিনি বক্তা, যিনি কবি, যিনি লেখক--দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, নীতিবেত্তা, ধর্ম্মবেত্তা, ব্যবস্থাবেত্তা—সকলে বাক্যবলেই বলী।

ইহা কেহ মনে না করেন যে, কেবল বাহুবলের প্রয়োগ-নিবারণেই বাক্যবলের পরিণাম, বা তদর্থেই বাক্যবল প্রযুক্ত হয়। মনুষ্য কতকদূর পশুচরিত্র পরিত্যাগ করিয়া উন্নতাবস্থায় দাঁড়াইয়াছে; অনেক সময়ে মনুষ্য ভয়ে ভীত না হইয়াও সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত। যদি সমগ্র সমাজের কখনও এককালে কোন বিষয়ে সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে, তবে সে সৎকার্য্য অবশ্য অনুষ্ঠিত হয়। এই সৎপথে জন-সাধারণের প্রবৃত্তি কখনও কখনও জ্ঞানীর উপদেশ ব্যতীত ঘটে না। সাধারণ মনুষ্যগণ অজ্ঞ; চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে শিক্ষা দেন। সেই শিক্ষাদায়িনী উপদেশমালা যদি যথাবিহিত বলশালিনী হয়, তবেই তাহা সমাজের হৃদয়গত হয়। যাহা সমাজের একবার হৃদয়গত হয়, সমাজ আর তাহা ছাড়ে না, তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়; উপদেশবাক্যবলে আলোড়িত সমাজ বিপ্লুত হইয়া উঠে। বাক্য-

বলে যাদৃশ এইরূপ ইষ্ট সাধিত হয়, বাহুবলে তাদৃশ কখনও ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

মুসা, ইসা, শাক্যসিংহ প্রভৃতি বাহুবলে বলী নহেন—বাক্যবীর মাত্র। কিন্তু ইসা, শাক্যসিংহ প্রভৃতির দ্বারা পৃথিবীর যে ইষ্ট সাধিত হইয়াছে, বাহুবলিগণ-কর্ত্তৃক তাহার শতাংশ নহে। বাহুবলে যে কখনও কোন সমাজে ইষ্টসাধন হয় না, এমন নহে। আত্মরক্ষার জন্য বাহুবলই শ্রেষ্ঠ। আমেরিকার প্রধান উন্নতিসাধন-কর্ত্তা, বাহুবলবীর ওয়াসিংটন। হলণ্ড, বেলজিয়মের প্রধান উন্নতি-সাধনকর্ত্তা, বাহুবলবীর অরেঞ্জের উইলিয়ম। কিন্তু মোটের উপর দেখিতে গেল, দেখা যাইবে যে, বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবলেই জগতের ইষ্ট সাধিত হইয়াছে। বাহুবল পশুর বল—বাক্যবল মনুষ্যের বল। কিন্তু কতকগুলা বকিতে পারিলে বাক্যবল হয় না।—বাক্যের বলকে আমি বাক্যবল বলিতেছি না। বাক্যে যাহা ব্যক্ত হয় তাহারই বলকে বাক্যবল বলিতেছি। চিন্তাশীল চিন্তার দ্বারা জাগতিক তত্ত্ব-সকল মনোমধ্য হইতে উদ্ভূত করেন—বক্তা তাহা বাক্যে লোকের হৃদয়গত করেন। এতদুভয়ের বলের সমবায়কে বাক্যবল বলিতেছি।

অনেক সময়েই এই বল একাধারে নিহিত—কখন কখন বলের আধার পৃথগ্‌ভূত। একত্র হউক, পৃথগ্‌ভূত হউক, উভয়ের সমবায়ই বাক্যবল।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সভ্যতা

আজি কালি যেখানে সেখানে সভ্যতা শব্দটী লইয়া বিলক্ষণ টানাটানি পড়ে। চলিত কথাবার্ত্তায়, সাময়িক পত্রিকায়, ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় উপদেশে, রাজনৈতিক বক্তৃতায়, ঐতিহাসিক বা দার্শনিক প্রবন্ধে ও বহুবিধ মুদ্রিত গ্রন্থে সভ্যতা শব্দের ছড়াছড়ি। ইহাতে মনে হইতে পারে যে, সভ্যতা কাহাকে বলে আমরা বেশ বুঝি। কিন্তু সভ্যতার লক্ষণ কি, জিজ্ঞাসা করিলে দেখিবে অনেকেই সদুত্তর দিতে পারেন না; আর ভিন্ন ভিন্ন মুনির ভিন্ন ভিন্ন মত। কেহ কেহ ভাবেন যে, প্রাচীন ভারতবাসীরা সভ্যতার চরম-সোপানে উঠিয়াছিলেন; কেহ কেহ বলেন, ইংরেজেরাই সভ্যতার সর্ব্বোচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছেন। কেহ আমাদিগের আচার-ব্যবহার সভ্যসমাজের উপযোগী জ্ঞান করেন; কেহ ইংরেজদিগের রীতি-নীতির পক্ষপাতী। কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে, ইংরেজদিগের অনুকরণে আমাদিগের অবনতি হইবে; কেহ কেহ বা ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হন যে, আমরা ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান বুঝিতে শিখিয়াছি, অথচ মাদুরে বসি, হাত দিয়া আহার করি, সর্ব্বদা গায়ে বস্ত্র রাখি না, ও মৃন্ময় দীপের আলোকে লেখা-পড়া করি। শেষোক্ত ব্যক্তিবর্গের কথা শুনিয়া বোধ হয়, তাঁহারা কলিকাতার লালবাজারের মদোন্মত্ত বর্ণজ্ঞানশূন্য গোরাকেও সভ্য বলিতে প্রস্তুত, কিন্তু ধুতিচাদরপরা নিরামিষভোজী নির্ম্মলজলপায়ী সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকেও অসভ্য শ্রেণীতে স্থান দিতে চাহেন।

সভ্যতা-সম্বন্ধে আমাদিগের মধ্যে এরূপ মতভেদ হইবার প্রথম কারণ এই যে, আমরা এক্ষণে দুইটী প্রতিকূল স্রোতের মাঝে পড়িয়াছি : (১) দেশীয় শিক্ষা এবং (২) বিলাতি শিক্ষা। দেশীয় শিক্ষা আমাদিগকে এক দিকে লইয়া যাইতেছে ; বিলাতি শিক্ষা আর এক দিকে। দেশীয় শিক্ষা আমাদিগকে বলিতেছে যে, এতদ্দেশীয় প্রাচীন রীতি-নীতি, চিরাগত আচার-ব্যবহার ও কর্ম্ম-কাণ্ড উত্তম। বিলাতি শিক্ষা পদে পদে তাহাদিগের প্রতি দোষারোপ করিতেছে এবং তাহাদিগের অপেক্ষা ভাল বলিয়া পাশ্চাত্ত্য রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ও কর্ম্ম-কাণ্ড আমাদিগের সম্মুখে আদর্শ-স্বরূপ ধরিতেছে। দেশীয় শিক্ষা বলিতেছে যে, ভারতবর্ষের পূর্ব্বকালীন মহিমা পুরাতন প্রণালী-সম্ভূত। বিলাতি শিক্ষা বলিতেছে যে, পুরাতন পথ পরিত্যাগ না করিয়াই ভারতবর্ষ অধঃপাতে গিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় ইহা আশ্চর্য্য নহে যে, কেহ দেশীয় স্রোতে, কেহ-বা বিলাতি স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছেন, এবং কেহ দোটানায় পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন।

সভ্যতা-সম্বন্ধে মতভেদ হইবার দ্বিতীয় কারণ এই যে, গূঢ়ভাবব্যঞ্জক বা বহুগুণবাচক কথা শুনিয়া প্রায়ই মানসপটে তদনুযায়ী একটা স্পষ্ট প্রতিমূর্ত্তি উদিত হয় না ; সুতরাং কথাটী সঙ্গতরূপে ব্যবহৃত হইল কি না অনেক সময়ে আমরা বুঝিতে পারি না। এই কারণেই অনেক সময়ে বড় বড় কথায় লোক ভুলাইয়া থাকে। এই কারণেই অনেক সময়ে "পবিত্র ধর্ম্মের" নামে ভূমণ্ডল প্লাবিত হইয়াছে। এই কারণেই অনেক সময়ে "স্বাধীনতা"র পতাকা উড়াইয়া স্বেচ্ছাচারিতা, ফ্রান্স প্রভৃতি কত দেশে রাজত্ব করিয়াছে। এই কারণেই অনেক সময়ে অসভ্য

জাতিদিগকে "সভ্য" করিবার ছলে তাহাদিগকে নির্ম্মূল বা দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হইয়াছে।

ন্যায়, অন্যায়, সত্য, মিথ্যা, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম প্রভৃতি বড় বড় কথার অর্থ যে অধিকাংশ লোকেই ভাল করিয়া বুঝে না, ইহা ইউনানি পণ্ডিতকুল-চূড়ামণি সক্রেতিস বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। যদি তিনি ভূমণ্ডলে পুনরাগমন করিতে পারিতেন, তিনি দেখিতে পাইতেন যে, দ্বিসহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে আথেন্স মহানগরীতে লোকে অর্থ না বুঝিয়া যেরূপ শব্দ প্রয়োগ করিত, এই উন্নতিগর্ব্বিত ঊনবিংশতি শতাব্দীতেও সভ্যতাভিমানী ব্যক্তিবর্গও সেইরূপ করিয়া থাকেন।

কোন শব্দের ব্যুৎপত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে তাহার অর্থের আভাস কিয়ৎপরিমাণে পাওয়া যায়। ব্যুৎপত্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই জানা যায় যে "পক্ষী" শব্দে পক্ষবিশিষ্ট জীব বুঝায় এবং "উরগ" বলিতে বুকের উপর ভর দিয়া চলে এমন কোন জন্তু বুঝায়। এই প্রণালীতে "সভ্যতা" শব্দের অর্থ নির্ণয় করিতে হইলে দেখা যাইতেছে যে, সমাজবাচক "সভা" শব্দ হইতে সভ্যতা শব্দের উৎপত্তি; সুতরাং সভ্যতা শব্দের অর্থ সামাজিকতা হইতেছে, অর্থাৎ সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইলে যাহা কিছু তদবস্থার উপযোগী, তাহাই সভ্যতার অঙ্গস্বরূপ বলিয়া গণনীয় হইতেছে।

কিন্তু কোন শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখিয়া অনেক সময়ে তাহার প্রচলিত অর্থ জানিতে পারা যায় না। ব্যুৎপত্তি দেখিয়া জানা যায় যে "তৈল" বলিতে প্রথমে তিলের নির্য্যাস বুঝাইত; কিন্তু এক্ষণে আমরা সরিষার তৈল, বাদামের তৈল, মাষ তৈল ইত্যাকার অনেক প্রকার কথা ব্যবহার করিয়া থাকি। সুতরাং প্রচলিত প্রয়োগে তৈল বলিতে কেবল তিলের নির্য্যাস না বুঝাইয়া নানা-

প্রকার নির্য্যাস বুঝাইতেছে। এইরূপ ব্যুৎপত্তি ধরিতে গেলে "অম্লজান" শব্দে যে বায়ুর সংযোগে অম্ল উৎপাদিত হয় সেই বায়ুকে বুঝায়। আদৌ রসায়নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এই অর্থেই "অম্লজান" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে পরীক্ষা-দ্বারা জানা গিয়াছে যে, এমন অনেক অম্ল আছে যাহাতে উক্ত অম্লজান বায়ু নাই। সুতরাং এখন আর ব্যুৎপত্তি দেখিয়া "অম্লজান" শব্দের প্রচলিত অর্থ জানা যায় না। এই প্রকার দোহনবোধক দুহ্ ধাতু হইতে দুহিতা শব্দের উৎপত্তি; কিন্তু এক্ষণে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, গৃহে গাভীদোহন যাহার কার্য্য সে দুহিতা নহে। ব্যুৎপত্তি-অনুসারে যে পালন করে সেই পিতা। এরূপ হইলে অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ বহুসন্তানসত্ত্বেও পিতা নামের অধিকারী নহেন।

এক্ষণে দেখা যাউক কিরূপ স্থলে সভ্য ও অসভ্য শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়া থাকে। যাহাদিগকে আমরা অসভ্যজাতি বলি তাহাদিগের সহিত যদি আমরা সভ্যনামপ্রাপ্ত জাতিদিগের তুলনা করি, তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে যে, অসভ্যজাতি বিচ্ছিন্নভাবে ভ্রমণশীল অল্পসংখ্যক লোকের সমষ্টি; সভ্যজাতিগণ বহুসংখ্যক লোকে একত্র হইয়া গ্রামে ও নগরে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট বাসগৃহে অবস্থিতি করেন। অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে বাণিজ্য-ব্যবসায় প্রায় নাই বলিলেই হয়; সভ্যজাতিদিগের মধ্যে বাণিজ্য-ব্যবসায়ের বাহুল্য। অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিই স্ব-স্ব-প্রধান এবং যুদ্ধোপলক্ষ্য ব্যতিরেকে কদাচিৎ অনেকে সমবেত হইয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; সভ্যজাতিদিগের মধ্যে আসঙ্গলিপ্সা-প্রবৃত্তি বলবতী, পরস্পর পরস্পরের সাহায্য অপেক্ষা

করে, এবং সাধারণ উদ্দেশ্য-সাধনার্থে অনেকে সমবেত হইয়া থাকে। অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে আত্মরক্ষা-জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রায় কেবল স্বীয় ছল-বলের উপর নির্ভর রাখিতে হয়, এবং প্রত্যেকের স্বত্বরক্ষা-জন্য আইন, আদালত বা রাজশাসন নাই; সভ্যজাতিদিগের মধ্যে স্ব-স্ব শরীর ও সম্পত্তি-রক্ষার্থে লোকে আপন-আপন শক্তি-অপেক্ষা সামাজিক শাসনের সহায়তা অবলম্বন করে।

পৃথিবীতে এমন অসভ্যজাতি অল্প, যাহাদিগের মধ্যে সমাজ-বন্ধনের সূত্রপাতমাত্র হয় নাই; এবং অদ্যাপি ভূমণ্ডলে এমন কোন জাতীয় লোক দৃষ্ট হয় না, যাঁহারা সামাজিক অবস্থার সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা এক প্রকার বলা যাইতে পারে যে, সামাজিক ভাবের তারতম্যানুসারেই অনেক পরিমাণে সভ্যতার তারতম্য নির্দ্ধারিত হয়। এই সামাজিক ভাব বলিতে কি বুঝায়, একবার বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। প্রথমতঃ, সমাজান্তর্গত ব্যক্তিবর্গকে এক শাসনসূত্রে আবদ্ধ রাখিতে পারে, এমন একটী নিয়ন্ত্রী শক্তি চাই। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির স্বার্থ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। যাহাতে একের সুখ তাহাতে অন্যের দুঃখ। এইরূপ সাংসারিক স্বার্থবিরোধে সমাজ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। সুতরাং সকলের বিবাদ ভঞ্জন করিতে পারে, সকলের উপর আদেশ চালাইতে পারে এবং কাহাকে আজ্ঞা-পালনে পরাঙ্মুখ দেখিলে উপযুক্ত দণ্ড দিতে পারে, কোন স্থলে এরূপ ক্ষমতা থাকা নিতান্ত আবশ্যক। সমাজ-বন্ধনের মূলে রাজার হস্তেই ঈদৃশ ক্ষমতা থাকে। কিন্তু যত সামাজিক উন্নতি হইতে থাকে, তত ধর্ম্ম, রীতি- ও নীতি-সম্বন্ধীয় শাসনশক্তি লোক-

সাধারণের হস্তে যায়; এবং পরিশেষে প্রজাতন্ত্রপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়া সর্ব্বপ্রকৃতিমণ্ডলীর নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিবর্গের প্রতি সমাজরক্ষার ভার অর্পিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, সমাজমধ্যে কার্য্যবিভাগ আবশ্যক। অসভ্যাবস্থায় লোকে পরস্পরের মুখাপেক্ষী নহে; প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার প্রয়োজনমত সমুদয় কার্য্য করে। একই ব্যক্তি সূত্রধার, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, মৎস্যজীবী, শিকারী, গৃহনির্ম্মাতা ইত্যাদি। ইহাতে কোন কাজই সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় না, কোন দিকে উন্নতি হয় না। যদি ভিন্ন ভিন্ন লোকের হস্তে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য পড়ে, প্রত্যেকেই আপন-আপন কর্ম্মের প্রতি বিশেষরূপ মনোযোগ দিতে পারে, সুতরাং তৎসম্বন্ধে দক্ষতা ও কৌশল দেখাইতে এবং উৎকর্ষলাভ করিতে পারে। এইরূপে পরস্পর-সাপেক্ষতাগুণে কার্য্যবিভাগ-দ্বারা সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের উপকার সাধিত হয়। অতি প্রাচীন কালেই সামাজিক কার্য্যবিভাগ-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে ও মিশরে এইরূপে জাতিশ্রেণী সংস্থাপিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়। ব্রাহ্মণ বা যাজকগণ জ্ঞান ও ধর্ম্মের চর্চ্চা করিবেন। ক্ষত্রিয় বা যোদ্ধা দেশরক্ষা করিবেন। বৈশ্য বা বণিক্ বাণিজ্য ও কৃষির প্রতি মনোযোগ দিবেন। শূদ্র বা দাস অন্য শ্রেণীর লোকের সেবা-শুশ্রূষা করিবেন। কিন্তু এগুলিও কেবল মোটামুটি বিভাগ। ভারতবর্ষে যে সকল মিশ্রবর্ণ জন্মিল, তাহাদিগেরও পুরুষানুক্রমিক ব্যবসায় নির্দ্দিষ্ট হইল। বৈদ্য চিকিৎসক, নাপিত ক্ষৌরকর্ম্মকার, তন্তুবায় বস্ত্রবয়নব্যবসায়ী ইত্যাদি। এ প্রকার নিয়মে প্রথমে বিশেষ উপকার হয়।

যে যাহা শিখিত আপন সন্তান-সন্ততিকে ইচ্ছাপূর্ব্বক শিখাইত ইহাতে এক এক বংশের এক এক বিষয়ে দক্ষতা বাড়িয়া যায়। কিন্তু যখন শ্রেণীবন্ধন এরূপ পাকাপাকি হইয়া গেল যে, এক শ্রেণীর লোক অন্য শ্রেণীতে গৃহীত হইবার সম্ভাবনা থাকিল না, তখন তিনটী অপকার ঘটিল: (১) সাধারণ সমাজ অপেক্ষা আপন শ্রেণীর স্বার্থের দিকে প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকতর দৃষ্টি হইল; (২) অন্য শ্রেণীর সহিত বিবাহবন্ধন রহিত হওয়ায় কোন শ্রেণীতে নূতন বল বা প্রতিভা প্রবিষ্ট হইবার পথ রুদ্ধ হইল; (৩) যে ব্যক্তি স্বশ্রেণীর ব্যবসায় ছাড়িয়া অন্য শ্রেণীর ব্যবসায় অবলম্বন করিলে সমাজের উন্নতি করিতে পারিত, তাহার পায়ে শৃঙ্খল পড়িল। এইরূপে যে সামাজিক পরস্পর-সাপেক্ষতার গুণে কার্য্য-বিভাগ-প্রণালীর সৃষ্টি, পরিণামে তাহারই মূলে কুঠারাঘাত হইল। ঈদৃশ গৃহবিচ্ছেদপূর্ণ সমাজ যে বহিঃশত্রুর আক্রমণ নিবারণ করিতে অসমর্থ হইবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। ভারতবর্ষ এবং মিশরই ইহার সুন্দর দৃষ্টান্তস্থল।

তৃতীয়তঃ, সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইলে পরস্পরের ইচ্ছা- ও অভিপ্রায়-জ্ঞাপনার্থে একটী সাধারণ ভাষা থাকা আবশ্যক। যে ব্যক্তি একাকী বনে বনে ভ্রমণ করে, তরুলতা-পশুপক্ষী যাহার সহচর, ভাষায় তাহার প্রয়োজন নাই। কোকিলের কূজন শুনিয়া সে আনন্দে কুহুরব করে, করুক। নিঃশব্দে বসন্ত-বিহগের গীত শ্রবণ করিলেও তাহার ক্ষতি নাই। সমীরণ-প্রভাবে মহীরুহব্যূহের স্বনন শুনিয়া তদনুকরণ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হয়, হউক। নীরব ভাবুক হইলেও তাহার হানি নাই। কিন্তু মনুষ্যসমাজে বাক্যালাপ না করিলে চলে না। পদে পদে অন্যের

সাহায্য লইতে হয়। যাহা মনে আছে, তাহা প্রকাশ করিয়া না বলিলে কিরূপে সাহায্য মিলিবে? যে যে বস্তুতে যাহার প্রয়োজন আছে, সে সে বস্তুর অক্ষয়ভাণ্ডার তাহার থাকা অসম্ভব। সুতরাং অন্যের নিকটে অভাবপূরণার্থে মনের কথা বলিতে হয়। আবার ভাবিয়া দেখ, আমরা অন্যের নিকটে অনেক সময়ে উৎসাহ, প্রশ্রয়, প্রশংসা চাই; বাক্য-দ্বারাই এ সকল ভাল করিয়া ব্যক্ত হয়। যদি অন্য লোককে আপন মতে আনিতে চাই, তাহা হইলেও ভাষাই আমাদিগের প্রধান সম্বল। সাঙ্কেতিক অঙ্গসঞ্চালন-দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে মনের ভাব অপর লোকের নিকটে প্রকাশ করা যায়, সত্য। কিন্তু এরূপ সঙ্কেত অতি অল্প বিষয়েই খাটে। ভাষার সাহায্যে মনের ভাব যে প্রকার পরিস্ফুটরূপে বিজ্ঞাপিত হইতে পারে, সে প্রকার আর কিছুতেই হয় না। জ্ঞান-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাষার বিকাশ হইতে থাকে, এবং ভাষার সাহায্যে আবিষ্কৃত সত্য-সকল উত্তরকালবর্ত্তী লোকের জ্ঞানগোচর হইয়া সামাজিক উন্নতি সংসাধন করে।

চতুর্থতঃ, সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের পরস্পরের প্রতি ক্ষমা ও দয়া প্রকাশ করা অভ্যাস চাই। অন্যের দোষ মার্জ্জনা করিতে শিক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন কর্ম্ম। কিন্তু অনেকে একত্র থাকিতে হইলে অনেক অপরাধ সহ্য করা আবশ্যক হইয়া উঠে। এই প্রকার শিক্ষার অভাবে আফগানস্থান প্রভৃতি দেশে অতি সামান্য কারণে নরহত্যা হয়। দোষীকে ক্ষমা করা যেরূপ একটী সামাজিক গুণ, বিপন্নকে সাহায্য করাও তদ্রূপ আর একটী। ঘটনাসূত্রে কত লোক বিপত্তি-জালে নিরন্তর আবদ্ধ হয়, সদয় হইয়া তাহাদিগের মুক্তিসাধনার্থে যত্নশীল হইলেই সামাজিক পরস্পর-সাপেক্ষতানুযায়ী

কার্য্য করা হয়। এই প্রকার সহায়তা-লাভ-প্রত্যাশাই সমাজ-বন্ধনের মূল।

পঞ্চমতঃ, সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একতা চাই; এক জনের বা এক অঙ্গের দুঃখে অন্য সকলের দুঃখিত হওয়া চাই, এবং সমাজরক্ষা-জন্য প্রাণবিসর্জ্জন করিতে সকলেরই প্রস্তুত হওয়া চাই। এরূপ যেখানে নাই, সেখানে সমাজ বহুকাল স্থায়ী হইতে পারে না। গ্রীস ও রোমে বহুসংখ্যক দাস ছিল। দাসদিগের দুঃখে রাজপুরুষদিগের দুঃখ হইত না, সুতরাং সমাজ-রক্ষা করিতেও দাসদিগের প্রবৃত্তি ছিল না। আমাদিগের বিবেচনায় ইহাই গ্রীস ও রোমের পতনের প্রধান কারণ। আর আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভারতবর্ষ ও মিসরে জাতিভেদ-সংস্থাপন-নিবন্ধন একতাহ্রাস তত্তদ্দেশের স্বাতন্ত্র্যবিলোপের মুখ্য হেতু।

কোন জাতিই অদ্যাপি সামাজিক অবস্থার চরমসোপানে উঠিতে পারে নাই। উক্ত সোপানে উঠিলে সমাজের নূতন আকার হইবে। তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই পরোপকারার্থ জীবনধারণ করিবেন, আত্মস্বার্থ বিস্মৃত হইয়া অপর মানবগণের মঙ্গলসাধনকার্য্যে দেহমন সমর্পণ করিবেন। তখন স্বার্থপরতা ও পরশ্রীকাতরতা কোথাও থাকিবে না, সর্ব্বত্র ন্যায়পরতা, সত্যনিষ্ঠা ও উপচিকীর্ষা বিরাজমান দৃষ্ট হইবে। কবিগণ কল্পনাপথে এই স্বর্ণযুগ দর্শন করিয়াছেন। খ্রীষ্টভক্ত দূরে এই "মিলেনিয়ম" দেখেন; দেখেন যে, সমুদয় মনুষ্যজাতি ঈশার প্রেমময় রাজ্যে এক-পরিবারভুক্ত হইয়াছে এবং অস্ত্রশস্ত্র ভাঙ্গিয়া হল প্রস্তুত হইতেছে। এতদ্দেশীয় শাস্ত্রকারগণ দিব্যচক্ষে কলির অবসানে এই প্রকারে সত্যযুগের আবির্ভাব দেখিতে পান। দর্শনবিৎ ঐতিহাসিক ঘটনাবলী অবলম্বন করিয়া

অনুমান করেন যে, সমাজের উন্নতিসহকারে সর্ব্বহিতকরী নিঃস্বার্থ-প্রবৃত্তি-নিচয় নৈসর্গিক নির্ব্বাচন-প্রভাবে বর্দ্ধিত হইয়া এইরূপ সুখময় সময় উপস্থিত করিবে। কিন্তু এখনও এ সকল বহুদূরের কথা; স্বপ্নবৎ বা আরব্যোপন্যাসবৎ মিথ্যা না হউক, দূরবর্ত্তী নীহারিকাবৎ সামান্যদৃষ্টিপথের অতীত। এখনও সংসার স্বার্থপরতায় পরিপূর্ণ। তথাপি যখন মনে হয় যে, এখনকার সুসভ্য ভদ্রলোক হয়ত নরমাংসভোজী রাক্ষসের বংশধর এবং এই মানবকুলে বুদ্ধ ও ঈশা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তখন চিত্তে আশার সঞ্চার হয়, এবং ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্ববিমোহন বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে প্রবৃত্তি হয়।

কিন্তু মনুষ্যের সভ্যতা বলিতে কেবল সামাজিকতা, অর্থাৎ রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবহার ও ধর্ম্মনীতি-সম্বন্ধে উন্নতি মাত্র বুঝায় না; যে জ্ঞানের প্রভাবে মনুষ্য জীবকুলশ্রেষ্ঠ, সেই জ্ঞানের উন্নতিও বুঝায়। জ্ঞানোন্নতির ফল দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি; এ সকল কি গ্রীস, কি ইতালী, কি ভারতবর্ষ, কি চীন, কি মিসর, কি কাল্ডিয়া,—কি ফ্রান্স, কি জর্ম্মনী, কি ইংলণ্ড, কি আমেরিকা, যেখানে দৃষ্ট হউক, সেইখানেই আমরা সভ্যতার আবির্ভাব স্বীকার করিব। বাল্মীকি, হোমার বা সেক্সপিয়র,—গৌতম, অরিস্ততল বা বেকন—আর্য্যভট, টলেমি বা নিউটন,—যেখানে সমুদিত, সেখানে সভ্যতা সপ্রমাণ করিতে অন্য সাক্ষী চাই না।

সুবিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত গিজো বুঝিয়াছিলেন যে, সভ্যতা বলিতে কেবল "সামাজিক সম্বন্ধ-বর্দ্ধনই" বুঝায় না, মনুষ্যের উৎকৃষ্ট বৃত্তি-সকলের উন্নতিসাধনও বুঝায়। সমাজ অসম্পূর্ণ হইলেও

যে সকল দেশ সভ্য বলিয়া পরিগণিত, তাহাদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন :

"যদিও সমাজ অন্য স্থানের অপেক্ষা অসম্পূর্ণ, তথাপি মনুষ্যত্ব অধিকতর মহিমা- ও প্রভাব-সহকারে বিরাজমান। অনেক সামাজিক অধিকার-বিস্তার বাকি আছে, কিন্তু আশ্চর্য্যরূপ নৈতিক ও বৌদ্ধিক অধিকার বিস্তার ঘটিয়াছে; বহুসংখ্যক লোকের অনেক অধিকার ও স্বত্ব্ নাই, কিন্তু অনেক বড় লোক জগতের নয়নপথে জাজ্বল্যমান বিরাজিত। সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্প তাহাদিগের প্রভা বিকাশ করিতেছে। যেখানে মনুষ্যজাতি মানবপ্রকৃতির ঈদৃশ মহিমপ্রদ এই সকল মূর্ত্তির সমুজ্জ্বল আবির্ভাব দর্শন করে, যেখানে এই সকল উন্নতিপ্রদ আনন্দের ভাণ্ডার দেখিতে পায়, সেইখানেই সভ্যতার পরিচয় পাইয়া তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করে।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

অশ্রু

"Sweet tears, the awful language eloquent
Of infinite affection far too big
For words,"

তোমার ঐ মণিমুক্তার মোহনমালা দূরে রাখ; আমি একবার নয়ন ভরিয়া মনুষ্যের নয়ন-বিলম্বিনী অশ্রুমালা নিরীক্ষণ করিয়া লই। মণিমুক্তা পরিণামে পৃথিবীর ধূলি-সমান; বালক, বণিক্ কিংবা বিনোদ-ভাব-বিহ্বলা অবলা ভিন্ন আর কাহারও কাছে উহার মূল্য নাই। অশ্রুমালা দ্রবীভূত মনুষ্যহৃদয়ের সজীব ধারা; পৃথিবীর কোন বস্তুর সহিতই উহার তুলনা নাই।

এই সংসার-মরুতে মনুষ্যহৃদয়ের অবলম্ব কি?—মনুষ্যহৃদয়। মানুষী তৃষ্ণার তৃপ্তিস্থল কোথায়?—মনুষ্যহৃদয়ে। হৃদয় যদি হৃদয়কে সম্ভাষণ করিয়া প্রতিসম্ভাষণে প্রীত, আশ্বস্ত ও পরিতৃপ্ত না হয় তাহা হইলে কে এই শূন্য সংসারে ইচ্ছাসহকারে জীবন ধারণ করে? হৃদয় যদি হৃদয়ের উপর ভর করিয়া প্রতিনির্ভরে প্রাণ-বল না পায়, তাহা হইলে কে এই দগ্ধ শ্মশানে অস্থি-সংগ্রহের জন্য পড়িয়া থাকিতে সম্মত হয়? হৃদয় যদি প্রীতির পূর্ণোচ্ছ্বাসে আত্ম-দান করিয়া প্রতিদানে হৃদয় না পায়, তাহা হইলে কে এই তিমিরান্ধ-ভুবনে ভবলীলার নট-নৈপুণ্য-শিক্ষার জন্য বন্দী রহিতে পারে? রাজার প্রাসাদ, বুভুক্ষু ভিখারীর পর্ণকুটীর, যোগীর তপোবন, বিয়োগীর নিভৃত-কানন, পুণ্যাত্মার শান্তিনিকেতন,

প্রমোদীর বিলাস-ভবন,—ইহার সর্ব্বত্রই মনুষ্যের আশ্রয়স্থান মনুষ্য-হৃদয়। কবিতা মনুষ্যহৃদয়েরই প্রীণনের জন্য ফুলের মধু, লতার মাধুরী এবং এই অনন্ত বিশ্বের অনন্ত সৌন্দর্য্যের সারভূত সৌন্দর্য্য-সুধা পক্ষিণীর ন্যায় চঞ্চুপুটে সঞ্চয়ন করিয়া নিত্য আনিয়া উপহার যোগাইতেছে। চিন্তা হৃদয়েরই ক্ষুন্নিবৃত্তি ও প্রকৃত পুষ্টির জন্য, আকাশে উড্ডীন হইয়া, সাগরে ডুব দিয়া এবং ভূ-গহ্বরে প্রবেশ করিয়া সুস্বাদ ও সুভক্ষ্য ফল চয়ন করিতেছে। উদ্দীপনাও হৃদয়েরই উদ্বোধনের জন্য, তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া, উৎসাহের প্রতপ্ত মদিরা এবং প্রতপ্ত তাড়িত-প্রবাহ উন্মাদিনীর মত ঢালিয়া দিতেছে। ফলতঃ, হৃদয় না থাকিলে এই জগতে কাহার জন্য কে? বুদ্ধি জ্ঞান দান করিতে পারে; বিবেক নির্ম্মল-চেতা নির্ভীক সুহৃজ্জনের ন্যায় নীতির দুর্গম-পথ প্রদর্শন করিতে পারে;—কিন্তু তৃষ্ণায় তৃপ্তি দান করিতে, জ্বালা ও বেদনায় শান্তি দিতে, এবং শান্তি যখন আশাতীত ও অসম্ভব হয়, তখন সহানুভূতির অমৃতস্পর্শে প্রাণ জুড়াইতে মানবজগতে একমাত্র বস্তু মনুষ্যহৃদয়। অশ্রুধারা সেই মনুষ্যহৃদয়ের জীবনময়ী নির্ঝরিণী। উহা কখনও ধীরে বহে, কখনও বেগে প্রবাহিত হয়, কখনও-বা নিশার শিশিরবিন্দুর ন্যায় বিন্দু বিন্দু ঝরিতে থাকে। কিন্তু যেই মনুষ্য উহার দিকে দৃষ্টিপাত করে, অমনি তাহার হৃদয় অন্তরতম স্থলে স্পৃষ্ট হইয়া এই বিশ্বাস ও এই গভীর আনন্দে উল্লসিত হয় যে, এই সংসার কঙ্করময় কান্তার অথবা হৃদয়-শূন্য দগ্ধ প্রান্তর নহে।

যাহারা ক্ষণকালও কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে চাহে না, অথবা প্রকৃতির চাপল্যে ক্ষণকালের তরেও কোন বিষয়ে

মনোনিবেশ করিতে সমর্থ হয় না,—কার্য্য, কারণ, সৃষ্টি, স্থিতি, জীবন ও মৃত্যু, এবং মানবজীবনের উন্নতি ও অবনতি প্রভৃতি সমস্ত তত্ত্বই যাহাদিগের নিকট হাস্যের বিষয়, সেই বিকটবুদ্ধি কিম্ভূত পুরুষেরা অবশ্যই মনুষ্যের অশ্রু লইয়া উপহাস করিতে পারে। আর যাহারা মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, শিক্ষা, সংসর্গ অথবা কর্ম্মগুণে ক্রুরকর্ম্মা রাক্ষস হইতেও নিষ্ঠুর হইয়াছে,—তাহারাও মনুষ্যের অশ্রুদর্শনে খিল খিল করিয়া হাসিতে পারে! কিন্তু যাঁহারা সর্ব্বাংশে অন্তঃসারহীন ও প্রাণবিহীন নহেন, মনুষ্যত্ব একেবারে যাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করে নাই, উহা স্বভাবতঃই তাঁহাদিগের ভক্তি ও প্রীতি আকর্ষণ করে, এবং আপনি তরল হইয়াও তাঁহাদিগের তারল্যকে স্তম্ভিত করিয়া ফেলে। মনুষ্যের অশ্রু বস্তুতঃও সামান্য পদার্থ নহে।

অশ্রু দয়ার প্রবাহ। স্বার্থপরতা নিভৃতে বসিয়া ক্ষতি-লাভ গণনা করে। লোভ কাহার কি হরণ অথবা কোথা হইতে কি উপায়ে কখন কি আহরণ করিবে, সেই চিন্তায় সর্ব্বত্র সাবধানে বিচরণ করে। ঈর্য্যা পরের সুখসম্পদ্ ও সম্মান-দর্শনে আপনি পুড়িয়া মরে এবং বিষাক্ত দৃষ্টি ও বিষাক্ত বাক্যে অন্যকে পুড়াইয়া ভস্ম করে। কামাদি কলুষিত বৃত্তি প্রমত্ত পশুর ন্যায় আরক্তলোচনে সতত ভোগ্য বিষয়েরই অনুসন্ধান করে। কিন্তু পরদুঃখ-কাতরা দয়া নয়নজলে বিগলিত হইয়া,—আপনাকে আপনি পরের আগুনে ঢালিয়া দিয়া, পরকীয় হৃদয়ের দুঃখ-দাহ নির্ব্বাণ করে। দয়ার অশ্রু দেবতারও দুর্লভ ধন। যাঁহার চক্ষু দয়ার অশ্রুতে সিক্ত হয়, তিনি দেবতার মধ্যে দেবতা। তাঁহাকে অভিবাদন কর। তিনি হীন-কুল-জাত হইলেও মহাকুলীন,

মূর্খ হইলেও পণ্ডিতের মুকুটস্থানীয়, এবং কাঙ্গালের ঘরে জন্মিয়া থাকিলেও রাজরাজেশ্বর। কেন-না, সংসারে বৃথাজ্ঞানী ও বৃথাভিমানীরা নানাবিধ বৃথা শ্রম করিয়াও, চিরজীবনে যাহা করিতে পারিতেছে না, তিনি স্বভাবতঃই তাহাতে সিদ্ধ,—তাহারা কৃত্রিম প্রতিপত্তির কৌশলময় সোপানপরম্পরায়, শত সহস্র ভেরী-তুরীর বাদ্যকোলাহলের মধ্যে, দ্রুতপদ-সঞ্চারে আরোহণ করিয়াও মনুষ্যত্বের যে উন্নতমঞ্চে অধিরূঢ় হইতে অসমর্থ, তিনি জন্মান্তরীণ মহাপুরুষের মত স্বভাবতঃই সেখানে অধ্যাসীন। তিনি এই পৃথিবীর পাপ-চক্ষে পাপাত্মা হইলেও, তুমি তাঁহাকে পুণ্যপুঞ্জময় পবিত্রবস্তুজ্ঞানে পূজা করিও। কেন-না, তাঁহার জীবন পরের জন্য,—তাঁহার অস্তিত্ব পরের সুখশান্তির উদ্দেশ্যে,—তিনি দয়ার বিগ্রহ অথবা দয়ার সেবক এবং সুতরাং তিনি তাঁহার অন্তরের অন্তস্তলে,—লোকলোচনের অগোচরে, জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে, লৌকিক জীবনের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনন্ত অনুষ্ঠানে দয়াময় মন্ত্রের মহাসাধক, দয়াময়ের প্রকৃত উপাসক।

যে যাহারে ভালবাসে, সে তাহারে প্রায়শঃই ভালবাসিতে পারে। কিন্তু, পরকে ভালবাসে কে? আপনার পুত্র, কন্যা ও স্নেহাস্পদ ব্যক্তির প্রতি সকলেরই স্নেহ-সঞ্চার হয়। কিন্তু পরকে প্রমুক্তচিত্তে স্নেহ বিলাইতে পারে কে? যেখানে রূপ আছে, গুণ আছে, প্রতিভার উজ্জ্বল দীপ্তি কিংবা কুসুমের সুকুমার সৌরভ আছে, সেখানে সকলেরই অনুরাগ আকৃষ্ট হইতে পারে। কিন্তু যেখানে রূপ নাই, গুণ নাই, নয়ন-মনোবিনোদনের কিছুই নাই,—আছে দুঃখের কালিমা এবং দুর্ভাগ্যের কশাঘাতজন্য ক্ষতবিক্ষত চিহ্ন, তাদৃশ স্থানে হৃদয়ের স্বতঃপ্রবৃত্ত স্ফুরণে অনুরক্ত

হইতে পারে কে ? যেখানে সম্পদের সুখ-সামগ্রী মাক্ষিক-প্রকৃতি মনুষ্যগণকে মধুগন্ধে মোহিত রাখে, সেখানে সকলে গিয়া মমতার বন্ধনে বদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু, যেখানে বিপদের ভয়ঙ্কর ঘূর্ণবাতে সকলই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, যাহা আছে, তাহাও বিনাশ পাইতেছে, এবং আশার শেষ আলোকবর্ত্তিকাও নিবিয়া যাইতেছে, আপনা হইতে সেখানে যাইয়া আপনাকে আপনি মমতার রজ্জুতে জড়াইতে পারে কে ? যে পবিত্র, পূত-চরিত্র ও শ্রদ্ধাস্পদ, তাহাকে সকলেই শ্রদ্ধা করিতে পারে। কিন্তু, যে অধম, অপাত্র, অপবিত্র ও অস্পৃশ্য, তাহাকে তুলিয়া লইয়া আবরিতে পারে কে ? হৃদয় যেখানে উড়িয়া পড়িতে সুখানুভব করে,—সুখ-সংস্পর্শে শীতল হয়, সেখানে সকলেই স্বয়মাহূত উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু, যেখানে সকলই দুঃসহ, দুর্নিরীক্ষ্য ও নিদারুণ দুর্ভোগ,—যে স্থানের বীভৎস দৃশ্যে বিরক্তি ও ঘৃণা ব্যতীত আর কোন ভাবেরই উদ্রেক হয় না,—যেখানে বল-প্রয়োগেও চিত্তকে প্রেরণ করা যায় না, সেখানে আপনা হইতে যাইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে পারে কে ?

তুমি প্রভুত্বের উপাসনায় আত্মসমর্পণ কর,—প্রভুত্বলাভে পূর্ণকাম হইবার জন্য অকথ্য ক্লেশ স্বীকার কর,—সে তোমার আপনার জন্য ; পরের জন্য নহে। তুমি সারস্বত সমুদ্রে সাঁতার দিয়া একেবারে উহাতে ডুবিয়া থাক,—সরস্বতীর পাদপদ্মে একেবারে বিলীন হইয়া যাও,—সে তোমার আপনার জন্য ; পরের জন্য নহে। যদি প্রভুত্বের উপাসনায় ও সরস্বতীর পদারবিন্দসেবায় কোনরূপ অলৌকিক মাদকতা না থাকিত, তাহা হইলে তুমি তাহাতে দেহ-মন অর্পণ করিতে পারিতে কি না, সন্দেহের কথা।

তুমি কীর্ত্তির বিশ্ববিনোদ বংশীধ্বনি-শ্রবণে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া কীর্ত্তিকর ও যশস্কর যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান কর,—যে সকল কঠোর, কষ্টজনক ও দুঃসাধ্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া সমাজের কীর্ত্তিস্তম্ভনিবহে আপনার নামাক্ষর লিখিয়া রাখিতে যত্নপর হও, তাহাও তোমার আপনার জন্য,—পরের জন্য নহে। পরের জন্য দয়ার অশ্রু,—পৃথিবীর অমূল্য ধন, প্রাণপ্রদ—প্রাণস্পর্শী এবং অপ্রত্যক্ষ মহত্ত্বের প্রত্যক্ষ ফল।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ

নীরব কবি

যাহারা শ্রুতিসুখাবহ ছন্দোবন্ধে শব্দের সহিত শব্দ গাঁথিয়া, শুধু কথার ছটায় সকলকে মোহিত করিতে চেষ্টা করেন, অশিক্ষিত ইতর লোকেরা তাঁহাদিগকেই কবি বলিয়া আদর করে।

ঈদৃশ কবি এবং ঐরূপ কাব্যের পরীক্ষাস্থান কর্ণ। কবিতাও তালে তালে পঠিত বা উচ্চারিত হয়; তাহার সঙ্গে সঙ্গে শরীরও যেন তালে তালে, বিবিধ ভঙ্গিতে নাচিতে থাকে। আরবী, উর্দ্দু, হিন্দী, পারসী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত প্রভৃতি পুরাতন ও নূতন ভাষা-নিচয়ে ঐরূপ কাব্যের অভাব নাই; ভট্ট, মাগধ এবং কবিওয়ালা বলিয়া প্রসিদ্ধ গাথকদিগের অধিকাংশই এই শ্রেণীর কবি। কোন একটা নাম দিতে হইলে, ইহাদিগকে শাব্দিক কবি বলিয়া নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত নহে। কেন-না, শব্দের পর শব্দ-বিন্যাসের চাতুরী বিনা সাধারণতঃ ইহাদিগের কবিতায় আর কিছুই থাকে না। যদি কিছু থাকে, তাহাও প্রায়ই স্বাদগ্রাহী ব্যক্তির সুখ-প্রীতিকর বলিয়া গ্রাহ্য হয় না।

সহৃদয়, রসজ্ঞ ব্যক্তিরা কাব্যের অন্বেষণ করিতে হইলে আর একটুকু ঊর্দ্ধে আরোহণ করেন। তাঁহারা ছন্দোবদ্ধ বাক্য শুনিয়াই গলিয়া পড়েন না, অথবা কতকগুলি সুললিত শব্দ পাইয়াই মোহিত হন না। যে কথাটি শ্রুতিপথে প্রবেশ করিয়া ক্ষণিক আনন্দ উৎপাদন করিল, তাহা হৃদয়স্থান পর্য্যন্তও গমন করে কি না, ইহাই তাঁহারা অগ্রে বিচার করেন। যে কথায় অন্তরের অন্তর-নিহিত কোন লুক্কায়িত রস উছলিয়া না উঠে, সৌন্দর্য্যের

কোন নূতন মূর্ত্তি মানস নেত্রের সন্নিধানে উপস্থিত না হয়, হৃদয়-তন্ত্রী কোন এক নূতন তানে বাজিতে না থাকে, কিংবা আত্মা ভাব-ভরে ঢুলিয়া না পড়ে, তাঁহাদিগের নিকট তাহা কাব্য বলিয়াই গৃহীত হয় না। ইংলণ্ডের অধিকাংশ কবিই ছন্দোবিন্যাস-নৈপুণ্যে সেক্সপীয়রের শিক্ষাগুরু; অনেক বালিকার কবিতাও সেই কবিকুল-পূজ্য পৃথ্বী-ভূষণ কবির কবিতা-নিচয় অপেক্ষা কাণে শুনিতে অধিক মিষ্ট; জয়দেবের গীতগোবিন্দের যেরূপ পদ-লালিত্য, অভিজ্ঞান-শকুন্তল কিংবা উত্তরচরিতের আদি, অন্ত, মধ্য—কোথাও তদনুরূপ কিছু লক্ষিত হয় না; নৈষধের প্রগল্ভ পদ-বিন্যাসের নিকট রত্নাবলীর সরল, তরল, মধুর রচনা কিছুই নয় বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে। সুরুচিসম্পন্ন, বিচক্ষণ লোকেরা তথাপি সেক্সপীয়র, কালিদাস ও ভবভূতিকেই প্রাণের সহিত পূজা করেন, এবং নৈষধের নাচনি ছন্দের কবিতাপুঞ্জ একদিকে সরাইয়া রাখিয়া রত্নাবলীর কবি সৌন্দর্য্যের যে সকল কমনীয় আলেখ্য আঁকিয়া গিয়াছেন, তাহাই পিপাসুপ্রাণে পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন; কারণ, শব্দগ্রন্থনের ভঙ্গিবৈচিত্র্য ভাষা লইয়া লীলা-খেলার বৈচিত্র্যপ্রদর্শন মাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে ভাবই কাব্যের প্রাণ। যেমন আভরণের তুলনায় রূপ, তেমন শব্দগত মাধুর্য্যের তুলনায় সৌন্দর্য্যময় ভাব। সুতরাং কাব্যের পরীক্ষায় শব্দে ও ভাবে বড় বেশী তারতম্য।

যাঁহারা চিন্তাক্ষম ও মনস্বী বলিয়া জগতে সম্মানিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের বিবেচনায় কবিতার আরও একটি গ্রাম আছে। তাহা অতীব উচ্চ—অসামান্য শক্তিলভ্য। যাহা লিখিত হইল তাহাই কাব্য, এবং যিনি লিখিলেন তিনিই কবি, এমন কথা

তাঁহারা স্বীকার করেন না। তাঁহাদিগের মতে লিখিত চিত্রে কাব্যের আভামাত্র প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত কাব্য এক অনির্ব্বচনীয় অমৃত। মনুষ্যের অপূর্ণ এবং অপবিত্র ভাষা উহাকে ধারণ কিংবা বহন করিতে সাধারণতঃ সমর্থ হয় না। যাঁহার হৃদয় যতক্ষণের জন্য তাদৃশ কাব্যের বিলাস-ক্ষেত্র হয়, তিনি ততক্ষণের জন্য হিমাচলের অবিচলিত স্থৈর্য্যের ন্যায়, আকাশের অনন্ত বিস্তারের ন্যায়, অক্ষুব্ধ সমুদ্রের অনির্ব্বচনীয় গাম্ভীর্য্যের ন্যায় এবং যোগ-রত তাপসের ধ্যানের ন্যায় নিস্তব্ধ ও নীরব রহেন। তিনি শুধু হৃদয়েই সেই স্বর্গীয় সুধা-সিন্ধুর কণিকামাত্র পান করিয়া কৃতার্থ হন; লৌকিক বাক্য এবং লোক-ব্যবহৃত বর্ণমালায় কিছুই ব্যক্ত করিয়া উঠিতে পারেন না। লোক স্বপ্নাবস্থায় যেরূপ দৌড়িতে চাহে, কিন্তু কোন মতেই দৌড়িতে পারে না,—কথা কহিবার জন্য ব্যাকুল হয়, কিন্তু কোন কথাই অধরে ফুটিল বলিয়া অনুভব করে না, তিনিও তথাবিধ দশা প্রাপ্ত হইয়া তখন স্তম্ভিতভাবেই অবস্থিত থাকেন। প্রকাশের জন্য যত কিছু চেষ্টা, সমস্তই তখন তাঁহার বিফল হয়, প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি পর্য্যন্তও তখন বিলুপ্ত হইয়া যায়।

কোন তত্ত্বের অন্তস্থলে প্রবেশ করা যাহাদিগের বুদ্ধির অসাধ্য, প্রাগুক্ত সত্যটিকে নিতান্ত লঘু কথা বলিয়া উপহাস করা তাহাদিগের পক্ষে অসম্ভব নহে। তাহারা এইরূপ মনে করিতে পারে যে, কিছু না বলিয়া এবং কিছু না লিখিয়াই যদি কবির অলৌকিক সম্পদ্ সম্ভোগ করা যায়, তবে ইহা অপেক্ষা আর সৌভাগ্য কি? ইচ্ছা হইবে, আর অমনি ধ্যানস্থ হইয়া কবির দেবাসনে উপবেশন করিব, বীণাপাণি মূর্ত্তিমতী হইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইবেন, প্রকৃতি তদীয়

প্রিয়তম নিকেতনের লুক্কায়িত দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিবেন, এবং সংসার কাব্যকুঞ্জের কমনীয় মূর্ত্তি ধারণ করিবে,—ইহার মত আর সুলভ সুখ কি? কিন্তু কবিত্বের এইরূপ আবেশ অথবা অনুপ্রাণনা প্রকৃত প্রস্তাবে মনুষ্যের ইচ্ছাধীন কি না, এবং ইচ্ছা সকলেরই অদৃষ্টে সকল সময়েই ঘটে কি না, কিংবা ঘটিতে পারে কি না, গভীর ভাবে চিন্তা করা উচিত। ইচ্ছা করিয়া, কতকগুলি সুললিত শব্দসংযোগে, কিছু একটা লিখিয়া তোলা আপনার সাধ্য; ইচ্ছা করিয়া, কোন বিষয়ে ঐরূপ শ্রুতিহারি কিছু একটা বলিয়া লোকের চিত্তবিনোদ করাও আপনার সাধ্য। কিন্তু ইচ্ছা করিয়া, কে কোথায় বিশ্বময়সৌন্দর্য্যের উপাসক এবং বিশ্বপ্রেমের প্রেমিক হইতে পারিয়াছে? আর ইচ্ছা করিয়া, কবে কে আপনার হৃদয়কে আপনি দ্রবীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছে? ইচ্ছা বুদ্ধিকে চালনা করিতে পারে, মনকেও অনেক দূর উত্তেজিত করিতে পারে; কিন্তু প্রতিভা ও প্রকৃতির মূল-প্রস্রবণ ইচ্ছার অগম্য স্থান।

চন্দ্রমা মৃদু মৃদু হাসিতেছে, তরঙ্গিণী মৃদুতরঙ্গনাদে নিজ দুঃখের গীত গাইতেছে, বৃক্ষপত্র মৃদু সঞ্চালনে অটবীর প্রণয়াহ্বান প্রকাশ করিতেছে,—এ সকল অভ্যস্ত কথা অনেকেই অভ্যাস-বলে লিখিতে পারে। কিন্তু চন্দ্রমা যখন হাসিতে থাকে, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে এ সংসারে কয়টি হৃদয়, প্রকৃতির সেই বিচিত্র শোভার সুখ-শীতল স্পর্শে, আনন্দের উচ্ছ্বাসে মৃদু হাস্যে উৎফুল্ল হয়? কে কলনাদিনী তরঙ্গিণীর তটে উপবিষ্ট হইয়া,—তাহার অনতিস্ফুট দুঃখের গীতের সহিত নিজ দুঃখের গীত মিশ্রিত করিতে ক্ষমতা রাখে? তরুলতার আহ্বানে ইতর-জন-ভোগ্য পাশব ভোগসুখের আহ্বান কয় জনে অবহেলা করিতে পারে?

হর্ষ, দুঃখ, ক্রোধ ও প্রীতি প্রভৃতি ভাব-নিচয়ের ভাষা চিরকালই গাঢ়তার মাত্রানুসারে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে। যে হর্ষ, যে দুঃখ, যে ক্রোধ, অথবা যে প্রীতি নিতান্ত তরল, সহজেই তাহা বাহির হইয়া পড়ে। যেমন তরল ভাব, তেমন তরল ভাষা। মনুষ্যের মন অল্প হর্ষে শফরীর ন্যায় চঞ্চল হয়, অল্প আনন্দে অধীর হইয়া উঠে, হর্ষ অথবা আনন্দজনিত হাস্যোল্লাস কিছুতেই তখন নিবৃত্ত হয় না। অল্প দুঃখ অশ্রুজলেই বিগলিত হইয়া যায়। অল্প মাত্রার ক্রোধ ভ্রূকুঞ্চনে ও তর্জ্জন-গর্জ্জনেই ব্যয়িত হয়। অতি অল্প প্রীতি, অল্পজলা স্রোতস্বতীর ন্যায়, সর্ব্বদা খল খল করে। কিন্তু যে হর্ষ শরীরের রোমে রোমে অমৃতরসের ন্যায সঞ্চরণ করে, যে দুঃখ গরলখণ্ডের ন্যায় হৃদয়ের মর্ম্মস্থানে লগ্ন হইয়া থাকে, যে ক্রোধ চিত্তকে তুষানলবৎ অহর্নিশ দাহন করে, যে প্রীতি একবার নিশার স্বপ্নের ন্যায় অলীক বোধ হয়,—আবার আত্মাকে সাধারণ আনন্দ ও নিরানন্দের অধিকার হইতে বহু উর্দ্ধে লইয়া যায়, তাহা প্রায় কখনও দৃশ্য কি শ্রাব্য ভাষায় সুচারুরূপে পরিস্ফুট হয় না।

কবিতার ভাষাও এই নিয়মের অধীন। লঘু কবির যত কিছু সম্পদ্, তাহা শব্দেই পর্য্যবসিত হয়। তদপেক্ষা উচ্চতর কবির শব্দসম্পত্তি অপেক্ষাকৃত অল্প, রস-গাম্ভীর্য্যই অধিক। কিন্তু যখন কাহারও হৃদয়ে কাব্যের সেই অনির্ব্বচনীয় অমৃতস্রোত অতি প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়, যখন মন কল্পনার ঐন্দ্রজালিক পক্ষে উড্ডীন হইয়া তারকায় তারকায় প্রকৃতির জ্বলদক্ষরলেখা পাঠ করিতে থাকে, এবং গিরিশৃঙ্গ, সাগরগর্ভ, আলোক ও অন্ধকার সর্ব্বত্র একসঙ্গে বিচরণ করে,—যখন আত্মতত্ত্বের প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে আত্মহারার মত হইয়া পড়ে, এবং বুদ্ধি অনুসন্ধানে

বিরত হইয়া, ক্ষণকালের তরে, তরঙ্গের সহিত তরঙ্গের ন্যায় হৃদয়েই বিলয় পায়,—তখন ভয়-বিহ্বলা ভাষা আপনিই জড়ীভূত হইয়া যায়। কে আর কাহার কথা প্রকাশ করে? প্রকৃতি নীরব, কাব্য নীরব, কবিও তখন স্পন্দহীন ও নীরব। ভাব-লহরী নীরবে উত্থিত হয়, নীরবে লীলা করে, এবং নীরবেই বিলীন হইয়া যায়। মুগ্ধা বালা যেমন দর্পণে আপনার সুন্দরচ্ছায়া আপনি দেখিয়া চকিত নয়নে চাহিয়া থাকে, জ্যোৎস্নাময়ী যামিনী যেমন আপনার সুখে আপনি হাসে, বনান্তবায়ু যেমন আপনার দুঃখে আপনি ক্রন্দন করে, কবিও তখন সেইরূপ আপনার ভাবে আপনি পরিপূর্ণ হইয়া জীবন্মৃতের ন্যায় আপনাতে আপনি নিমজ্জিত হন। কাহার নিকট কি কহিবেন, কে কি শুনিয়া কি কহিবে, কে প্রশংসা করিবে, কে নিন্দা করিবে, কে তাঁহার কথায় মুগ্ধ হইবে, কে অসন্তুষ্ট থাকিবে ইত্যাদি কোন চিন্তাই তাঁহার তদানীন্তন সুখ-সৌন্দর্য্যময় হৃদয়-জগতে স্থানপ্রাপ্ত হয় না। মান, অপমান, সম্পদ্, বিপদ্, প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ জীবন ও মৃত্যু, সমস্তই তখন তাঁহার নিকট, উচ্চতম-শৈল-শিখর-সমাসীন যোগীর নিকট মানবসমাজের বিবিধ ক্ষুদ্র কোলাহলের ন্যায়, অতি নিম্নস্থ ও দূরস্থ হইয়া পড়ে। সংসার আছে কি নাই, ইহাও তখন তাঁহার বোধগম্য থাকে না। তাঁহার নিজের অস্তিত্ব তখন মুহূর্ত্তের জন্য এই বিশ্বব্যাপি-সৌন্দর্য্য-সাগরে বিলুপ্ত হয়।

যাঁহারা বিধাতার প্রসাদের অথবা প্রকৃতির কোন অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় নিয়মে এইরূপ কবিপ্রাণ লাভ করিয়াছেন, এবং লোকাতীত কবিত্বের পূর্ণ আবির্ভাবে সময়ে সময়ে এইরূপ অভিভূত হন, আমরা তাঁহাদিগকে চিনি আর না-চিনি, তাঁহারাই সাধক,

তাঁহারাই সিদ্ধ এবং তাঁহারাই মানবজাতির দিব্য চক্ষু। তাঁহারা উদাসীন হইলেও আসক্তের ন্যায় কর্ম্মরত ও স্নেহপ্রবণ। তাঁহারা বাহিরে অতি কঠিন প্রকৃতির লোক হইলেও অন্তরে অবলার ন্যায় কোমল। তাঁহাদিগের আকাঙ্ক্ষা স্বভাবতঃই জগতের সুখ-প্রবর্ত্তিনী, জগতের হিতসাধিনী,—তাঁহাদিগের আশা বসন্ত-সমাগমের প্রিয়সংবাদ-দায়িনী কোকিলার ন্যায় পীযূষবর্ষিণী। ধর্ম্ম তাঁহাদিগের কাছে কঠোর ব্রত নহে। ধর্ম্ম ও জীবন, সুখ ও সাধনা এই সমস্তই তাঁহাদিগের কাছে এক এবং অভিন্ন পদার্থ। সমীরণ তাঁহাদিগের স্বর্গোপম পবিত্র স্পর্শে শীতল ও সুরভি হয় বলিয়াই আমরা বাঁচিয়া আছি, নচেৎ এই স্বার্থচিন্তাময় সংসার-মরুতে সকলেই প্রাণে মরিতাম। পৃথিবী তাঁহাদিগের পদরেণু প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়াই মনুষ্যের নিবাসযোগ্য হইয়াছে, নচেৎ ইহা নিরয়-নিবাস হইতেও ভয়ঙ্কর বেশ ধারণ করিত। তাঁহারা ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়াই, মনুষ্যের ভাষা অদ্যাপি শোক-দুঃখের সুদারুণ পরীক্ষাসময়ে মনুষ্যের দগ্ধহৃদয়কে শীতল করিতেছে, নৈরাশ্যে আশ্বাস দিতেছে; দয়া, উৎসাহ, শান্তি ও প্রীতি প্রভৃতি অতিমানুষিক ভাবের ভার বহন করিতেছে, নচেৎ ইহা পিশাচকণ্ঠ হইতেও অধিকতর শ্রুতিকঠোর হইত। ভক্তি এইরূপ কবিদিগের হৃদয়-কাননে নিত্যবিকসিত কুসুম; আরাধনা সেই ভক্তিবিলসিত হৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ

বিবেকানন্দ

বিবেকানন্দ বলিতেন, "প্রত্যেক জাতীয় জীবনের একটি মেরুদণ্ড আছে; এই মেরুদণ্ড ভগ্ন হইলে জাতীয় জীবন বিনষ্ট হইবে।" তিনি তাঁহার পত্রে তিনটি জাতির বিষয় বলিয়াছেন,—ফরাসী, ইংরাজ ও হিন্দু। ফরাসী-জীবনের কেন্দ্র—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, রাজ্যশাসনে সকলের অধিকার—এই তাহাদের মূলমন্ত্র। তাহাদের উপর যে অত্যাচারই হোক, তাহা তাহারা বিনা বাক্যে সহ্য করিবে, কিন্তু তাহাদের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিলে উন্মাদবৎ আচরণ করিবে,—ভালমন্দ কিছুই বিচার করিবে না; নগর ভস্মসাৎ করিবে, অট্টালিকা চূর্ণ করিবে, নরহত্যা করিবে, যতদিন না তাহারা সেই স্বাধীনতা পুনঃ প্রাপ্ত হয়, তাহারা নিবৃত্ত হইবে না। ব্যবসায়ী ইংরাজ-জীবন লাভালাভ-হিসাবের উপর স্থাপিত। তাহাদের যাহা যাহা করিতে বলো—করিবে; কিন্তু যদি তাহাদের নিকট অর্থ চাও, তাহার হিসাব চাহিবে। রাজ-সম্মান দিতে তাহারা সম্পূর্ণ উৎসাহিত, কিন্তু রাজাকে বিনা হিসাবে এক কপর্দ্দক দিবে না। তাহারা হিসাবনিকাশ না পাইলে একেবারে দিগ্‌বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইবে; এই দিগ্‌বিদিক্-জ্ঞানশূন্য অবস্থায় রাজাকেও হত্যা করিয়াছে। হিন্দুর জীবন—ধর্ম্ম। হিন্দুকে অর্দ্ধাশনে রাখো, আবাসহীন করো,—কিছুতেই দ্বিরুক্তি করিবে না। কিন্তু তাহার ধর্ম্মের উপর একবার হস্তক্ষেপ করো, তাহা কোনরূপেই সহ্য করিবে না।—ধর্ম্ম হিন্দুজীবনের কেন্দ্র-

স্বরূপ। যদি হিন্দুর জাতীয় জীবন উন্নত করিতে হয়, বিবেকানন্দের মতে তাহা ধর্ম্মের দ্বারাই হইবে।

এ স্থলে তর্ক উঠিতে পারে, জাতীয় জীবন ধর্ম্মের উপর স্থাপিত, হিন্দুর ত ধর্ম্মনাশ হয় নাই; তবে এরূপ হীনাবস্থা কেন? তাহার উত্তর—সনাতন ধর্ম্ম একেবারে বিলুপ্ত হইবার নয়, কিন্তু স্বার্থচালিত ধর্ম্মযাজকেরা তাহাদের স্বার্থপোষণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া হিন্দুধর্ম্ম অতি মলিন করিয়াছে। এই হীন অবস্থা সেই মালিন্যের ফল। উপস্থিত হিন্দুধর্ম্মের প্রধান মালিন্য এই যে, তমোগুণকে আমরা সত্ত্বগুণ বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। ক্ষমা অতি উচ্চ শক্তি। আমার প্রতি একজন অত্যাচার করিয়াছে, আমি তাহাকে ইচ্ছা করিলেই ধ্বংস করিতে পারি, তথাপি তাহাকে দণ্ডপ্রদান করিলাম না, ইহার নাম ক্ষমা। কিন্তু বলবানের লাথি খাইয়া আসিলাম, ভয়ে কিছু বলিলাম না, বাড়ী আসিয়া বলিলাম, 'ক্ষমা করিয়াছি'; ইহার নাম ক্ষমা নয়, ইহার নাম জড়ত্ব। এই জড়ত্ব কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল। আমরা এক্ষণে সেই জড়ত্বের উপাসনা করিতেছি, যে যাহার গৃহের কোণে বসিয়া আছি। কোন্ জাতি কিরূপে উন্নতি লাভ করিতেছে, তাহা দেখিবার অবকাশ নাই; ধর্ম্মযাজকের কুপ্রথা-মতে, ভ্রমণ করিলে জাতি যাইবে, আমরা ঘরের ভিতরেই বসিয়া থাকিব,—কিছুই দেখিব না, শুনিব না, মুখে এক একবার উন্নতি উন্নতি করিব,—জড়ত্বের এই অধঃসীমা।

জাপান-ভ্রমণে বিবেকানন্দ দেখিয়াছিলেন, জাপান সকল সভ্য-জাতির নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু তাহার জাপানীত্ব বজায় রাখিয়াছে; ইংরাজের নিকট যে সকল শিক্ষা পাইয়াছে,

তাহার আড়ম্বর পরিত্যাগপূর্ব্বক মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। বিবেকানন্দ বলেন, "আমরাও সেইরূপ মর্ম্ম গ্রহণ করিব, কিন্তু আড়ম্বরে প্রয়োজন নাই। ইংরাজ পুষ্টিকর আহার করে, আমরাও পুষ্টিকর আহার করিব, টেবিল-চেয়ারের আড়ম্বরে প্রয়োজন নাই। ইংরাজ ইংরাজী-রকমে চলে, আমরা হিন্দু-রকমে চলিব। যেখানে যাহা ভাল পাইব—লইব, কিন্তু সর্ব্বদাই মনে রাখিব—আমরা হিন্দু, অন্তরে বাহিরে হিন্দু; হিন্দুর স্বতন্ত্রতা নষ্ট করিব না।"

এই স্থলে একটি আপত্তি উঠিতে পারে। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি বলেন যে, ধর্ম্ম ভিত্তি করিলে ভারতের উন্নতি-সাধন হইবে না, কারণ ভারতবাসী সকলে এক-ধর্ম্মাবলম্বী নহে। ভারতে মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, অগ্নি-উপাসক পার্শী প্রভৃতি নানা জাতি আছে, তাহারা সকলে একপ্রাণ না হইলে—ভারত উন্নত কিরূপে হইতে পারে? বিবেকানন্দ এই প্রশ্নের একটি চমৎকার উত্তর প্রদান করিয়াছেন। বিবেকানন্দ বলেন,—নর-সেবা তোমার একমাত্র ব্রত করো। এই সেবা-ধর্ম্ম প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম। মনুষ্যমাত্রই পরমাত্মার মূর্ত্তিস্বরূপ। ব্রহ্মের বিকাশই মনুষ্য। এই মনুষ্যের সেবাই হিন্দুর পরম ধর্ম্ম। আমরা সেই ব্রহ্মের স্বরূপ জানিয়া যদি প্রত্যেক মানবের সেবায় নিযুক্ত থাকি, তাহা হইলে মুসলমান, বৌদ্ধ প্রভৃতি পার্থক্য কোথায় থাকিবে? সেই সেবায় মুগ্ধ হইবে না, এমন মানবদেহধারী কে থাকিতে পারে? অহিন্দু বলিয়া ঘৃণা করিলে পার্থক্য জন্মিবে, কিন্তু সেবা-ধর্ম্মে পার্থক্য কোথায়?

বিবেকানন্দ যে সকল সেবাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন, সেই সকল আশ্রম দেখিলে এই যে সংশয় তাহা আর কাহারও মনে থাকিবে না।

তিনি বুঝিবেন যে, প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম—এই সেবাধর্ম্ম অবলম্বনই ভারতের একতার একমাত্র ভিত্তি। সেই ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়া ভারত একপ্রাণ হইবে। ইহাতে ঘৃণা-বিদ্বেষ তিরোহিত হইবে; যিনি সেবাধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, তিনি মনুষ্য—ব্রহ্ম তাহাতে বিরাজমান। সেই ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করিয়া অপরের সেবা করিবেন ও সেবার দ্বারা সেই সেব্য ব্যক্তিরও ব্রহ্ম উদ্দীপিত হইবে।

আপত্তি হইতে পারে, ইহা কঠিন পন্থা। কঠিন পন্থাই বটে। সেই কারণে বিবেকানন্দ ধনী বা বড় লোকের দ্বারস্থ হন নাই; বিলাসী হইতে শতহস্তদূরে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত বঙ্গীয় যুবকগণকে তাঁহার কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা উদ্যমশীল, তাঁহারা মনুষ্য, তাঁহারাই বিবেকানন্দের কার্য্যভার-গ্রহণে সমর্থ। তিনি বার বার বলিয়াছেন,—"বঙ্গযুবক, বিশ্বাস করো তোমরা মনুষ্য, বিশ্বাস করো তোমরা অপরিসীম কার্য্যক্ষম, বিশ্বাস করো ভগবান্ তোমাদের সহায়, বিশ্বাস করো ভারত তোমাদের মুখাপেক্ষী। অগ্রসর হও, পশ্চাৎপদ হইও না। তোমরাই আত্মত্যাগে ভারতমাতার প্রীতিসাধন করিতে পারিবে। বিশ্বাস করো তোমাদের সার্থক জন্ম। বিশ্বাস করো কখনও নিষ্ফল হইবে না। তোমাদের বিশ্বাসে মেরু টলিবে, সাগর শুষিবে।"

কাহাকেও ঘৃণা করিও না, ভগবান্ রামকৃষ্ণের মানা—বিবেকানন্দের গুরুদেবের মানা। বিশ্বাসে শুষ্ক স্বতন্ত্রতা আসিতে পারে, ভক্তিতে সেই স্বতন্ত্রতা দূর করো। ভক্তির কোমলতা জ্ঞানের দ্বারা দৃঢ় করো। রামকৃষ্ণের জীবনে ভক্তি, জ্ঞান ও বিশ্বাসের সমন্বয় দেখো। কল্পিত নৈতিক ধর্ম্মে আবদ্ধ থাকিও

না, কাহারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিও না, আত্মত্যাগপূর্ব্বক উৎসাহিত হইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করো। ত্যাগ অর্থে সংসার-ত্যাগ নয়, দশকর্ম্মান্বিত প্রকৃত সংসারী হও।

তোমরা নিঃস্ব—আরও ভালো। তোমাদের উদ্যম ও উৎসাহ অপরিসীম। মনুষ্যত্ব লাভ করো,—তোমরা মনুষ্য, এই বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ় করো। "বিশ্বাস করো"—বিবেকানন্দের এই শেষ কথা। এই বিশ্বাস-দ্বারাই বিবেকানন্দের স্মৃতি-স্থাপনা করিবে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

কোকিল

লোকে বলে কোকিলের রূপ নাই, কোকিল কুৎসিত—কেন-না কোকিল কাল। স্বীকার করি, নানারঙে রঞ্জিত সুকোমল-পক্ষ-বিশিষ্ট অনেক পক্ষী আছে—তাহারা কোকিল-অপেক্ষা সুন্দর। তাহাদের মধ্যে অনেকের সৌন্দর্য্যে অপূর্ব্ব কমনীয়তা, অনেকের সৌন্দর্য্যে জ্যোতি, অনেকের সৌন্দর্য্যে অপূর্ব্ব কান্তি, অনেকের সৌন্দর্য্যে অপূর্ব্ব মহিমাও লক্ষিত হয়। কোকিল কাল—অতএব কোকিলের সেরূপ সৌন্দর্য্য নাই। কিন্তু কাল বলিয়াই কি কোকিল কুৎসিত? কাল জল সুন্দর, কাল মেঘ সুন্দর, কাল চুল সুন্দর। তবে কাল কোকিল সুন্দর নয় কেন? তুমি বলিবে—কেন তাহা বলিতে পারি না, তবে কুৎসিত দেখি, তাই বলি কাল কোকিল কুৎসিত। আমি বলি—তুমি সৌন্দর্য্য দেখিতে জান না, তাই কাল কোকিলকে কুৎসিত দেখ। দেখ, কাল জল কাল বলিয়া সুন্দর নয়; তাহা হইলে এই যে কাল কালিতে লিখিতেছি, ইহার অপেক্ষা সুন্দর আর কিছুই হইত না। কাল জলে নক্ষত্র-খচিত নীল আকাশের ছবি উঠে বলিয়া কাল জল সুন্দর। তেমনি কাল মেঘ অমৃতবৎ বারি বর্ষণ করিয়া কাল জলের সহিত কথা কয় বলিয়া সুন্দর। আর কাল চুল সতীর পায় লুটায় বলিয়া সুন্দর। ভালর সম্পর্কে থাকিয়াই কাল ভাল। ছেলে নাড়ীছেঁড়া ধন বলিয়াই জননীর চক্ষে তাহার কাল রঙ এত সুন্দর। কাল কোকিলের কি এমন কিছুই নাই, যাহার গুণে তাহাকে কুৎসিত না দেখিয়া সুন্দর

দেখি? তুমি বলিবে—কিছুই ত নাই, থাকিলে তাহাকে কুৎসিত দেখিব কেন? আমিও এই কথার একটি মীমাংসা করিব বলিয়া আজ কোকিলের কথা পাড়িয়াছি।

কোকিল অনেক দিনাবধি কবিদিগের সম্পত্তি। কবিরা কোকিলকে লইয়া অনেক খেলা খেলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কোকিলকে চিনিতে পারেন নাই। তাই আজ কোকিল এত কুৎসিত পাখী। কবিরা বলেন যে, কোকিলের স্বরে বিষ বৈ আর কিছুই নাই—যে মধু আছে তাহাও বিষমাখা। কিন্তু কোকিলের স্বরে বিষ বৈ কি আর কিছুই নাই? সেই সুললিত, সুমধুর, সুঠাম, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সতেজ, হোমাগ্নিশিখার ন্যায় পূর্ণাবয়ব, স্বতঃ-উৎপন্ন, স্ফূর্ত্তিবৎ কু-উ ধ্বনিতে কি বিষ থাকিতে পারে? খলতাশূন্য, গ্লানিশূন্য, সরল বালক সমস্ত রাত্রি সুখের ঘুম ঘুমাইয়া, শেষ-নিশাতে দিবসের খেলার স্বপ্ন দেখিতেছে। গৃহপার্শ্বস্থ কাননে কোকিল কু-উ করিয়া উঠিল। বালক আহ্লাদে মাতিয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া খেলা করিতে ছুটিল। কোকিল ডাকিয়াছে আর তাহাকে ধরে কে? কোকিলের স্বরে বিষ কৈ? কোকিলের স্বর তমসাচ্ছন্ন জগৎকে ফুটাইয়া দিল; নিদ্রিত বিষাদমণ্ডিত দিক্গুলকে হাসাইয়া তুলিল; সমস্ত শিরায় রক্তস্রোত ছুটাইয়া দিল; সর্ব্বশরীরে এক অপূর্ব্ব আনন্দ-তড়িৎ হানিল। কোকিলের কু-উ ধ্বনি ঐন্দ্রজালিকের নিঃশ্বাস!

আবার বালককে ছাড়িয়া বাল-সূর্য্যের দিকে চাহিয়া দেখ। তমসাবৃত সুদূর গগনপ্রান্ত ঈষৎ লাল রঙে রঞ্জিত হইয়াছে। অন্ধকারের প্রাণের ভিতর চোরের ন্যায় নিঃশব্দে এবং অলক্ষিতে একটু একটু করিয়া অস্পষ্ট আলোক প্রবেশ করিতেছে। এখানে

ওখানে কোথায় কি যেন আস্তে আস্তে খুস্ খাস্ করিতেছে—ঠিক বলিতে পারা যায় না, কিন্তু বোধ হইতেছে যেন শূন্যে কোন একটা শব্দের নিস্তব্ধ রকম প্রতিধ্বনি শুনা গেল। যেন কাণের কাছে একটা গাছের পাতা আস্তে আস্তে নড়িয়া উঠিল। যেন কোথায় কে রুদ্ধকণ্ঠে 'আব্', 'হাম্' এইরূপ একটা শব্দ করিল। নিদ্রিত মনুষ্য যেন গভীর সমুদ্রতল হইতে একটু একটু করিয়া উর্দ্ধে উঠিয়া সমুদ্রের উপরিভাগে ভাসিয়া পড়িল—তাহার মুদ্রিত চক্ষের পল্লবের ভিতর একটু একটু আলো খেলা করিতেছে। সমস্ত পৃথিবীটা ফুটিল ফুটিল বোধ হইতেছে। এমন সময়ে যেন সমস্ত স্ফোটনোন্মুখী পৃথিবীখানা কু-উ শব্দ করিয়া উঠিল,—আর একেবারে বনে পাখী পাখা ঝাড়া দিয়া উঠিল, গ্রামে মানুষ 'দুর্গা দুর্গা' বলিয়া উঠিল, পূর্ব্বদিকে একটা প্রকাণ্ড রাঙা গোলা হুস্ করিয়া উঠিয়া পড়িল, চারি দিক্ ফরসা হইয়া গেল। কাল কোকিল ব্রহ্মাণ্ডটাকে ফুটাইয়া দিল!

কোকিলের কু-উ স্বরে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের স্ফোট একীভূত। সেই বিশাল স্ফোটের অপূর্ব্ব সঙ্গীত কোকিলের কাল কণ্ঠ দিয়া নিঃসৃত হয়। জগতে যতকিছু অপূর্ব্ব স্ফোট, অপূর্ব্ব বিকাশ, অতুল উন্নতি আছে, সবই যেন কোকিলের অপূর্ব্ব কু-উ ধ্বনি। প্রস্ফুটিত ফুল, প্রস্ফুটিত শিশু, প্রস্ফুটিত যুবা,—হোমরের ইলিয়দ, কালিদাসের কুমার, সেক্সপিয়রের ম্যাক্‌বেথ, শেলীর স্কাইলার্ক, ফিদিয়সের যুপিতর,—বীরশ্রেষ্ঠ গর্দন, দয়াবতার হাউয়ার্ড, প্রেমোন্মত্ত চৈতন্য, জ্ঞানোন্মত্ত শঙ্কর, ব্রহ্মাণ্ডরূপী ব্যাস—সকলই এক এক অপূর্ব্ব কু-উ ধ্বনি!

চন্দ্রনাথ বসু

সেকালের ছাত্রাবাস

এখন বিদ্যার্থিগণের জন্য বড় বড় বাড়ীর প্রয়োজন হয়, ভাল ভাল ছাপার বই দিতে হয়, দুই বেলা তাহাদিগকে অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া দিতে হয়। কিন্তু এমন দিনকাল ছিল, যখন ভারতের ছাত্রেরা কুটীরে বাস করিত, আপনার পড়িবার পুস্তক আপনি নকল করিয়া লইত এবং যৎসামান্য উপকরণে অর্দ্ধসিদ্ধ অন্ন আপনি পাক করিয়া, তাহাই ভোজন করিয়া দিনযাপন করিত। শুষ্ক তালপত্রে অগ্নি লাগাইয়া, তাহা প্রজ্বলিত হইলে, তাহাতেই পাঠচর্চ্চা করিত ; এ সকল গল্প-কথা নহে।

বৌদ্ধ-গৌরবের সময়ে এক এক মঠে দশ-পনের হাজার ব্রহ্মচারী ছাত্র বিদ্যাভ্যাস করিতেন। শিলাদিত্যের রাজধানীতে এইরূপ মঠ চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফাহিয়ান স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন।

কুটীরবাসী ছাত্রের সংখ্যা নবদ্বীপে বহুতর ছিল। দুই শত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে একজন ফরাসী পর্য্যাটক স্বচক্ষে বিংশতি সহস্র ছাত্র নবদ্বীপে দেখিয়াছিলেন।

প্রায় চারি শত পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপের কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা বৃন্দাবনদাস ঠাকুর 'শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে' বিস্তারিত লিখিয়াছেন,—

"নানা দেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥

অতএব পঢ়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষকোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয়॥
পঢ়ুয়ার অন্ত নাহি নবদ্বীপ পুরে।
পড়িয়া মধ্যাহ্নে সবে গঙ্গাস্নান করে॥
একো অধ্যাপকের সহস্র শিষ্যগণ।
অন্যোন্যে কলহ করেন অনুক্ষণ॥"

সেই সময়ের নবদ্বীপের ছাত্র-সংখ্যার কথা ভাবিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপের ছাত্র-সংখ্যা বিংশতি সহস্র ছিল—ফরাসী পর্য্যটকের এই কথাটুকু না পাইলে, আমরা বৈষ্ণব কবির বর্ণনা অতি সহজে অবিশ্বাস করিতে পারিতাম। এখন ঐ বর্ণনা পাঠ করিলে, হৃদয়-মধ্যে বিস্ময় ও বিশ্বাসের তরঙ্গ উঠিতে থাকে।

বাঙ্গালার টোল

কেবল নবদ্বীপ বলিয়া নয়, নবদ্বীপের দক্ষিণে ও উত্তরে বহুদূর যাবৎ ভাগীরথীর দুই ধারে, বিশেষতঃ পশ্চিম তটে, বহুতর টোল ছিল। সমগ্র রাঢ়, বঙ্গ, গৌড় হইতে, বিশেষভাবে শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম-অঞ্চল হইতে, অনেক সম্পন্ন ও মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ নিত্য গঙ্গাস্নানের সুবিধার জন্য এবং পুত্র-পৌত্রের বিদ্যাশিক্ষার সুবিধার জন্য এতদঞ্চলে বাস করিতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইলে, বিদ্যার পরিচয় দিয়া জীবিকানির্ব্বাহের জন্য এই নবদ্বীপ-অঞ্চলেই বাস করিতেন। আর বহুতর বিদেশী ছাত্র গুরুজন হইতে স্বতন্ত্র হইয়া এতদঞ্চলে গুরুগৃহে বাস করিতেন। বড় বড় অধ্যাপকের বড় বড় টোল ছিল।

টোল বাঙ্গালার অপূর্ব্ব অনুষ্ঠান; এমন গৌরবান্বিত অথচ আড়ম্বর-রহিত অনুষ্ঠান জগতে বুঝি আর নাই। টোলের সুশৃঙ্খলা, আড়ম্বরশূন্যতা ও মিতব্যয়িতা বাঙ্গালী ছাত্রগণকে বলে,—তোমরা তৃণপর্ণ-কুটীরের মর্য্যাদা বুঝ, প্রকাণ্ড প্রস্তর-প্রাসাদ দেখিয়া ঘূর্ণিতমস্তক হইও না।

টোলকে এখন চতুষ্পাঠী বলা হয়, পূর্ব্বে চৌবাড়ী বলিত। একটি বিস্তৃত ভূখণ্ডের উপরিভাগে দণ্ডায়মান মৃত্তিকা-প্রাচীর-বেষ্টিত কতকগুলি সুদীর্ঘ তৃণাচ্ছাদিত গৃহ। গৃহগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঠরীতে বিভক্ত। কুঠরীগুলি ৩ হাত প্রস্থ, আর ৬ হাত দীর্ঘ। যে প্রাচীর-দ্বারা একটি কুঠরী অন্যটি হইতে পৃথক্ হইয়াছে, সে প্রাচীর চাল পর্য্যন্ত যায় নাই,—মাত্র ৪ হাত উচ্চ। কুঠরী-গুলির সম্মুখের বারাণ্ডা সুদীর্ঘ এবং উন্মুক্ত। এমনই একটি ঘরে কুড়িটি কুঠরী। প্রত্যেক দিকে এরূপ ৩।৪ খানি ঘর আছে। কোন এক দিকে হয়ত একখানি ঘরের স্থান পড়িয়া আছে, সেই স্থান দিয়া অধ্যাপকের ভবনে যাইতে হয়। এই যে চত্বর—ইহাই চৌবাড়ী। এমন একটি চৌবাড়ীতে ২৫০।৩০০ ছাত্র স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন। প্রতি কুঠরীতে এক এক জন ছাত্র রন্ধন, ভোজন এবং শয়ন করেন। কাহারও সহিত কাহারও কোনরূপ গৃহস্থালির সম্পর্ক নাই।

তবে এক কুঠরী হইতে পার্শ্বের কুঠরীর ছাত্রের সহিত কথা-বার্ত্তা কহা চলে; চারি হস্ত উচ্চ প্রাচীর ব্যবধান থাকায় পরস্পর মুখ-দেখা চলে না। রন্ধন, ভোজন, শয়ন—একটি তিন হাত প্রস্থ ঘরের মধ্যে হয়, সে বড় বিচিত্র! বিচিত্র বৈ কি! আগড় ঠেলিয়া বা কবাট খুলিয়া কুঠরীতে প্রবেশ

করিয়াই দেখিবে, ঠিক সম্মুখে অর্থাৎ পশ্চাতের দেওয়ালে একটি কুলুঙ্গী। সেই কুলুঙ্গীতে রন্ধনের পাত্র থাকে। তিন-হাত চারি-হাত মেজের সহিত তাহার কোন সংস্রব নাই। এক পার্শ্বে ক্ষুদ্র 'দোপাকা' চুল্লী, অবশ্য রন্ধনের সময়েই ব্যবহৃত হয়।

দিনের বেলায় পাঠাভ্যাস দাওয়াতেই হয়; কখন বা অধ্যাপকের সমক্ষে, কখন বা নয়। রাত্রির বিদ্যাচর্চ্চা সেই কুঠরীর অভ্যন্তরে হইয়া থাকে। দোপাকা উনানের আলোকই দীপের কার্য্য করে। আহারান্তে পাঠাভ্যাস পারগপক্ষে দীপালোকে হয়। কুলুঙ্গীর বিপরীত দিকের দেওয়ালে, দীপ রাখিবার একটু হাতলের মত আছে।—ঘরের তিন কোণে শিকা আছে, চুল্লীর দিকে নাই। চুল্লীর বিপরীত দিকে ছোট একটি 'পেতেন' আছে; তাহাতে গোটা-দুই হাঁড়ি ও ভাঁড়।

যেমন আবাস, আহারের বন্দোবস্ত তদনুরূপ বা আরও বিচিত্র। অধ্যাপক ছাত্রদিগকে তণ্ডুল ও কাষ্ঠ দিয়া থাকেন। তণ্ডুল রন্ধনোপযোগী দেন, কাষ্ঠ হয় বাগান না হয় জঙ্গল হইতে ভাঙ্গিয়া আনিতে হয়; নতুবা বড় বড় কুঁদো কাঠ অধ্যাপক মহাশয় সংগ্রহ করিয়া চত্বরের মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছেন, তাহাই চেলাইয়া লইতে হয়। কিন্তু কেবল কাঠ আর চাউল হইলেই ত চলে না; তেল-নুণ চাই, সামান্য ব্যঞ্জনও ত কিছু চাই, দাইলও ত কিছু চাই, আর বঙ্গদেশীয় ছাত্র—কিছু মৎস্য না হইলেই বা কিরূপে চলে? যে, বাড়ী হইতে প্রচুর আনিতে পারিত, তাহার ত কথাই নাই; কিন্তু অনেকেই ত পারিত না; কাজেই তাহাদিগকে দক্ষিণা ও দানের উপর নির্ভর করিতে হইত এবং তাহাদের অতি কষ্টে চলিত। আর তাহাদিগকেই তালপাতা

জ্বালিয়া পাঠচর্চ্চা করিতে হইত। কিন্তু এই কঠোর জীবনের বিস্তার আঁটনি বড়।

এইরূপ টোলই বাঙ্গালার এই সকল অঞ্চলে ছিল এবং অধিকাংশ ছাত্রই অতি কষ্টে দিনযাপন করিত। তবে দুই-একটি সুবিধাও ছিল।

প্রথম সুবিধা, তখন সকল ভদ্র গৃহস্থেরই বাটীতে 'বার মাসে তের পার্ব্বণ' ছিল। তাহা ছাড়া শান্তিস্বস্ত্যয়ন, ব্রতনিয়ম, দিনশ্রাদ্ধ, জন্মতিথি-পূজা—এ সকলও ছিল, সুতরাং ছাত্রগণের এখন অপেক্ষা পাওনা অধিক ছিল।

দ্বিতীয় সুবিধা অন্য রূপের।—বাঁশবেড়ে হইতে মুর্শিদাবাদ-খাগড়া পর্য্যন্ত গঙ্গার দুই ধারে কাঁসারিব কারবার খুব চলিত। পিত্তল-কাঁসার তৈজস রাশি রাশি নির্ম্মিত হইত। নির্ম্মাণের জন্য কাঁসারিদের কাঠ-কয়লার প্রয়োজন হইত। গৃহস্থের বাড়ীতে কাঁসারিরা, ক্বচিৎ স্বর্ণকারেরা, কয়লা ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত।

নবদ্বীপ, পূর্ব্বস্থলী প্রভৃতি স্থানে বিস্তর কাঁসারি ছিল। একটা টোলে গেলে ২০০।৩০০ চুল্লীর কয়লা পাওয়া যায়, কাজেই ছাত্রগণের কয়লা-বিক্রয়ের বড় সুবিধা ছিল। গরিব-দুঃখীর মেয়েরা ছাত্রদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিত যে, তাহারা ঘর নিকাইয়া, থালা মাজিয়া, কুটনা কুটিয়া, বাটনা বাটিয়া ও বাজার করিয়া দিবে, কেবল দুই বেলার কয়লাগুলি পাইবে। এইরূপ বন্দোবস্তে ছাত্রদিগের বড়ই সুবিধা ছিল। ছাত্রগণ প্রাতে সেই দুঃখিনীর হাতে দুইটি করিয়া পয়সা দিলেন, আর নিশ্চিন্ত। সে সেই সকল পয়সা লইয়া আট আনার, কি দশ আনার বাজার আনিল। তৎপূর্ব্বেই গৃহ-প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করিয়া, থালা-ঘটি

মাজিয়া দিয়া গিয়াছে। তাহার পর বাটনা একত্র বাটিয়া, কুটনা একত্র কুটিয়া, এক একখানি পিত্তলের থালে বাটনা ও তরকারি, হয়ত কিছু মৎস্য সাজাইয়া প্রতি কুঠরীতে দিয়া চলিয়া গেল। প্রাতেই ছাত্রেরা তাহাকে বলিয়া দিতেন, "আজি ত্রয়োদশী, বার্ত্তাকু আনিও না," "অন্ত হইতে মূলা আর চলিবে না।" পরিচারিকা কুটনা, বাটনা, তরকারি দিয়া চলিয়া যাইত এবং ছাত্রদের ভোজনের পরই আসিয়া তাড়াতাড়ি কয়লায় জল দিত, কেন-না সেইগুলিই তাহার প্রধান সম্বল। কাঁসারিরা তাহার নিকট হইতেই কয়লা লইত।

অধ্যাপক মহাশয় চৌবাড়ীর সংলগ্ন আপনার মণ্ডপে প্রথমে অধিকতর কৃতবিদ্য ছাত্রগণকে পাঠ দিতেন। সেই ছাত্রেরা আবার তাঁহার সমক্ষে অন্য ছাত্রগণকে পাঠ দিত। কদাচিৎ তিনি কোন ঘরের দাওয়ার এক দিকের উচ্চ বেদিতে বসিয়া পাঠ দান করিতেন। বৈকালে বিদ্বান্ ছাত্রগণের মধ্যে শাস্ত্রের বিতণ্ডা বা বাদানুবাদ হইত।

গ্রামস্থ অধীতী ছাত্রগণ টোল ছাড়িয়াও ছাড়িতেন না; তাঁহারা প্রায়ই টোলে আসিতেন, অধ্যাপক যাহাদিগকে পাঠ দিতে বলিতেন, তাহাদিগকে পাঠ দিতেন এবং সেই টোলের নিমন্ত্রণ হইলে তাঁহারাও তাহার ফল ভোগ করিতেন।

এখন ঠিক এরূপ টোল দেখিতে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু ছাঁচ সেইরূপই আছে। তবে অনেক স্থলে ছাত্রেরা এখন রাঁধা-ভাতের আব্দার করিয়া থাকে। একটু-আধটু আব্দার হয় হউক, কিন্তু ছাত্রমাত্রেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, ছাত্রাবস্থা শিক্ষার সময়—বিলাসের সময় একেবারেই নয়। এই সময়ে

কঠোরতা অভ্যাস করিলে পরে কষ্টকে কষ্ট বলিয়াই মনে হয় না। লেখাপড়া-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সহিষ্ণুতা ও সংযম যত শিখিতে পারা যায়, ততই লাভ। এমন লাভ পারগপক্ষে তোমরা ছাড়িও না।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

জনসাধারণের উন্নতি

কোন একটি দেশে কেবল উর্দ্ধতন শ্রেণীর জনকতক লোকের জ্ঞানার্জ্জনে, ধনসঞ্চয়ে বা বিদ্যাশিক্ষায় অধিকার বা সুবিধা থাকিলে, সে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইলেও সে শ্রী অধিক দিন থাকে না। মনু বলিয়াছেন যে, যে পরিবার-মধ্যে স্ত্রীলোকেরা কষ্ট পায়, সে পরিবার-মধ্যে কখনও লক্ষ্মী থাকে না। আমরাও সেইরূপ দেখিতেছি যে, যে দেশের সাধারণ লোক-সকল অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন থাকে, সে দেশের ক্রমোন্নতি হয় না। প্রাচীন ঋষিগণ সামাজিক নিগূঢ় তত্ত্ব-সকল বহুকালব্যাপী গভীর চিন্তা-দ্বারা বৈজ্ঞানিক বিষয়ের মত স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেন। দায়ক্রম, বিবাহ, ব্যবহার, বিচার, প্রজাপালন প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহারা যে সকল ব্যবস্থা ও নিয়ম প্রচলিত করিয়াছিলেন, সে সকল-অপেক্ষা ভাল নিয়ম এখনও মানবের বুদ্ধির গোচর হয় নাই। কেবল এই একটি বিষয়ে অবহেলা করাতেই সেই মহাত্মগণের গঠিত এই বিপুল প্রাসাদ চূর্ণীকৃত হইয়া গিয়াছে! ঋষিগণ অট্টালিকার প্রাচীর, প্রকোষ্ঠ, স্তম্ভ, শীর্ষ সকলই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন, কিন্তু ভিত্তিতে যে মহৎ দোষ ছিল, তাহার সংশোধনের চেষ্টা করেন নাই,—নিম্নস্তরের অবস্থা উন্নত করিতে চেষ্টা করেন নাই। কুরুক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়-ক্ষয় হইলে, হলধারী বৈশ্যে বা দ্বিজসেবক শূদ্রে সে ক্ষতি পূরণ করিতে পারিল না। সেইবার ভারতে আর্য্যজাতির প্রথম পতন। নিম্নস্তরের উত্থানশক্তি ছিল না বলিয়া, শূদ্র-বৈশ্যের

ক্ষত্রিয়ত্ব-প্রাপ্তির অধিকার ছিল না। ক্ষমতা ছিল না, তাহাতেই ভারতবর্ষ অধঃপাতে গিয়াছে।

তবে যে ভারতবর্ষে উন্নতি উন্নতি বলা যায়, সে কেবল ছাদের কার্নিসের পারিপাট্য মাত্র; তলেতে, ভিত্তিতে সেই পূর্ব্বের মত বাজারু ইটের কাঁচা গাঁথুনি আছে; এবং বহুকালের গাঁথুনি বলিয়া এখন লোণা লাগিয়াছে, কোথাও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, কোথাও ফাটিয়া রহিয়াছে। তখন যেরূপে আর্য্যভূমি অধঃপাতে গিয়াছে, এখনও আমরা সেই পাপে লিপ্ত। এখনও আমরা অনেকে মনে করি যে, ছোট লোকের ঘরে পয়সা হইলে, কিংবা গায়ে বল থাকিলে, অথবা তাহারা লেখাপড়া শিখিলে আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। এ ভ্রম যতদিন থাকিবে, ততদিন আমাদের মঙ্গল নাই।

ছোট লোকের বাড় হউক,—ঘরে পয়সা, মরায়ে ধান, গায়ে বল থাকুক, আর ভদ্রসন্তানের অবস্থা হীন হউক, এ ইচ্ছা কাহারও নাই। আমরা বলি—সাধারণ লোককে অজ্ঞ, মূর্খ, নিঃস্ব রাখিয়া আমরা বড় থাকিতে চাহি না। দশ হাজার কুটীরবাসী অশিক্ষিতের মধ্যে একজন রামকৃষ্ণ পোদ্দার হইয়া থাকা ভাল?—না, যেখানে পঞ্চাশ ঘর মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ আছে, পঞ্চাশ ঘর চাকুরে কায়স্থ আছে, কার-কারবার-শাঁসেজলে পাঁচ হাজার ঘর নবশাখ আছে,—সেকরায় সোণা-রূপার কারবার করিতেছে, কামারে তলোয়ার-খাঁড়া তৈয়ার করিতেছে, কাঁসারিতে ঢালাই-গলাই করিতেছে, জেলে-বাগ্দী মাছ ধরিয়া চালান দিতেছে, সকলেরই ঘরে দু'পয়সা দু'সিকি আছে, আর সকল জাতির মধ্যেই পাঁচসাতজন লেখাপড়া জানে অর্থাৎ চিঠি লিখিতে পারে, হিসাব রাখিতে জানে, এবং বিল-কবজ পড়িতে পারে,—এরূপ স্থানে থাকা ভাল? আমাদের

বিবেচনায় অসভ্য অশিক্ষিতের মধ্যে থাকিয়া প্রভুত্ব করা অপেক্ষা এরূপ সমাজে অল্প কষ্ট সহ্য করিয়া বাস করা শতগুণে শ্রেয়স্কর। অশিক্ষিতের মধ্যে পুরুষানুক্রমে বাস করিতে হইলে, ক্রমে অবনতিই ঘটে। যে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশের সমাজের পতি, তিনি এইখানে পার্শ্ববর্ত্তী জাতির বল পান নাই বলিয়া ক্রমে অধঃপতিত হইয়া নিস্তেজ, নির্বীর্য্য এবং তমসাচ্ছন্ন! সমাজের নিম্নস্তরে সকলের সম্প্রসারণ-শক্তি না থাকিলে উর্দ্ধতন শ্রেণীর কখনও স্থায়ী উন্নতি হইবে না, সময়ে সময়ে অধঃপতন হইবেই হইবে।

জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে, প্রথমতঃ জনসাধারণকে তাহাদের আপনার কথা ভাবিতে শিখান উচিত। যে আপনার ভাবনা ভাবে না, তাহার ভাবনা আর পাঁচজনে ভাবিয়া কি করিবে? আমাদের দেশে সাধারণ লোকের দুঃখের ভাবনা সকলেই ভাবে, কিন্তু সে কেবল নিজের বা নিজ-পরিবারের জন্য। সকলে মিলিয়া সকলের জন্য ভাবিতে প্রায় জানে না। সকল শিক্ষার আদি, মধ্য, অন্ত, শিক্ষার সার হইতেছে—পরের ভাবনা ভাবিতে শিখা। যাহার এ শিক্ষা নাই, সে শিক্ষিত নহে। যিনি পরের ভাবনা ভাবিতে শিখেন নাই, তিনি বিদ্বান্ হইতে পারেন, বুদ্ধিমান্ হইতে পারেন, পণ্ডিত হইতে পারেন, অধ্যাপক হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে শিক্ষিত বলিতে পারি না। এই শিক্ষা আছে বলিয়াই ইউরোপের উন্নতি এবং আমেরিকার অত্যুন্নতি! এই শিক্ষা নাই বলিয়াই আমাদের দেশের এত অবনতি। এই শিক্ষা দেশ-মধ্যে প্রচলিত করান নিতান্ত আবশ্যক।

দৃষ্টান্ত-দ্বারা শিক্ষা সহজেই পাওয়া যায়। তুমি যদি আমার ভাবনা ভাবিতে থাক, তাহা হইলে আমি তোমার ভাবনা অবশ্য

ভাবিব, আর মধ্যে মধ্যে আরও পাঁচজনের জন্য ভাবিতে শিখিব ; আমি যদি আরও দশজনকে আমার ব্যথার ব্যথী হইতে দেখি, তবে ক্রমে আমিও সেই কয়জন ছাড়া আরও দশজনের ব্যথা বুঝিতে পারিব। আমাদের দেশের শিক্ষা-দোষে উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে সাধারণ লোকের ব্যথার ব্যথী লোক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং সাধারণের একে শিক্ষা নাই, তাহাতে কেহ কোন দৃষ্টান্ত দেখিতে পায় না, কাজেই পরস্পরের বেদনা পরস্পরে বুঝিতে পারে না।

যত দিন উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিগণের সহিত নিম্নস্তরের এই অসংখ্য প্রাণীর সহানুভূতি না হইবে, তত দিন আমাদের প্রকৃত উন্নতি হইবে না। আজিকালি অনেকে জনসাধারণের হীন অবস্থা দেখিয়া ভীত হইয়াছেন। যাহাতে জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি হয়, তৎপক্ষে দৃষ্টি পড়িয়াছে; জনসাধারণের শিক্ষা দিবার কথাবার্ত্তা উঠিয়াছে। বড় আহ্লাদের কথা।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

আসল ও নকল

আমরা যদি মিথ্যাতে এতটা বিশ্বাস না করিতাম, তাহা হইলে আমাদের পক্ষে ভাল হইত। এ জগতে একপ্রকার হইয়া আর একপ্রকার দেখান যায়, এবং দেখাইয়া মানুষকে চিরপ্রবঞ্চনার মধ্যে রাখিতে পারা যায়,—ইহা যদি মানুষ না ভাবিত তাহা হইলে ভাল হইত; কারণ তাহা হইলে মানুষ নকল ছাড়িয়া আসলটা ধরিবার জন্য ব্যগ্র হইত। আমরা অনেকে যে এ জগতে সারবান্ চরিত্র লাভ করিতে পারি না, তাহার প্রধান কারণ এই যে, নিরেট খাঁটী বস্তুর প্রতি আমাদের বিশ্বাস অল্প। নিরেট খাঁটী বস্তুটুকুই জগতে থাকে, জগতে দাঁড়ায় ও কাজ করে; নকল যাহা, তাহা তুষের ন্যায় বায়ুতে উড়িয়া যায়, চুল্লীতে নিক্ষিপ্ত হয়।

বিধাতা এ জগতে আসলে-নকলে, আলোকে-অন্ধকারে, সাধুতাতে ও অসাধুতাতে কেন মিশাইয়া রাখিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না। রামের সঙ্গে একটা রাবণ কেন আছে, তাহা সম্পূর্ণ জানি না। বোধ হয় এই জন্য যে, রাবণকে না দেখিলে রামের মূল্য ভাল করিয়া বুঝা যায় না; রাবণকে পরিহার করিয়া রামকে ধরিতে হইবে, এ জ্ঞান পরিস্ফুট হয় না; কিংবা এ কথাতেও কিছু সত্য থাকিতে পারে যে, পাপের সহিত সংগ্রাম করিতে না পারিলে পুণ্যের বল বাড়ে না। আমি একবার একটি বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম, তাহাতে বক্তা বলিলেন, মানবের যত প্রকার খাদ্যদ্রব্য আছে, তাহার সকলের সঙ্গেই অসার-ভাগ আছে, অর্থাৎ যাহা

পরিপাক-ক্রিয়ার দ্বারা দৈহিক ধাতুপুঞ্জের সহিত একীভূত হয় না, যাহাকে সময়ান্তরে দেহ হইতে বর্জ্জন করিতে হয়, এমন অনেক দ্রব্য আছে। এখন প্রশ্ন এই, যাহা অসার, যাহা এক সময়ে দেহ হইতে বর্জ্জন করিতেই হইবে, তাহা মানবের খাদ্যের সহিত মিশিয়া রহিল কেন? প্রশ্নের উত্তরে বক্তা বলিলেন, ঐ অসার ভাগগুলি থাকার জন্য সার ভাগগুলি কার্য্য করিতে পায়, ওগুলি না থাকিলে পুষ্টিকর সামগ্রীগুলি সে প্রকার জোরের সহিত কার্য্য করিতে পারিত না। তৎপরে এ বিষয়ে অনেক চিন্তা করিয়াছি। অনুভব করিয়াছি যে, বিধাতার সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার মধ্যে এরূপ ব্যবস্থাই আছে যে, একটি সারবস্তুকে বলবান্ করিবার জন্য দশটি অসার-বস্তু তাহার চারি দিকে থাকে। যেমন মানুষ যখন পাখীটিকে মারিবার জন্য বন্দুকে গুলি পোরে, তখন অনেক সময়ে দেখি যে, একমুঠা গুলি তাহার মধ্যে দিল; কিন্তু পাখীটি যখন মরে, তখন একটি বা দুইটি গুলিতেই মরে; যদি সে বিংশতিটি গুলি বন্দুকের মধ্যে দিয়া থাকে, তবে দুইটি কাজে লাগিল আর অষ্টাদশটি বৃথা গেল। কিন্তু সম্পূর্ণ বৃথা কি গেল? কখনই না। সেই অষ্টা-দশটি গুলি বন্দুকের মধ্যে থাকাতে সংঘর্ষণের প্রভাবে অপর দুইটির বলবৃদ্ধির পক্ষে সহায়তা করিয়াছে।

সেইরূপ চিন্তা করিয়া দেখ, এ জগতে যত প্রাণী জন্মিতেছে, সকলে কি কাজ করিতেছে? যত প্রাণী এ জগতে জন্মগ্রহণ করে, তাহারা সকলে যদি জীবিত থাকে, তাহা হইলে অচির কালের মধ্যে ভুবন ভরিয়া যায়। অধিক কি, পণ্ডিতগণ গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, যে হস্তীর শাবক অনেক বিলম্বে হয়, সেই হস্তীর শাবক সকল যদি বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে একশত বৎসরে হস্তীতে জগতের

অধিকাংশ স্থান ভরিয়া যায়। বর্ষাকালে আমরা পথে-ঘাটে কত ভেক-শিশু দেখিতে পাই; দেখি, কৃষ্ণবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভেক চারি দিকে লাফাইয়া বেড়াইতেছে; অন্যমনস্কভাবে পা বাড়াইতে গেলেই, তাহাদিগকে মাড়াইয়া ফেলিবার সম্ভাবনা। অথবা শ্রাবণ, ভাদ্র মাসে কোন কোন সময়ে গঙ্গার জলে একজাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুলীরক দেখিতে পাওয়া যায়, তখন তাহাদের সংখ্যা এত অধিক হয় যে, কলসটি বুড়াইতে গেলেই তন্মধ্যে অনেক কুলীরক যায়। কাপড় দিয়া জল ছাঁকিলেই রাশি রাশি কুলীরক উঠে। এখন প্রশ্ন এই, এত ভেক-শিশু বা এত কুলীরক কোথায় যায়? সকলগুলি কি জীবিত থাকে? সকলগুলি জীবিত থাকিলে কি আর আমরা পা বাড়াইতে পারি, বা গঙ্গাজলে অবগাহন করিতে পারি? নিশ্চয় এতগুলির জন্ম বাঁচিবার জন্য নহে, অল্পসংখ্যক থাকিবে, বহুসংখ্যক মরিবে—এই জন্য। এখন কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, যদি তাহারা মরিবে তবে বিধাতা তাহাদিগকে জগতে আনিলেন কেন? অষ্টাদশটির দ্বারা দুইটিকে বলবান্ করিয়া লইবেন বলিয়াই তাহাদের সৃষ্টি। ইহাকেই পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, জীবন-সংগ্রাম।

এই জীবন-সংগ্রাম জীব-জগতে আছে। যে জীব চলিয়া যায় সে, যে থাকে তাহাকে সবল করিয়া যায়, আসলকে বলশালী করিয়া রাখিয়া যায়। রাবণ মরিয়া যায়, কিন্তু রামকে জয়শালী করিয়া যায়। বিধাতার অভিপ্রায় যাহাই হউক, মানব-জীবনে দেখিতেছি, মানব-ইতিবৃত্তে দেখিতেছি, ঈশ্বরের এই সত্যময় জগতে নকলের, অসত্যের বাঁচিবার আশা নাই। ইহা দেখিয়াই ঋষিরা বলিয়াছিলেন—

"সমূলো বা এষ পরিশুষ্যতি যোঽনৃতমভিবদতি।"

যে অসত্যকে আশ্রয় করে সে সমূলে পরিশুষ্ক হয়, অর্থাৎ মূলহীন বৃক্ষের যেমন এ জগতে বাঁচিবার উপায় নাই, তেমনি যাহা মিথ্যা, যাহা অসত্য, যাহা নকল, তাহার ত বাঁচিবার উপায় নাই। তবে নকল কিছুকাল আসলকে ঘিরিয়া তাহার শক্তি ও মূল্য বাড়াইয়া দেয়—এইমাত্র।

সকল মানব সমাজে ঘুরিয়া বেড়ায় বটে, চাকচক্য-দ্বারা অনেক সময়ে চিত্ত হরণ করে বটে, কিন্তু মানব-প্রকৃতি কাহাকে চায়? কাহার আদর করে? পূর্ব্বে যে দৃষ্টান্ত দিয়াছি, জগতের সাধুমহাজনের শিষ্য-সংখ্যা যে এত, তাহাতে কি প্রমাণ হয়? জগতের লোক তাহাকে কেন ধরিয়াছে? জগতে ক্ষমতাশালী, বুদ্ধিমান্, কৃতী, যশস্বী লোক ত কত জন্মিয়াছে, তাহাদের পশ্চাতে জগদ্বাসী এত যায় নাই কেন? একজন সাধুর পশ্চাৎ হইতে মানুষদিগকে ফিরাইবার জন্য কি চেষ্টাই না হইয়াছে? যীশুর শিষ্যগণ যখন একটি ক্ষুদ্রমণ্ডলীবদ্ধ হইয়া মাথা তুলিলেন, তখন উঠিয়াই দুইটি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত তাহাদের সাক্ষাৎকার হইল। প্রথম গ্রীকদিগের সভ্যতা ও জ্ঞানাভিমান, দ্বিতীয় রোম-সাম্রাজ্যের রাজশক্তি। গ্রীক জ্ঞানাভিমানিগণ এই নব সম্প্রদায়ের লোকদিগকে অজ্ঞ বলিয়া হাসিয়া উড়াইবার চেষ্টা করিলেন; রোমের রাজভক্তি দেববিদ্বেষী-জ্ঞানে ইহাদিগকে সমূলে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা-সত্ত্বেও সেই সূত্রধর-তনয়ের রাজ্য ও প্রজা-সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। ইহা কি ইতিহাসের একটা আশ্চর্য্য ঘটনা নয়? রাবণ যুদ্ধক্ষেত্রে রামকে হতচেতন করিয়া, ভাবিয়া গেল যে; রাম মরিয়াছে; পরক্ষণেই সংবাদ

আসিল, রাম আবার অস্ত্রশস্ত্র লইয়া দণ্ডায়মান, তখন রাবণ বলিল :—

"মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী ?"

জগতের সাধুদের শক্তি-সম্বন্ধে কি এই দশা ঘটে নাই? যখন পৃথিবীর রাজারা ভাবিতেছেন, আগুন নিবাইয়াছি, বিনাশ করিয়াছি, তখন আর একদিকে আগুন লাগিয়া গিয়াছে। রোমের সম্রাট্ খ্রীষ্টিয়ানের দল নিঃশেষ করিবার জন্য রাজবিধি প্রচার করিলেন; ওদিকে তাঁহার রাজপরিবারের লোকেরা খ্রীষ্টিয়ান হইয়া গেল। এ ব্যাপারের মধ্যে কি গূঢ় অর্থ নাই? মহম্মদ ও তাঁহার শিষ্যগণকে সমূলে উৎপাটন করিবার জন্য, পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত করিবার জন্য, মক্কাবাসিগণ চেষ্টা করিতে ক্রটী করে নাই; কিন্তু যতই চেষ্টা করে, ততই মহম্মদের শক্তি বাড়িয়া যায়। ইহার মধ্যে কি অর্থ নাই? অর্থ এই,—মানবপ্রকৃতি আসলকে ভালবাসে, যেখানে খাঁটী ঈশ্বরপ্রীতি, খাঁটী নিঃস্বার্থতা দেখিতে পায়, সেখানেই, সেরূপ মানুষের পায়েই গড়াইয়া পড়ে।

মানব-হৃদয়ের সাধু-ভক্তির বিষয়ে যখনই চিন্তা করি, তখনই অনুভব করি যে, মানব-হৃদয় স্বাভাবিক-ভাবে ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকের অনুগত। ঈশ্বর আপনার সন্তানকে আপনার কাছে-কাছেই রাখেন। সাধুভক্তি কখন কখনও অপাত্রে ন্যস্ত হয় বটে, সাধুতার নকল দেখিয়া লোকে ভোলে বটে, কিন্তু সেই ভোলাতেও প্রকাশ করে মানব-হৃদয়ের পক্ষে আসলটার কত আকর্ষণ। আসলকে আমরা এতই ভালবাসি যে, তাহার নকল দেখিয়া ভুলিয়া যাই। মানব-হৃদয় ধর্ম্মের এতই অনুগত যে, তাহাকে উত্তমরূপে প্রবঞ্চনা করিতে

হইলে, ধর্ম্মের কঞ্চুক পরিতে হয়: মহীরাবণ যেমন বিভীষণের রূপ ধরিয়া গিয়াছিল, তেমনি ধর্ম্মের বেশ ধরিয়া মানব হৃদয়ে প্রবেশ করিতে হয়। জগতে মানুষ মানুষকে অনেকস্থলে ঠকাইয়াছে ও প্রতিদিন ঠকাইতেছে, কিন্তু সকল প্রবঞ্চনার মধ্যে সেই প্রবঞ্চনা সাংঘাতিক, যাহা ধর্ম্মের নামে, ধর্ম্মের বেশে, ধর্ম্মের আকারে আসে, এবং এরূপ প্রবঞ্চক সর্ব্বাপেক্ষা নিন্দনীয়। আসল জিনিষ যাহা, তাহার প্রতি যদি মানুষের প্রাণে প্রেম না থাকিত, তাহা হইলে তাহার নকল দেখাইয়া মানুষ এতদূর প্রবঞ্চনা করিতে পারিত না। এ বিষয়ে এ দেশে একটি সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে।

কোনও স্থানে একজন মুসলমান নবাব ছিলেন, তাঁহার এক বিবাহোপযুক্তা প্রাপ্তবয়স্কা কন্যা ছিলেন। ঐ কন্যা রূপলাবণ্যের জন্য প্রসিদ্ধা ছিলেন। নবাব এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, সাচ্চা ফকীর অর্থাৎ প্রকৃত নির্লোভ পুরুষ যদি পান, তবে তাঁহার হস্তে কন্যাকে অর্পণ করিবেন। এই মানসে নবাবের রাজ্যের সন্নিকটে কোন ফকীর আসিলেই নবাব তাঁহাকে পরীক্ষা করিতেন; তাঁহাকে নানাপ্রকার মূল্যবান্ উপঢৌকন প্রেরণ করিতেন; বিবিধ মূল্যবান্ খাদ্যবস্তু যোগাইতেন; কিংবা তাঁহাকে রাজভবনে নিমন্ত্রণ করিতেন। যদি ফকীর উপহারাদি গ্রহণ করিতেন, বা নিমন্ত্রণ-রক্ষার জন্য রাজভবনে পদার্পণ করিতেন, তাহা হইলে নবাবের বিশ্বাস জন্মিত যে, ফকীর নির্লোভ পুরুষ নহেন। এইরূপে কত ফকীর আসিল ও গেল; রাজকন্যার বর আর জুটিল না। অবশেষে এক রাজকুমার ঐ কন্যার পাণিগ্রহণার্থী হইয়া আসিলেন। তিনি নবাবের পূর্ব্বোক্ত পণের কথা জানিতেন না। তিনি সরলভাবে আসিয়াই বলিলেন, "আমি অমুক স্থানের নবাবের

পুত্র, আপনার কন্যার রূপগুণের কথা অনেক শুনিয়াছি; তাঁহার পাণিগ্রহণার্থী হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি।” নবাব বলিলেন, “সাচ্চা ফকীর না হইলে আমার কন্যা দিব না।” রাজকুমার ভগ্নমনোরথ হইয়া চলিয়া গেলেন।

তৎপরে প্রায় দুই-তিন বৎসর পরে নবীন বয়সের এক ফকীর নবাবের রাজধানীর সন্নিকটে দেখা দিলেন। তাঁহার ফকীরের বেশ, ফকীরের জীবন, কিন্তু দেহ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায়, মুখে প্রতিভার জ্যোতি, আচার-ব্যবহারে সম্ভ্রান্ত-বংশজাত ব্যক্তির লক্ষণ। এই ফকীর রাজধানীর সন্নিকটে আসিয়াছেন, এই সংবাদ নবাবসাহেবের কর্ণগোচর হইল। তিনি প্রথমে মহামূল্য পরিচ্ছদ ও বিবিধ খাদ্যসামগ্রী উপহার পাঠাইলেন। নবীন ফকীর ঐ সকল দেখিয়া হাস্য করিয়া বলিলেন, “তোমাদের নবাব কি আমাকে তাঁহার ধন-সম্পদ্ দেখাইতে চান? আমি ফকীর মানুষ, আমার এ সকল দ্রব্যে প্রয়োজন কি?” এই বলিয়া তাঁহার নিকটে যে সকল লোক বসিয়াছিল, তাহাদিগকে সে সকল দ্রব্য লুটাইয়া দিলেন। এই সংবাদ-শ্রবণে নবাবের মনে বড়ই আনন্দ হইল; ভাবিলেন, আমার কন্যার বর এতদিনে জুটিয়াছে। তৎপরে নবাব ফকীরকে আরও পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে রাজভবনে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। ভৃত্যেরা গিয়া বলিল, “নবাবসাহেবের নিবেদন, আপনাকে দয়া করিয়া একবার রাজভবনে পদার্পণ করিতে হইবে।” ফকীর আবার হাসিয়া বলিলেন, “এত লোক আমার নিকটে আসে, কত ধর্ম্মালাপ হয়, এ সকল ফেলিয়া আমি রাজভবনে যাইব, সে কিরূপ? তোমাদের নবাবের ইচ্ছা হয়, তিনি আমার নিকট আসুন।”

নবাব এই উত্তর যখন পাইলেন, তখন তাঁহাকেই কন্যাদান করা

কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলেন। কতিপয় দিবস পরে নবাব উক্ত প্রস্তাব লইয়া স্বয়ং ফকীরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কিন্তু ফকীর প্রস্তাব শুনিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "নবাবসাহেব, আপনার কি স্মরণ হয়, দুই-তিন বৎসর পূর্ব্বে অমুক দেশের রাজকুমার আপনার কন্যার পাণিগ্রহণার্থী হইয়া আসিয়াছিল?" নবাব বলিলেন, "হাঁ।" ফকীর বলিলেন, "এই যাহাকে ফকীরের বেশে দেখিতেছেন, এ সেই ব্যক্তি। আপনার কন্যাকে পাইবার জন্যই আমি ফকীরের বেশ ধরিয়াছি, নানা তপস্যা করিয়াছি, নানাস্থানে পর্য্যটন করিয়াছি, ফকীরের রীতিনীতি শিখিয়াছি, অবশেষে আপনার রাজধানীর সন্নিকটে আসিয়াছি। কিন্তু আপনার ভৃত্যগণ চলিয়া যাওয়ার পর, এই কয় দিনে আমার হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমি ভাবিতেছি, যে জিনিষের নকলের এত আদর, সেই ধর্ম্মের আসল কি তাহা একবার দেখিব; আমি আর আপনার কন্যার পাণিগ্রহণপ্রয়াসী নহি। এখন যে নূতন ব্রত আমার হৃদয়ে জাগিয়াছে, তাহাই আমি সাধন করিব; এখন আমি স্থানান্তরে চলিলাম।"

নকলের যদি এত আদর, তবে আসল না জানি কি! এ জগতে আসল যাহা তাহাই শক্তি, তাহাই স্থায়ী। মানুষ আপনাকে না জানিয়া অনেক আশা করে; যাহা নিজের প্রাপ্য নহে, তাহাও পাইতে চায়; কিন্তু চরমে দেখি, তাহাতে খাঁটী জিনিষ যতটুকু আছে, আসলে সে যতটুকু পাইবার যোগ্য তাহাই লয়। যে মৃত্যুর পূর্ব্বে না পায়, সে পরে পায়; বিধাতার রাজ্যে আসল জিনিষের মার নাই।

শিবনাথ শাস্ত্রী

হলদীঘাটার যুদ্ধ

তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। এক দিকে অসহ্য অবমাননার প্রতিশোধ-বাঞ্ছা, অপর দিকে শিশোদিয়া-কুলের চিরস্বাধীনতা-রক্ষার স্থির-প্রতিজ্ঞা। এক দিকে মোগল ও অম্বরের অসংখ্য সুশিক্ষিত সৈন্য, অপর দিকে মেওয়ারের অতুল ও অপরিসীম বীরত্ব।

হলদীঘাটার উপত্যকায় ও উভয় পার্শ্বের পর্ব্বতের উপর দ্বাবিংশ সহস্র রাজপুত সজ্জিত রহিয়াছে, দলে দলে যোদ্ধগণ আপন আপন কুলাধিপতির চারি দিক্ বেষ্টন করিয়া অপূর্ব্ব রণ দিতেছে; কখনও-বা দূর হইতে তীর বা বর্শা নিক্ষেপ করিতেছে, কখনও-বা কুলাধিপতির ইঙ্গিতে বর্ষাকালের তরঙ্গের ন্যায় দুর্দ্দমনীয় তেজে শত্রুসৈন্যের মধ্যে পড়িয়া ছারখার করিতেছে।

পর্ব্বত-শিখরের উপর অসভ্য জাতিগণ ধনুর্ব্বাণহস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, বর্ষার বৃষ্টির ন্যায় তীর নিক্ষেপ করিতেছে, অথবা সুবিধা পাইলেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড শত্রুসৈন্যের উপর গড়াইয়া দিতেছে।

অদ্য তুমুল উৎসবের দিন, সে উৎসবে কেহ পরাঙ্মুখ হইল না: চোহান ও রাঠোর, ঝালা, চন্দায়ৎ ও গাওয়ৎ—সকল কুলের যোদ্ধগণ ভীষণনাদে শত্রুর উপর পড়িতে লাগিল। এক দল হত হয়, অন্য দল অগ্রসর হয়; অসংখ্য সৈন্যের শবরাশির উপর দিয়া অসংখ্য সৈন্য অগ্রসর হইতে লাগিল।

কিন্তু দিল্লীর অসংখ্য সৈন্যের বিরুদ্ধে এ বীরত্ব কি করিবে? দিল্লীর ভীষণ কামানশ্রেণী হইতে ঘন ঘন মৃত্যুর আদেশ বহির্গত হইতে লাগিল, দলে দলে রাজপুতগণ আসিয়া জীবনদান করিল।

এই বিঘোর উৎসবে প্রতাপসিংহ পশ্চাতে ছিলেন না। যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে অম্বরাধিপতির দিকে তিনি ধাবমান হইলেন, কিন্তু দিল্লীর অসংখ্য সেনা ভেদ করিয়া তথায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না।

তৎপরে প্রতাপসিংহ, সলীম যথায় হস্তী আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই দিকে নিজ অশ্ব ধাবমান করিলেন। এবার ভীষণনাদে রাজপুতগণ মোগলসৈন্য বিদীর্ণ করিয়া অগ্রসর হইল। স্তরে স্তরে মোগলসৈন্য সজ্জিত ছিল, কিন্তু বর্ষাকালের পর্ব্বত-তরঙ্গের ন্যায় সমস্ত প্রতিবন্ধক ভেদ করিয়া প্রতাপসিংহ ও তাঁহার সৈন্যগণ অগ্রসর হইলেন, বর্শা ও অসির আঘাতে মোগলদিগের সৈন্যরেখা লণ্ডভণ্ড করিয়া অগ্রসর হইলেন। সলীম ও প্রতাপসিংহ সম্মুখীন হইলেন।

দুই পক্ষের প্রসিদ্ধ যোদ্ধগণ নিজ নিজ প্রভুর রক্ষার্থে অগ্রসর হইলেন। অচিরে যে তুমুল হত্যাকাণ্ড, যে গগনভেদী জয়নাদ ও আর্ত্তনাদ আরম্ভ হইল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। রাজপুত ও মোগলদিগের বিভিন্নতা রহিল না, শত্রু ও মিত্রের বিভিন্নতা রহিল না। দুই পক্ষের পতাকার চারি দিকে শব রাশীকৃত হইল।

প্রতাপের অব্যর্থ খড়্গাঘাতে সলীমের রক্ষকগণ ভূতলশায়ী হইল। তখন প্রতাপ সলীমকে লক্ষ্য করিয়া দীর্ঘ বর্শা নিক্ষেপ করিলেন, হাওদার লৌহে সেই বর্শা প্রতিরুদ্ধ হওয়ায় সলীম সে দিন জীবনরক্ষা পাইলেন। রোষে তর্জ্জন করিয়া প্রতাপ অশ্ব ধাবমান

করাইলেন, অশ্ববর ‘চৈতক’-ও প্রতাপের যোগ্য,—লম্ফ দিয়া হস্তীর শরীরের উপর সম্মুখ-পদ স্থাপন করিল। প্রতাপের অব্যর্থ আঘাতে হস্তীর মাহুত হত হইল। হস্তী তখন প্রভুর বিপদ্ জানিয়াই যেন সলীমকে লইয়া পলায়ন করিল। তুমুল শব্দে দুর্দ্দমনীয় প্রতাপসিংহ ও তাঁহার সঙ্গিগণ পশ্চাদ্ধাবন করিলেন; মোগলসৈন্যের শ্রেণী বিদীর্ণ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রতাপসিংহের সে অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়া হিন্দুগণ অর্জ্জুনের কথা স্মরণ করিল, মুসলমানগণ মুহূর্ত্তের জন্য মনে মনে প্রমাদ গণিল।

তখন মুসলমানগণ নিজের বিপদ্ দেখিয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হইল। মুসলমান যোদ্ধগণ ভীরু নহে, পঞ্চশত বৎসর ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছে, অদ্য হিন্দুর নিকট অবমাননা স্বীকার করিবে না। একবার “আল্লাহু আকবর” শব্দে আকাশ ও মেদিনী কম্পিত করিয়া প্রতাপকে চারি দিকে বেষ্টন করিল। রাজপুতগণ পলায়ন জানে না, প্রভুর চারি দিকে হত হইতে লাগিল। শরীরের সপ্তস্থানে আহত হইয়াও প্রতাপ বিপদ্ জানেন না, তখনও অগ্রসর হইতেছেন।

পশ্চাৎ হইতে কয়েকজন রাজপুত যোদ্ধা মহারাণার বিপদ্ দেখিলেন এবং হুঙ্কার শব্দ করিয়া শিশোদিয়ার পতাকা লইয়া অগ্রসর হইলেন। পতাকা দেখিয়া সৈন্যগণ অগ্রসর হইল,—প্রতাপ যে স্থানে যুদ্ধ করিতেছিলেন, তথায় যাইয়া উপস্থিত হইল, সবলে প্রভুকে সেই নিশ্চয়-মৃত্যু হইতে সরাইয়া আনিল। সে উদ্যমে শত রাজপুত প্রাণদান করিল।

পুনরায় প্রতাপসিংহ যুদ্ধমদে সংজ্ঞা হারাইয়া মোগলরেখার ভিতর প্রবেশ করিলেন। পুনরায় তাঁহার রাজচ্ছত্র শত্রুবেষ্টিত

দেখিয়া, রাজপুতগণ পশ্চাৎ হইতে অগ্রসর হইয়া সমরোন্মত্ত বীরকে নিশ্চয়-মৃত্যুর কবল হইতে সবলে উদ্ধার করিয়া আনিল।

কিন্তু প্রতাপসিংহ অদ্য ক্ষিপ্ত—উন্মত্ত! জ্ঞানশূন্য হইয়া তৃতীয়বার মোগলসৈন্যরেখার ভিতর প্রবেশ করিলেন। এবার মোগলগণ ক্ষিপ্তপ্রায় হইল, রোষে হুঙ্কার করিয়া শত শত সেনা প্রতাপকে বেষ্টন করিল। প্রতাপের বহির্গমনের পথ রাখিল না। এবার মোগলগণ এই ক্ষত্রবীরকে হত করিয়া দিল্লীশ্বরের হৃদয়ের কণ্টকোদ্ধার করিবে,—মানসিংহের অবমাননার প্রতিশোধ দিবে।

পশ্চাতে রাজপুতগণ মহারাণার বিপদ্ দেখিয়া বার বার তাঁহার উদ্ধারের চেষ্টা করিল; কিন্তু মোগলসৈন্য অসংখ্য, রাজপুত-দিগের প্রধান প্রধান বীর হত হইয়াছে, রাজপুতগণ হীনবল হইয়াছে, এবার প্রভুর উদ্ধার অসম্ভব।

বার বার দলে দলে রাজপুতগণ প্রভুর উদ্ধার-চেষ্টা করিল, দলে দলে কেবল অসংখ্য শত্রু বিনাশ করিয়া আপনারা বিনষ্ট হইল, মোগলরেখা অতিক্রম করিতে পারিল না,—এবার প্রভুর উদ্ধার করিতে পারিল না।

দূর হইতে দৈলওয়ারার অধিপতি এই ব্যাপার দেখিলেন; মুহূর্ত্তের জন্য ইষ্টদেবতা স্মরণ করিলেন, পরে আপনার ঝালাবংশীয় যোদ্ধা লইয়া সম্মুখে ধাবমান হইলেন। মেওয়ারের কেতন সুবর্ণ-সূর্য্য একজন সৈনিকের হস্ত হইতে আপনি লইলেন এবং মহা-কোলাহলে সেই কেতন লইয়া ঝালাকুলের সহিত অগ্রসর হইলেন।

সে তেজ মোগলগণ প্রতিরোধ করিতে পারিল না, বীর দৈলওয়ারাপতি শত্রুরেখা বিদীর্ণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঝালাকুল,

যথায় প্রতাপ উন্মত্ত রণকুঞ্জরের ন্যায় যুদ্ধ করিতেছিলেন, তথায় উল্লাসরবে উপস্থিত হইলেন। সবলে প্রভুকে রক্ষা করিলেন, প্রতাপকে সেই শক্ররেখা হইতে উদ্ধার করিয়া আনিলেন ও সেই উদ্যমে সম্মুখরণে আপনার প্রাণদান করিলেন।

পতনশীল দেহের দিকে চাহিয়া মহানুভব প্রতাপ বলিলেন, "দৈলওয়ারা! অদ্য আপনার জীবন দিয়া আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ!" দৈলওয়ারা ক্ষীণস্বরে উত্তর করিলেন, "ঝালা স্বামিধর্ম্ম জানে, বিপৎকালে মহারাণার পার্শ্ব ত্যাগ করে না।" দৈলওয়ারাপতির জীবনশূন্য দেহ ভূতলে পড়িল।

দ্বাবিংশসহস্র রাজপুত যোদ্ধার মধ্যে চতুর্দ্দশসহস্র সে দিন ভূতলশায়ী হইল, অবশিষ্ট আট সহস্র মাত্র যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিল। প্রতাপসিংহ অগত্যা হল্‌দীঘাটার যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। মোগলগণ জয়লাভ করিল, কিন্তু সে যুদ্ধকথা সহসা বিস্মৃত হইল না। বহুবৎসর পরে দিল্লীতে, দাক্ষিণাত্যে বা বঙ্গদেশে প্রাচীন যোদ্ধগণ যুবক সেনাদিগের নিকট হল্‌দীঘাটা ও প্রতাপসিংহের বিস্ময়কর গল্প বলিয়া রজনী অতিবাহিত করিত।

রমেশচন্দ্র দত্ত

বিদ্যাসাগর

স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একখানি সুন্দর জীবন-চরিত বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এই মাননীয় পণ্ডিতের যশ শুধু বাঙ্গালার মধ্যেই আবদ্ধ নহে; উনবিংশ শতাব্দীর একজন প্রধান কর্ম্মবীর বলিয়া তিনি ভারতের সর্ব্বত্রই বিখ্যাত। স্যর সেসিল বিডনের বন্ধু ও ড্রিন্‌কৃওয়াটার বেথুনের সহযোগী এই উন্নতমনা বাঙ্গালীর মহৎ চরিত্র ও কীর্ত্তিকলাপের প্রশংসা করেন নাই, এরূপ ইংরাজ তৎকালে অতি অল্পই ছিলেন।

ভারতের ইতিহাসে বিদ্যাসাগর মহাশয় চিরকালই অতি উচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। ইংরাজ-রাজত্ব ও ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে এ দেশে নব আশা, নূতন ভাব ও নূতন উদ্যমের সৃষ্টি হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজা রামমোহন রায়ের জীবনে এবং পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কার্য্যে ইহার পরিচয়।

এই দুই কর্ম্মবীরের জীবনের কতিপয় প্রধান ঘটনা প্রায় একই সময়ে ঘটে। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায়, সমাজ- ও ধর্ম্মসংস্কার-সম্বন্ধীয় তাঁহার চূড়ান্ত কার্য্য ব্রাহ্মসমাজ বা একেশ্বরবাদী হিন্দুসমাজ স্থাপন করেন; পর বৎসর বালক ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার জীবনের কার্য্যোপযোগী বিদ্যাশিক্ষার্থ জন্মস্থান হইতে কলিকাতায় আগমন করেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন ইংলণ্ডে

প্রাণত্যাগ করেন, ইহার কয়েক বৎসর পরেই ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের অধ্যয়ন সমাপনান্তে দক্ষতার সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'বিদ্যাসাগর' এই উপাধি লাভ করেন।

বিলাত হইতে যে সকল অল্পবয়স্ক সিবিলিয়ান এ দেশে আসিতেন তাঁহাদের বাঙ্গালা, হিন্দি, উর্দ্দু প্রভৃতি এ দেশীয় ভাষাসকল শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ১৮০০ খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেস্‌লি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে একুশ বৎসর বয়সে ইহার প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। এই পদপ্রাপ্তি হইতেই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের সৌভাগ্য-গৌরব সূচিত হয়। ইতিপূর্ব্বে তিনি অতি অল্পই ইংরাজি শিখিয়াছিলেন, কিন্তু এই সময়ে প্রয়োজনবশতঃ তাঁহার উত্তমরূপে ইংরাজি ভাষা শিখিবার বাসনা বলবতী হয়। তিনি সমবয়স্ক ও একাগ্রচিত্ত রাজনারায়ণ বসুর সহিত ইংরাজি শিক্ষা করেন। এই রাজনারায়ণবাবু পরে বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের এই অংশ কতকগুলি বিশেষ গুরুতর ঘটনার জন্য চিরস্মরণীয়। তাঁহাকে এই সময়ে কতিপয় বিশিষ্ট ইংরাজ ও কয়েকজন দেশীয় কর্ম্মবীরের সংস্পর্শে আসিতে হয়। তাঁহারই সাহায্যে অল্পবয়স্ক দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতা) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেড রাইটারের পদ প্রাপ্ত হন। এই সময়েই তিনি হিন্দুসমাজের তৎকালীন নেতা রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের নিকট পরিচিত হন ও এই সময়েই অসাধারণ প্রতিভাশালী অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত তাঁহার জীবনব্যাপী বন্ধুত্বের প্রথম সূত্রপাত।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ পরিদর্শন করিতে আসিলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার অনেক কথাবার্ত্তা হয়। পরবর্ত্তী দুই বৎসরের মধ্যে যখন বঙ্গের বিভিন্ন প্রদেশে এক শত একটি 'হার্ডিঞ্জ বিদ্যালয়' স্থাপিত হইল, তখন সেই সমুদয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক-নির্ব্বাচনের ভার মার্শাল সাহেব ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর অর্পিত হইল। এই প্রভূত ক্ষমতার পরিচালনে বিদ্যাসাগর মহাশয় কখনও ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। তাঁহার উপর যে গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার অর্পিত হইয়াছিল, তিনি সর্ব্বতোভাবে তাহার সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি কিরূপ স্বার্থত্যাগ করিয়া সুযোগ্য ব্যক্তিকে উচ্চ পদলাভে সাহায্য করিতেন, তাহার একটি সুন্দর মর্ম্মস্পর্শী দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণ-অধ্যাপকের পদ শূন্য হইলে, মার্শাল সাহেবের সুপারিশে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ঐ পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হয়। ঐ পদের বেতন ৯০৲ টাকা। বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎকালে ৫০৲ টাকা মাত্র বেতন পাইতেন। তিনি কিন্তু ঐ পদ-গ্রহণে অসম্মত হন; কারণ তাঁহার বিবেচনায় প্রসিদ্ধ তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় ব্যাকরণ-শাস্ত্রের অধ্যাপনায় যোগ্যতর ব্যক্তি বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। তর্ক-বাচস্পতি মহাশয়ই ঐ পদে মনোনীত হইলেন এবং তাঁহাকে এই সংবাদ প্রদান করিবার নিমিত্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় পদব্রজে কলিকাতা হইতে কালনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ দেখিয়া তর্কবাচস্পতি মহাশয় অতিশয় বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন এবং বিস্ময়-বিহ্বলচিত্তে বলিয়াছিলেন, "ধন্য বিদ্যাসাগর! তুমি মানুষ নও, তুমি মনুষ্যাকারে দেবতা!"

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদ শূন্য হয়। তখন খ্যাতনামা বাবু রসময় দত্ত সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক ছিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অসামান্য প্রতিভা ও অসাধারণ উদ্যমের পরিচয় পাইয়াছিলেন। সহকারী সম্পাদক-পদের বেতন বৃদ্ধি করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ঐ পদে নিযুক্ত করিতে তিনি শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করেন। বেতন বৃদ্ধি করা হইল না বটে, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ পদে মনোনীত হইলেন। ঐ পদে নিযুক্ত হইয়া তিনি সংস্কৃত-শিক্ষাপ্রণালী-সংস্কারে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার সংস্কার-সম্বন্ধীয় কঠোর ব্যবস্থাসকল দেখিয়া রসময়বাবু পর্য্যন্ত ভীত হইলেন এবং তাঁহার কতিপয় প্রস্তাব অনুমোদিত না হওয়ায় বিদ্যাসাগর মহাশয় পদত্যাগ করিয়া কিছুদিনের জন্য কর্ম্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় সংস্কৃত কলেজের সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং তাঁহার প্রস্তাবিত সংস্কার-সম্বন্ধীয় একটি বিস্তৃত রিপোর্ট প্রকাশিত করেন। রসময়বাবু দেখিলেন, এক্ষণে তাঁহার পদত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর। তখন সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের পদ এক হইয়া প্রিন্সিপাল পদের সৃষ্টি হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের প্রথম প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইলেন ও তাঁহাকে ইচ্ছামত সংস্কৃত-শিক্ষা-প্রণালী-সংস্কারে ক্ষমতা প্রদত্ত হইল।

দেখিতে দেখিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যশ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তখন তাঁহার বয়স্ ত্রিশ বৎসর মাত্র। তিনি বঙ্গদেশের সম্ভ্রান্ত জমিদারগণের দ্বারা বন্ধুরূপে পরিগণিত হইলেন। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ এই নূতন সহযোগীকে পাইয়া আনন্দসহকারে

ইঁহার সংবর্দ্ধনা করিলেন। যে সকল সহৃদয় ইংরাজ ভারতের উন্নতিকল্পে ঐকান্তিক যত্ন-চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহারা একজন উপযুক্ত সাহায্যকারী পাইলেন। তিনি এ দেশে স্ত্রীশিক্ষা-প্রচলনে মন, প্রাণ সমর্পণ করেন এবং এতৎ-সম্বন্ধে মহানুভব বেথুন সাহেবকে অনেক সাহায্য করেন। বঙ্গের প্রথম ছোটলাট স্যর ফ্রেড্রিক হ্যালিডে সাহেব তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া বেথুন সাহেবের মৃত্যুর পর বেথুন স্কুল নামক বালিকা-বিদ্যালয়ের ভার তাঁহার উপর অর্পণ করেন।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে যখন এ দেশে বাঙ্গালা ও ইংরাজি বিদ্যালয় সংস্থাপিত করা গবর্নমেণ্টের অভিপ্রেত হয়, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় এ সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট লেখেন। এই রিপোর্ট-পাঠে সন্তুষ্ট হইয়া কর্ত্তৃপক্ষেরা তাঁহাকে ২০০৲ টাকা বেতনে হুগলি, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও নদীয়া জেলাসমূহের একজন বিশেষ ইনস্পেক্টাররূপে নিযুক্ত করেন। ইহা ভিন্ন তিনি সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপালের বেতন ৩০০৲ টাকাও পাইতেন। তিনি ঐ চারিটি জেলায় বালকবালিকাগণের জন্য অনেকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এ সময়ে তাঁহাকে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের ও নর্ম্ম্যাল স্কুলের কার্য্যেরও তত্ত্বাবধান করিতে হইত। তাঁহার একান্ত অনুরোধে অক্ষয়কুমার দত্ত নর্ম্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন।

এই সমস্ত কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও বিদ্যাসাগর মহাশয় সাহিত্য-চর্চ্চায় বিরত হন নাই। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বাঙ্গালা 'শকুন্তলা' প্রকাশিত হইল। ইহার তিন বৎসর পরে তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক 'সীতার বনবাস' প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমান

কালের বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্য সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য্যের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ও অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের নিকট ঋণী।

রাজা রামমোহন রায় ও তাঁহার সমসাময়িক লেখকগণের ভাষা তেজোময়ী ও ভাবপ্রকাশক হইলেও অতীব জটিল ও দুর্ব্বোধ ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয়কুমারবাবুই যে আধুনিক মনোহারী বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের সৃষ্টিকর্ত্তা, ইহা বলিলে কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত করা হয় না। যে সকল ইংরাজ লেখক রাজ্ঞী অ্যানের সময়ে ইংরাজি গদ্যকে বর্ত্তমান ছাঁচে ঢালিয়া ভাষার স্রোত ফিরাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয়কুমার স্বদেশীয় সাহিত্য-সেবা-বিষয়ে তুলনায় সমকক্ষ।

এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় একটি গুরুতর কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া পড়েন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে এই বহুশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নির্ভীকচিত্তে প্রকাশ করিলেন যে, শাস্ত্রে হিন্দু-বিধবাদিগের চির-বৈধব্য-বিধি নাই এবং বিধবা-বিবাহ শাস্ত্র-সম্মত। চতুর্দ্দিকে ভীষণ অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। বাঙ্গালার প্রত্যেক নগরে এবং প্রত্যেক গ্রামে তুমুল আন্দোলন হইতে লাগিল। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও দাশরথি রায় এই নব্য সমাজ-সংস্কারককে ব্যঙ্গ করিয়া কবিতা লিখিতে লাগিলেন। গ্রামে গ্রামে উৎসবাদি-উপলক্ষে বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক গান গীত হইতে লাগিল। শান্তিপুরের তন্তুবায়েরা স্ত্রীলোকদিগের শাড়ীর পাড়ে এই সম্বন্ধে গান বুনিতে আরম্ভ করিল। তখন ঘরে ঘরে স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই মুখে কেবল এই কথা। অতঃপর এই সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া রাজা রাধাকান্ত দেব স্বয়ং গবর্নমেণ্টের নিকট আবেদন করিলেন।

এই প্রবল ঝটিকার মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় অচল ও অটল। বিরুদ্ধ-মতসকল খণ্ডন করিয়া তিনি আর একখানি পুস্তক প্রচার করিলেন। ইহাতে তিনি যেরূপ প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও সুন্দর যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে এই আন্দোলন প্রায় একরূপ বন্ধ হইয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, তিনি প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে নিজমতাবলম্বী করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহার পর পুনর্বিবাহিত হিন্দুবিধবাগণের সন্তানসন্ততিকে আইনসম্মত উত্তরাধিকারী করিবার জন্য গবর্নমেণ্টের নিকট আবেদন করা হয় এবং ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে এই বিষয়ক আইন পাস হয়।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে যখন লর্ড ক্যানিং কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন ইহার সভ্যসংখ্যা ৩৯ জন মাত্র। তন্মধ্যে কেবল ৬ জন এ দেশীয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার মধ্যে একজন ছিলেন। কিন্তু এক্ষণে শিক্ষাবিভাগের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ শেষ হইয়া আসিল। এডুকেশন কাউন্সিলের স্থানে ডাইরেক্টার অব্ পাব্লিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌শন পদের সৃষ্টি হইল ও গর্ডন ইয়ং সাহেব প্রথম ডাইরেক্টার নিযুক্ত হইলেন। ইনি একজন নবীন ও অল্পদর্শী কর্ম্মচারী। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত-শিক্ষাপ্রণালী-সংস্কারক, বাঙ্গালা শিক্ষার জন্মদাতা, স্ত্রীশিক্ষা-প্রবর্ত্তনকারী, একাগ্রচিত্ত সংস্কারক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যসেবক, তথাপি স্বদেশের শিক্ষাবিভাগের সর্ব্বোচ্চ পদ লাভ তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিল না; কারণ তিনি এ দেশীয়। আবার যিনি তাঁহার উপরে নিযুক্ত হইলেন, সেই গর্ডন ইয়ং সাহেব তাঁহার গুণগ্রহণে সমর্থ হইলেন না, পরন্তু তাঁহার সহিত বিশেষ ভাল ব্যবহারও করিতেন না, এরূপ শুনা যায়। ইহাতে বিদ্যাসাগর

মহাশয় অতিশয় মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন এবং ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৪০ বৎসর বয়সে তিনি গবর্নমেণ্টের সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করেন। তাঁহার এত দিনের কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ তিনি কোনরূপ পেন্সন বা পুরস্কারও পাইলেন না। তাঁহার কর্ম্মত্যাগ মঞ্জুর করিয়া ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ২রা ডিসেম্বর গবর্নমেণ্ট যে পত্র লিখেন, তাহার শেষে লেখা ছিল, দেশীয় শিক্ষার জন্য তিনি যে দীর্ঘকালব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা গবর্নমেণ্ট স্বীকার করিতেছেন।

ইহা অবশ্য অতিশয় সুখের বিষয় যে, এই কর্ম্মত্যাগের পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অপর অপর কার্য্যে দানশীলতার সুবিধা হইয়াছিল এবং তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। যত দিন না বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা সাধারণে বুঝিয়াছিল, তত দিন সাহিত্যিক-হিসাবে বাঙ্গালায় তাঁহার সমকক্ষ অপর কেহই ছিল না। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যে সকল পরোপকারী এবং আর্ত্ত ও দরিদ্রদিগের দুঃখমোচনকারী মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্থান। তাঁহার পুস্তকের প্রভূত আয় আর্ত্ত ও দরিদ্রদিগের দুঃখ দূর করিতে ব্যয়িত হইত, শত শত দরিদ্র-বিধবা জীবিকার জন্য ও শত শত অনাথ বালক শিক্ষার জন্য তাঁহার নিকট ঋণী। বাঙ্গালার ঘরে ঘরে তাঁহার নাম-কীর্ত্তন হইত, কি ধনী—কি দরিদ্র সকলেই তাঁহাকে সমভাবে ভালবাসিত।

যাঁহারা বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী ছিলেন, তাঁহারাও ইঁহাকে মান্য করিতেন। বঙ্গের শ্রেষ্ঠ জমিদারগণ এই শ্রদ্ধাস্পদ, সরল, অসম-সাহসী ও অসীম-দয়াবান্ পণ্ডিতকে সম্মানিত করিয়া আনন্দিত হইতেন। তৎকালীন ছোটলাট স্যর সেসিল বিডন

এই অবসরপ্রাপ্ত, শিক্ষাকার্য্যে বিশেষ পারদর্শী পণ্ডিতের সহিত প্রায়ই পরামর্শ করিতেন এবং তাঁহার সহিত সর্ব্বদা আলাপ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইতেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত আমার মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ হইত এবং তাঁহার জীবনের শেষ কুড়ি বৎসর আমি তাঁহার সহিত পত্র-ব্যবহার করিয়াছিলাম। তাঁহার জীবনের প্রথম ভাগের কার্য্য-সংগ্রাম ও জয়-পরাজয়ের উল্লেখ করিতে তিনি তখনও উৎসাহিত হইয়া উঠিতেন। তিনি যাঁহাদিগের সহিত একযোগে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই তখনকার দিনে এক এক জন কর্ম্মবীর। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, মধুসূদন দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি অনেকেই এই তালিকাভুক্ত। ঊনবিংশ শতাব্দীর আমাদের জাতীয় কার্য্যের ইতিহাস আশার শুভ্র আলোকে সমুজ্জ্বল এবং ইহার সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের ইতিহাস সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মভাবে জড়িত।

আমি প্রায়ই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রভাতভ্রমণের সঙ্গী হইতাম এবং কখনও কখনও তাঁহার সহিত তাঁহার বাটীতে সাক্ষাৎ করিতাম; তখন আমি তাঁহার সংগৃহীত ইংরাজি ও সংস্কৃত পুস্তকরাশি দেখিবার অনুমতি পাইতাম। তাঁহার কথাবার্ত্তায় তাঁহার ঘটনাবহুল জীবনের অনেক গল্পই শুনা যাইত, এবং তাঁহার সরস রসিকতা তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহাতে বর্ত্তমান ছিল।

আমি যখন আমার কর্ম্মস্থলে পুস্তকালয় স্থাপন করিলাম, তখন তিনি প্রায়ই স্বরচিত পুস্তকাবলী আমাকে প্রেরণ করিতেন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে যখন আমি প্রতিবাদের ভীষণ ঝটিকার মধ্যে ঋগ্বেদের বাঙ্গালা অনুবাদ করিতে আরম্ভ করি, তখন মহামতি বিদ্যাসাগর মহাশয় আমায় বিশেষরূপে সাহায্য করেন।

এই সময়ে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল এবং তিনি প্রায়ই কলিকাতা ছাড়িয়া কর্ম্মাটারের বাটীতে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য গমন করিতেন। তথায় সরল গ্রামবাসিগণ দলে দলে তাঁহাকে দেখিতে আসিত এবং তিনি তাহাদের বিপদে-আপদে সর্ব্বদাই সাহায্য করিতেন; তিনি এই দরিদ্রদিগের মধ্যে ঔষধ বিতরণ করিতেন। তাঁহার দয়ায় ইহারা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। অবশেষে সকলই ফুরাইল, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ৭০ বৎসর বয়সে এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী আমাদের ছাড়িয়া অনন্তধামে চলিয়া গেলেন।

রমেশচন্দ্র দত্ত

শ্মশানে

এইখানে আসিলে সকলেই সমান হয়। পণ্ডিত, মূর্খ; ধনী, দরিদ্র; সুন্দর, কুৎসিৎ; মহৎ, ক্ষুদ্র; ব্রাহ্মণ, শূদ্র; ইংরেজ, বাঙ্গালী—এইখানে সকলেই সমান। নৈসর্গিক, অনৈসর্গিক সকল বৈষম্য এইখানে তিরোহিত হয়! শাক্যসিংহ বল, শঙ্করাচার্য্য বল, ঈশা বল, রুসো বল, রামমোহন বল; কিন্তু এমন সাম্য-সংস্থাপক এ জগতে আর নাই। এ বাজারে সব এক দর—অতি মহৎ এবং অতি ক্ষুদ্র, মহাকবি কালিদাস এবং বটতলার নাটকলেখক, একই মূল্য বহন করে। তাই বলি, এ স্থান ধর্ম্মভাবপূর্ণ—এ স্থান সদুপদেশপূর্ণ—এ স্থান পবিত্র।

এইখানে বসিয়া একবার চিন্তা করিতে পারিলে, মনুষ্য-মহত্ত্বের অসারতা বুঝিতে পারি, অহঙ্কার চূর্ণীকৃত হয়, আত্মাদর সঙ্কুচিত হয়, স্বার্থপরতার নীচতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই। আজি হউক, কালি হউক, দশ দিন পরে হউক, সকলকেই আসিয়া এই শ্মশানমৃত্তিকা হইতে হইবে। যে অনভিভবনীয় বীর্য্য, যে দুর্জ্জয় অহঙ্কার—আর পৃথিবী নাই বলিয়া রোদন করিয়াছিল, তাহা এই মৃত্তিকাসাৎ হইয়াছে,—তুমি আমি কে? যে উৎকট আত্মাভিমান ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর কাছে সাহঙ্কারে কর চাহিয়াছিল, তাহা এই মাটীতে বিলীন হইয়াছে,—তুমি আমি কে? সে দিন যে চিন্তাশক্তি ঈশ্বরকে স্বকার্য্য-সাধনে অক্ষম বলিতে সাহস করিল, তাহা

এই মাটীতে মিশিয়াছে,—তুমি আমি কে? কয় দিনের জন্য সংসার? কয় দিনের জন্য জীবন?—এই নদীহৃদয়ে জলবিম্বের ন্যায় যে বাতাসে উঠিল, সেই বাতাসেই মিলাইতে পারে। আজি যেন অহঙ্কারে মাতিয়া একজন ভ্রাতাকে চরণে দলিত করিলাম, কিন্তু কালি এমন দিন আসিতে পারে যে, আমাকে শৃগালকুক্কুরে পদাঘাত করিলেও আমি তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিব না। কেন অহঙ্কার? কিসের জন্য অহঙ্কার? এ অনন্ত বিশ্বে আমি কে—আমি কতটুকু—আমি কি? এই মাটীর পুতুলে অহঙ্কার শোভা পায় না। তাই বলিতেছিলাম, এই স্থান মনে উঠিলে সকল অহঙ্কার—বিদ্যার অহঙ্কার, প্রভুত্বের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার, সৌন্দর্য্যের অহঙ্কার, বুদ্ধির অহঙ্কার, প্রতিভার অহঙ্কার, ক্ষমতার অহঙ্কার, অহঙ্কারের অহঙ্কার—সকল অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া যায়। আর সেই দিন অপরিহার্য্য—পলাইয়া রক্ষা নাই। শুনিয়াছি, স্বর্গে বৈষম্য নাই—ঈশ্বরের চক্ষে সকলেই সমান। স্বর্গ কি, তাহা জানি না—কখনও দেখি নাই। কিন্তু শ্মশানভূমির এই উপদেশ জীবন্ত। এ স্থান স্বর্গের অপেক্ষাও বড়। এ স্থান পবিত্র।

এইখানে আসিয়া সকল জিনিষের সমাধি হয়। ভাল মন্দ, সৎ অসৎ—সব এই পথ দিয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়া যায়। এ সুখের স্থান। এইখানে শয়ন করিতে পারিলে শোকতাপ যায়, জ্বালাযন্ত্রণা ফুরায়, সকল দুঃখ দূর হয়—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক—সকল দুঃখ দূর হয়। আবার তাও বলি, এ দুঃখের স্থান। এইখানে যে আগুন জ্বলে, তাহা এ জন্মে নিবে না। তাহাতে সৌন্দর্য্য পোড়ে, প্রেম পোড়ে, সরলতা পোড়ে,

ব্রীড়া পোড়ে, যাহা পুড়িবার নয়, তাহাও পোড়ে—আর তার সঙ্গে সঙ্গে অপরের আশা, উৎসাহ, প্রফুল্লতা, সুখ, উচ্চাভিলাষ, মায়া—সব লুপ্ত হয়। তাই বলি, এ স্থান সুখেরও বটে, দুঃখেরও বটে,—যে চলিয়া যায়, তার সুখ ; যে পড়িয়া থাকে, তার দুঃখ ; এ সংসারেরই ঐ নিয়ম—সবই ভাল, সবই মন্দ। কুসুমে সৌরভ আছে, কণ্টকও আছে ; মধুতে মিষ্টতা আছে, তীব্রতাও আছে ; সূর্য্যরশ্মিতে প্রফুল্লতা আছে, রোগজনন-প্রবণতাও আছে। জগতে কোথাও নির্দ্দোষ কিছু দেখিতে পাইবে না। সকলই ভাল-মন্দ-মিশ্রিত। সুতরাং প্রকৃতি দেখিয়া যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে বোধ হয় যে, এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের যে আদি কারণ, সেও ভাল-মন্দতে মিশ্রিত ; অথবা দুইটি শক্তি হইতে এ জগৎ সমুৎপন্ন—সেই শক্তির একটি ভাল, একটি মন্দ ; একটি স্নেহ, একটি ঘৃণা ; একটি অনুরাগ, একটি বিরাগ ; একটি আকর্ষণ, অপরটি প্রতিক্ষেপ। কিন্তু কি বলিতে বলিতে কি বলিতেছি—

এই যে সংসার, ইহা এক মহাশ্মশান! চিরবহমান কালস্রোত দিনে দিনে, দণ্ডে দণ্ডে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, পলকে পলকে, সব ভাসাইয়া লইয়া গিয়া বিস্মৃতির গর্ভে ফেলিতেছে। পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে যাহা দেখিয়াছি, উপস্থিত মুহূর্ত্তে আর তাহা নাই—প্রাণ দিলেও আর ফিরিয়া আসিবে না। এইক্ষণে যাহা রহিয়াছে, পরক্ষণে আর তাহা থাকিবে না—অখিল সংসার খুঁজিয়া দেখিও, কোথাও পাইবে না। কোথায় যাইবে, কোথায় যায়,—তাহা তুমিও যতদূর জান, আমিও ততদূর জানি, এবং তুমি-আমি যাহা জানি তাহার অধিক কেহই জানে না। সবই যায়, কিছুই থাকে না—থাকে কেবল কীর্ত্তি। কীর্ত্তি অক্ষয়। কালিদাস গিয়াছেন, শকুন্তল'

আছে; সেক্সপীয়র গিয়াছেন, হ্যামলেট আছে; ওয়াসিংটন গিয়াছেন, আমেরিকার স্বাধীনতাধ্বজা আজও উড়িতেছে; রুসো গিয়াছেন, সাম্যের দুন্দুভিনাদ আজও পৃথিবী ভরিয়া ঘোষিত হইতেছে। কীর্ত্তি থাকে, অকীর্ত্তিও থাকে। লর্ড নর্থব্রুক যাইবেন, কিন্তু লক্ষ্মী রাণীর চক্ষের জল শুকাইবে না, বরদার দুঃখশ্বাস মিলাইবে না। অকীর্ত্তিও থাকে। লোকের ভাল, লোকের মন্দ, লোকের সঙ্গে চলিয়া যায়; কীর্ত্তি এবং অকীর্ত্তি জগতে বিচরণ করিতে থাকে। ওয়াসিংটনের স্বদেশানুরাগ তাঁহার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে, সেক্সপীয়রের চরিত্রদোষও তাঁহার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু তাঁহারা লোকের যে উপকার করিয়াছেন, তাহার সৌরভ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তাই বলি—

"ভাল মন্দ দুই সঙ্গে চলি যায়,—
পর উপকার সে লাভ।"

ইহাই জগতের সার তত্ত্ব—ধর্ম্মের মূল ভিত্তি—পুণ্যের স্বর্ণ-সোপান। কিন্তু কি বলিতেছিলাম?

—এই সংসার এক মহাশ্মশান। যে চিতানল ইহাতে গর্জ্জিতেছে, তাহাতে না পোড়ে এমন জিনিষ নাই। জড়প্রকৃতি কাহারও মুখ তাকায় না; যাহা সম্মুখে পড়ে, তাহাই পোড়াইয়া, সমান জ্বলিতে জ্বলিতে, সমান হাসিতে হাসিতে চলিয়া যায়। ঐ যে নক্ষত্রনিচয় অল্পান্ধকারে ঝক্ ঝক্ করিতেছে, ঐ সকল এই বিশ্বব্যাপী মহাবহ্নির স্ফুলিঙ্গমাত্র। এ সংসারে কোথায় অনল নাই? নির্ম্মল চন্দ্রিকায়, প্রফুল্ল মল্লিকায়, কোকিলের রবে, কুসুমের সৌরভে, মৃদুল পবনে, পাখীর কূজনে, রমণীর মুখে

পুরুষের বুকে—কোথায় অনল নাই? কিসে মানুষ পোড়ে না? ভালবাস, পুড়িতে হইবে; ভালবাসিও না, তদধিক পুড়িতে হইবে। পুত্রকন্যা না হইলে, শূন্য গৃহ লইয়া পুড়িতে হইবে: হইলে, সংসার-জ্বালায় পুড়িতে হইবে। শুদ্ধ মনুষ্য কেন, সমস্ত জীবই পুড়িতেছে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে পুড়িতেছে, সামাজিক নির্ব্বাচনে পুড়িতেছে, পরস্পরের অত্যাচারে পুড়িতেছে। কে পোড়ে না? এ সংসারে আসিয়া সুস্থ-মনে, অক্ষত-শরীরে কে গিয়াছে? আবার দুঃখের উপর দুঃখ এই যে, এ পাপ-সংসারে সহৃদয়তা নাই, সহানুভূতি নাই, করুণা নাই। এই অনন্ত জীবসমূহ এই মহাবহ্নিতে হাড়ে হাড়ে দগ্ধ হইতেছে;—জড়প্রকৃতি কেবল ব্যঙ্গ করে মাত্র। শশধরের সদা হাসি-হাসি মুখে কখনও কি বিষাদচিহ্ন দেখিয়াছ? নক্ষত্ররাজির সোহাগের মৃদু-কম্পনে কখনও কি হ্রাসবৃদ্ধি দেখিয়াছ? কল্লোলিনীর কল-নিনাদে কখনও কি স্বরবিকৃতি দেখিয়াছ? নবকুসুমিতা ব্রততীর দোলনীতে কখনও কি তালভঙ্গ দেখিয়াছ? আমরা পুড়িতেছি—কিন্তু ঐ দেখ, বৃক্ষরাজি করতালি দিয়া নাচিতেছে—ঐ শুন, সমীরণ হাসিতেছে—হো—হো—হো!

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

দিল্লীর অস্ত্রাগার

দিল্লীর প্রসিদ্ধ অস্ত্রাগার নগরের অন্তর্ভাগে রাজপ্রাসাদের কিয়দ্দূরে অবস্থিত ছিল। অস্ত্রাগারে সমস্ত আবশ্যক যুদ্ধোপকরণের কিছুরই অভাব ছিল না। কামান, বারুদ, গোলা, গুলি সমস্তই এই অস্ত্রাগারের যথাস্থলে যথানিয়মে সন্নিবেশিত ছিল। লেপ্টেনেণ্ট জর্জ উইলোবি নামক একজন সৈনিকপুরুষ এই অস্ত্রাগারের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইঁহার অধীনে ৮ জন ইউরোপীয় কার্য্য করিতেন। অস্ত্রাগারের অবশিষ্ট লোক ভারতবর্ষীয়। সোমবার (১১ই মে, ১৮৫৭) প্রাতঃকালে উইলোবি অস্ত্রাগারের কার্য্য পরিদর্শন করিতেছিলেন এমন সময়ে, দিল্লীর ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট স্যর টমাস মেট্‌কাফ তাঁহাকে জানান যে, মিরাট হইতে উত্তেজিত অশ্বারোহী সৈনিকদল নদী পার হইতেছে। ইহাদিগকে বাধা দিবার জন্য রেসিডেণ্ট দুইটি কামান প্রার্থনা করেন। তিনি এই কামান যমুনার নৌসেতুতে রাখিয়া আগন্তুক অশ্বারোহীদিগকে উড়াইয়া দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি জানিতে পারিলেন যে, বাধা দিবার সময় অতিক্রান্ত হইয়াছে। অশ্বারোহিগণ নদী পার হইয়া নগরে প্রবেশ করিয়াছে। ইহা অবগত হইয়াই মেট্‌কাফ সাহেব অবিলম্বে কার্য্যান্তরে গেলেন, এবং উইলোবি আপনার অস্ত্রাগার রক্ষা করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার আশঙ্কা ছিল যে, আগন্তুক সৈনিকদিগের সহিত নগরের উন্মত্ত লোক অস্ত্রাগারে প্রবেশ করিয়া বারুদ, গোলা, গুলি ইত্যাদি লুঠিয়া

লইতে পারে। মিরাট হইতে ইউরোপীয় সৈন্য না আসিলে তিনি দীর্ঘকাল এই অস্ত্রাগার রক্ষা করিতে পারিবেন না। অস্ত্রাগারের একজন দ্বারবানের উপর উইলোবির সন্দেহ হয়। এই দ্বারবানের নাম করিম্‌বক্স্‌। উইলোবির বিশ্বাস জন্মে যে, এই ব্যক্তি শত্রু-পক্ষের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদের অনিষ্টসাধনের চেষ্টা করিতেছে। এই বিশ্বাসে উইলোবি আপনার একজন ইউরোপীয় সহযোগীকে আদেশ দিয়াছিলেন যে, যদি করিম্‌বক্স অস্ত্রাগারের দ্বারের দিকে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ যেন তাহাকে গুলি করা হয়।

অস্ত্রাগারে আর যে সকল এতদ্দেশীয় লোক ছিল, তাহারাও উন্মত্ত সিপাহীদিগের পক্ষসমর্থনে ত্রুটি করে নাই। উপস্থিত সময়ে সকলেই, ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে, অলক্ষ্যভাবে একসূত্রে গ্রথিত হইয়াছিল; এক আশঙ্কা, এক চিন্তা, এক অনুভূতি ও এক ধারণা সকলকেই এক করিয়া তুলিয়াছিল। সে সময়ে অনেক ইংরেজ পূর্ব্বে ইহা বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু যখন ভয়ঙ্কর সময় উপস্থিত হইল, তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, এক সময়ে যাহারা তাঁহাদের অধীনে শান্তভাবে কার্য্য করিয়াছিল, শান্তভাবে তাঁহাদের নিকট সৌজন্য ও নম্রতার পরিচয় দিয়াছিল, তাহারা সকলেই এখন তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে, এবং সকলেই পরস্পর একতাসম্পন্ন হইয়া এক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে।

অস্ত্রাগারে যে ৯ জন ইংরেজ ছিলেন, তাঁহারা আত্মরক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন, এবং মিরাট হইতে শীঘ্র সাহায্য পাওয়া যাইবে ভাবিয়া আশ্বস্তহৃদয়ে আপনাদের কর্ত্তব্য কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। অস্ত্রাগারের দ্বার রুদ্ধ হইল। রুদ্ধ দ্বারদেশে গোলাপূর্ণ

কামান-সকল সাজাইয়া রাখা হইল। এক এক জন আগুন হাতে করিয়া এই সজ্জিত কামানের কাছে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এই কাজ শেষ হইলে যে গৃহে বারুদ ছিল, সেই গৃহ হইতে অস্ত্রাগারের প্রাঙ্গণস্থিত একটি বৃক্ষ পর্য্যন্ত মাটির নীচে বারুদ সাজাইয়া রাখা হইল। এই স্থানে অস্ত্রাগারের স্কলি নামক একজন কর্ম্মচারী দাঁড়াইয়া রহিলেন। অদূরে বক্‌লি নামক উইলোবির একজন সহকারী শেষ আদেশ জানাইবার জন্য দণ্ডায়মান থাকিলেন। যদি আর কোন উপায় না থাকে, তাহা হইলে উইলোবির আদেশে বক্‌লি সাহেব টুপি খুলিয়া ইঙ্গিত করিবামাত্র, মৃত্তিকার নিম্নস্থিত বারুদে আগুন লাগাইয়া সমস্ত অস্ত্রাগার উড়াইয়া দেওয়া হইবে, এইরূপ বন্দোবস্ত করা হইল। স্কলি উইলোবির এই শেষ-আদেশ পালনের জন্য মৃত্তিকার নিম্নস্থ সেই সজ্জিত বারুদের নিকট রহিলেন।

যখন অস্ত্রাগারের ইংরেজ রক্ষকগণ এইরূপ বন্দোবস্ত করিতে-ছিলেন, তখন বিপক্ষদিগের কয়েকজন আসিয়া দিল্লীর সম্রাটের নামে অস্ত্রাগাব তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিতে কহিল। ইংরেজ রক্ষকগণ কোন উত্তর দিলেন না, নীরবে ঐ কথার প্রত্যাখ্যান করিলেন। ইহার পর আরও অনেকে আসিয়া কহিতে লাগিল যে, সম্রাট্ অস্ত্রাগারের দ্বার খুলিয়া দিতে আদেশ দিয়াছেন, অস্ত্রাগারে যে সকল যুদ্ধোপকরণ রহিয়াছে, তৎসমুদয় তিনি সৈনিকদিগের হস্তে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। কিন্তু উইলোবি এ কথারও কোন উত্তর দিলেন না। তিনি নীরবে আত্মরক্ষার উপায় দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে বিপক্ষগণ দলবদ্ধ হইয়া অস্ত্রাগারের প্রাচীরের নিকট দাঁড়াইল এবং প্রাচীরের গায়ে

কতকগুলি মই ফেলিয়া দিল। অস্ত্রাগারের অভ্যন্তরে যে সকল এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারী ছিল, তাহারা অবিলম্বে অস্ত্রাগারের ছোট ছোট ঢালু ছাদ দিয়া প্রাচীরের উপর উঠিল, এবং অপর-পার্শ্বস্থিত মই দিয়া নীচে নামিয়া আক্রমণকারীদিগের দলে মিশিল।

ইংরেজ রক্ষকগণ এখন কালবিলম্ব না করিয়া বিপক্ষদিগের উপর গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। গোলার পর গোলা আসিয়া বিপক্ষদলে পড়িতে লাগিল। বিপক্ষেরাও এই বাধা অতিক্রম করিতে লাগিল। তাহাদের নিক্ষিপ্ত গুলিও রক্ষকদিগের ব্যূহভেদ করিতে লাগিল। ৯ জন ইংরেজের মধ্যে ২ জন আহত হইলেন। এ দিকে আক্রমণকারিগণ এরূপ প্রবলবেগে গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল যে, ইংরেজ রক্ষকগণ আর কিছুতেই সেই আক্রমণের গতি রোধ করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের শেষ-উদ্যম পর্য্যুদস্ত হইল। তাঁহারা আর অন্য উপায় না দেখিয়া আপনাদের শেষ-প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে উদ্যত হইলেন। উইলোবি অবিলম্বে ইঙ্গিত করিলেন। ইঙ্গিত করামাত্র বক্লি মাথার টুপি খুলিয়া স্কলিকে দেখাইলেন। স্কলি নির্ভীকচিত্তে সজ্জিত বারুদে আগুন দিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে ঘোরতর শব্দের সহিত অস্ত্রাগার ফুটিয়া উঠিল।

এই ভয়ঙ্কর ঘটনায় ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের ৯ জনের মধ্যে ৬ জনের প্রাণরক্ষা হইল। উইলোবি একজন সহকারীর সহিত মেন গার্ডে উপনীত হইলেন। আর কয়েকজন ভিন্ন দিক্ দিয়া পলাইয়া মিরাট প্রভৃতি নিরাপদ্ স্থানে পঁহুছিলেন। কিন্তু যিনি সজ্জিত বারুদে আগুন দিয়াছিলেন, তাঁহার প্রাণবায়ু

ঊর্দ্ধগামী ধূমস্তরের সহিত মিশিয়া গেল। স্কলি অসীমসাহসে ও অম্লানভাবে প্রজ্বলিত বারুদে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন। এইরূপ অপূর্ব্ব সাহস-সহকৃত আত্মত্যাগে বীরপুরুষের বীরত্বকীর্ত্তি অক্ষয় হইয়া রহিল!

রজনীকান্ত গুপ্ত

বুদ্ধচরিত

জাতকে লিখিত আছে যে, সিদ্ধার্থ আষাঢ় মাসে পূর্ণিমা তিথিতে পিতৃগৃহ হইতে অভিনিষ্ক্রমণ করেন। সেই রাত্রিতে তাঁহার রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া অনেক যোজন দূরে অনোমা নামক নদীর তীরে আসিয়া পৌঁছিলেন। সেখানে অশ্ব হইতে নামিয়া রাজমুকুট দূরে ফেলিয়া দিলেন, ও অঙ্গ হইতে মণিমুক্তা আভরণ-সকল খুলিয়া ছন্দকের হস্তে দিয়া কহিলেন, "ছন্দক, এই সমস্ত আভরণ নাও, আর কণ্টককে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া যাও; আমি এ স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম।" ছন্দক বিস্তর অনুনয়-বিনয় করিয়া কহিল, "প্রভু! আমাকে ফিরাইবেন না, আমিও গৃহত্যাগী হইয়া আপনার অনুগামী হইব।" কিন্তু সিদ্ধার্থ তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া, তাহাকে ফিরিয়া যাইতে পুনঃ পুনঃ আদেশ করিলেন; বলিলেন, "তোমার এখনও সন্ন্যাস-গ্রহণের সময় হয় নাই, তুমি না ফিরিলে আমি কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছি মনে করিয়া আমার পিতা ও বাড়ীর আর সকলে কি ভাবিবেন। তুমি যাও, এবং রাজবাটীর সকলকে বল আমার সমস্তই মঙ্গল। আমি বহুকাল ধরিয়া যে প্রতিজ্ঞা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছি, এক্ষণে তাহা পালন করিতে চলিলাম, আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইলেই আমি বাড়ী ফিরিব, আমার জন্য কেহ যেন চিন্তাকুল না হন।"

কুমারের আদেশক্রমে ছন্দক অগত্যা অশ্ব ও আভরণ লইয়া শোকার্তহৃদয়ে রাজভবনে ফিরিয়া গেল, এবং রাজাকে সংবাদ

দিল যে, যুবরাজ গৃহত্যাগী হইয়া সন্ন্যাসিবেশে কোথায় চলিয়া গেলেন, তাহার কোন ঠিকানা নাই।

গৌতম ছন্দককে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া আশ্রম হইতে আশ্রমান্তরে বিশ্রাম করত পরিশেষে মগধ-রাজধানী রাজগৃহে আসিয়া উপস্থিত হন। বিম্বিসার তখন ঐ প্রদেশের প্রবলপ্রতাপ নরপতি ছিলেন। সিদ্ধার্থ নগরে ভিক্ষা করিয়া নিজের আহার সংগ্রহ করিতেন। তাঁহার শরীরে অলোকসামান্য তেজঃপুঞ্জদৃষ্টে নাগরিকেরা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিল। এই নবীন সন্ন্যাসীর আগমনবার্ত্তা রাজসভা পর্য্যন্ত পৌঁছে। বিম্বিসার একদিন প্রাতঃকালে বহু পরিজন-সমভিব্যাহারে বহুমূল্য ভেট লইয়া সিদ্ধার্থের সমীপে উপস্থিত হন। তিনি তাঁহার সুবিমল দেহকান্তি-দর্শনে বিমোহিত হইলেন। এই সাধুকে গৃহস্থাশ্রমে ফিরাইয়া আপনার পার্শ্বচর করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে রাজা অশেষ প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন। সিদ্ধার্থ মধুর প্রিয় বাক্যে উত্তর করিলেন, "মহারাজ! আপনার সর্ব্বথা মঙ্গল হউক, এই সকল ভোগ্য বিষয় আপনারই থাকুক, আমি কোন কাম্যবস্তুর প্রার্থী নহি! বিষয়-বাসনা আমার চিত্ত হইতে সম্পূর্ণ রূপে তিরোহিত হইয়াছে। আমার লক্ষ্য স্বতন্ত্র।" পরে তিনি রাজার নিকট আত্মপরিচয় দিয়া বলিলেন, "কপিলবস্তুর রাজা শুদ্ধোদন আমার পিতা। বুদ্ধত্ব-লাভের আশয়ে আমি পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছি।" বিম্বিসার তখন বলিলেন, "স্বামিন্, আমি তবে বিদায় হই। আপনি যদি ভবিষ্যতে বুদ্ধত্ব লাভ করেন, আমি আপনার ধর্ম্মের আশ্রয় লইব।" এই বলিয়া বিম্বিসার তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া রাজভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। রাজার সহিত সিদ্ধার্থের এই প্রথম পরিচয়। এক্ষণে

তিনি বোধিসত্ব, বুদ্ধত্ব-লাভের পর তাঁহাদের পুনর্ম্মিলন হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার অভীষ্ট-সিদ্ধির নানা উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

রাজগৃহ ভাগীরথীর রমণীয় অধিত্যকায় অবস্থাপিত এক অপূর্ব্ব সাধনক্ষেত্র। বিন্ধ্যাচলের উত্তরস্থ পঞ্চ শৈলখণ্ডে পরিবেষ্টিত, বাহিরের উপপ্লব হইতে সুরক্ষিত, প্রকৃতির শোভা-সৌন্দর্য্যে পরিবৃত, বিজনতাসুলভ অথচ নগরীর সন্নিকর্ষবশতঃ ভিক্ষান্ন-সংগ্রহের অনুকূল ইত্যাদি কারণে, ঐ সকল গিরিগুহায় বহুসংখ্যক সন্ন্যাসী বাস করিত। তাহাদের মধ্যে আলাড় কালাম ও রুদ্রক নামক দুইজন খ্যাতনামা ব্রাহ্মণ উপাধ্যায়ের সঙ্গে গৌতমের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে। প্রথমে তিনি আলাড় কালামের নিকট গমন করেন। আলাড়ের তিন শত শিষ্য ছিল। গৌতম তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকটে দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, কিন্তু সে শিক্ষায় তিনি তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই। পরে তিনি রুদ্রকের নিকট কিছু কাল ধর্ম্মশিক্ষা করেন। তাহাও তাহার মনঃপূত হইল না। এই দুই গুরূপদিষ্ট জ্ঞানমার্গে তাঁহার অভীপ্সিত গম্যস্থানে পৌঁছিতে না পারিয়া, তিনি সিদ্ধিলাভের অন্য পন্থা অবলম্বন করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন।

পুরাকাল হইতে ভারতবর্ষে এই একটি সংস্কার বদ্ধমূল আছে যে, তপশ্চর্য্যার দ্বারা দেবতাদেরও সমকক্ষ হওয়া সম্ভব হয়, এবং দৈবশক্তি, অন্তর্দৃষ্টি-লাভ ও প্রভৃত পুণ্যসঞ্চয় করা যায়। আলাড় ও রুদ্রকের নিকটে দর্শন শিক্ষা করিয়াও গৌতম যখন সন্তোষ লাভ করিতে পারিলেন না, তখন তিনি স্থির করিলেন যে, একান্তে অবস্থানপূর্ব্বক সেই লোকবিশ্রুত পদ্ধতি অবলম্বন

করিয়া তাহার চূড়ান্ত সীমা পর্য্যন্ত গিয়া দেখিবেন তিনি কি ফল লাভ করিতে পারেন। তদনুসারে তিনি বর্ত্তমান বুদ্ধগয়ার মন্দিরের সন্নিকট উরুবেলা বনে গমন করিয়া নৈরঞ্জনা নদীতীরে পাঁচজন অনুরক্ত শিষ্যের সাহচর্য্যে ছয় বৎসর যাবৎ ঘোরতর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। "শূন্যে আলম্বিত বৃহৎ ঘণ্টাধ্বনির ন্যায়" তাঁহার এই তপস্যার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল। এই কঠোর তপশ্চরণে তাঁহার মুখবিবর ও নাসিকারন্ধ্র হইতে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিরুদ্ধ হইল। ক্রমে তাঁহার কর্ণচ্ছিদ্র রুদ্ধ হইল। তিনি তাঁহার আহার সংযত করিয়া আনিলেন, এমন কি শেষে একটিমাত্র তণ্ডুল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন, এবং এইরূপ উপবাস ও শরীর-শোষণে অস্থিচর্ম্মসার হইয়া গেলেন। অবশেষে একদিন চিন্তামগ্ন চিত্তে ধীরে ধীরে পদচারণা করিতে করিতে তিনি হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। শিষ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ মনে করিল যে, তাঁহার যথার্থই মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু ক্রমে তিনি সংজ্ঞা লাভ করিলেন। এই অবস্থায় একটি রাখাল বালক তাঁহাকে এক বাটী দুগ্ধ আনিয়া দিল, সেই দুগ্ধ পান করিয়া তিনি কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন। এই প্রকার তপশ্চর্য্যার দ্বারা কাঙ্ক্ষিত ফললাভে হতাশ হইয়া পূর্ব্ববৎ নিয়মিত আহারাদি করিতে লাগিলেন, এবং তপস্যার সংকল্প ত্যাগ করিলেন। এই সঙ্কট সময়ে, "যখন তাঁহার পক্ষে অপরের সমবেদনা বিশেষ আবশ্যক ছিল, যখন অনুরক্তজনের প্রীতি, ভক্তি ও উৎসাহ-বাক্য তাঁহার সংশয়াচ্ছন্ন চিত্তে বল দিতে পারিত, তখন তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া বারাণসী চলিয়া গেল। তপশ্চরণ পরিত্যাগ করার দরুন তিনি

তাহাদের শ্রদ্ধা হারাইলেন, এবং এই দারুণ দুঃসময়ে তিনি তাহাদের কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বিফলতার তীব্র জ্বালা একাকী সহ্য করিতে বাধ্য হইলেন।"

এই অসহায় অবস্থায় তিনি নৈরঞ্জনাতীরে একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে নিকটস্থ এক অশ্বত্থ বৃক্ষতলে গিয়া ধ্যানমগ্ন হন। ইহার অব্যবহিতপূর্ব্বে পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীবাসিনী সুজাতা নাম্নী একটি সাধ্বী রমণী এই বনে আগমন করেন। সুজাতা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—'আমার একটি শিশু-সন্তান হইলে বনদেবতার নিকট পূজা দিব।' যখন তিনি এই ঘোরতর উপোষণাদি কৃচ্ছ্রসাধনে ম্রিয়মাণ তপস্বীকে দেখিলেন, তিনি তাঁহাকে বনদেবতা ভাবিয়া তাঁহার সম্মুখে ভেট লইয়া আসিলেন। সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা কি আনিয়াছ?" সুজাতা কহিলেন, "আমি আপনার জন্য এই পরম উপাদেয় পরমান্ন আনিয়াছি। ভগবন্! সদ্যঃপ্রসূত শত গাভীদুগ্ধে আমি পঞ্চাশটি গাভী পোষণ করিয়াছি, তাহাদের দুগ্ধে পঁচিশ, তাহাদের দুগ্ধে আবার বারোটি গাভী পরিপুষ্ট। এই দ্বাদশ গাভীর দুগ্ধ পান করাইয়া আমার গরুর পালের মধ্য হইতে ছয়টি ভাল ভাল গরু বাছিয়া তাহাদের দুধ দুহিয়া লই। সেই দুগ্ধ উৎকৃষ্ট তণ্ডুলে সুগন্ধি মশলা দিয়া পাক করিয়া আনিয়াছি। আমার ব্রত এই যে, দেবতার অনুগ্রহে আমার একটি পুত্র-সন্তান জন্মিলে এই অন্ন উৎসর্গ করিয়া দেবার্চ্চনা করিব। প্রভু! এখন সেই পরমান্ন লইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি, প্রসন্ন হইয়া গ্রহণ করুন।" সিদ্ধার্থ সুজাতাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "তুমি যেমন তোমার ব্রত পালন করিয়া সুখী হইয়াছ, সেইরূপ আমিও যেন আমার জীবনব্রত

সাধন করিতে সমর্থ হই।" এই দুগ্ধপানে তিনি শরীরে বল পাইয়া পূর্ব্বোক্ত বৃক্ষতলে গিয়া যোগাসনে আসীন হইলেন। সেই রাত্রিতে ঐ বৃক্ষতলে সমাধিস্থ হইয়া তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া প্রবুদ্ধ হইলেন। সেই অবধি ঐ বৃক্ষ 'বোধিবৃক্ষ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল।

বোধিসত্ত্ব যখন নৈরঞ্জনাতীরে বোধিদ্রুমমূলে যোগাসনে আসীন হন, তখন তিনি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন—

এ আসনে দেহ মম যাক্ শুকাইয়া,
চর্ম্ম অস্থি মাংস যাক্ প্রলয়ে ডুবিয়া।
না লভিয়া বোধিজ্ঞান দুর্লভ জগতে,
টলিবে না দেহ মোর এ আসন হ'তে।

এই আসনে বসিয়া বোধিসত্ত্বের দিব্যচক্ষু প্রস্ফুটিত হইল। তিনি তত্ত্বজ্ঞানের সাক্ষাৎ দর্শন-লাভ করিলেন। তিনি বৃক্ষতলে ধ্যানযোগে জগতের যে কার্য্যকারণশৃঙ্খল প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহা এই,—

অবিদ্যা হইতে সংস্কার।
সংস্কার হইতে বিজ্ঞান (Consciousness)।
বিজ্ঞান হইতে নামরূপ।
নামরূপ হইতে ষড়ায়তন (অর্থাৎ মন ও পঞ্চেন্দ্রিয়)।
ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ।
স্পর্শ হইতে বেদনা।
বেদনা হইতে তৃষ্ণা।
তৃষ্ণা হইতে উপাদান (আসক্তি)।

উপাদান হইতে ভব।

ভব হইতে জন্ম।

জন্ম হইতে রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু, দুঃখ ও যন্ত্রণা।

অবিদ্যাই সকল দুঃখের মূল। অবিদ্যা-নাশে সংস্কার বিনষ্ট হয়; পরে নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, তৃষ্ণা, আসক্তি প্রভৃতি পর্য্যায়ক্রমে বিনষ্ট হইলে জন্মবন্ধন ছিন্ন হয়; পরিশেষে জন্ম, মৃত্যু, রোগ, শোক, সর্ব্ব দুঃখ বিদূরিত হয়। এইরূপে দুঃখের মূলকারণ ও মূলচ্ছেদ বুদ্ধদেব ধ্যানযোগে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, অবিদ্যা বা অজ্ঞানই আমাদের সকল দুঃখের কারণ, এবং অবিদ্যার অপগমেই দুঃখের সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়।

বোধিসত্ত্ব যে মুহূর্ত্তে জগতের দুঃখের উৎপত্তি ও নিরোধের এইরূপ প্রণালী নির্দ্ধারণ করিলেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তিনি 'বুদ্ধ' এই নাম ধারণ করেন।

বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াই তিনি নিম্নোদ্ধৃত উদান গান করিয়াছিলেন,—

জন্মজন্মান্তর পথে ফিরিয়াছি, পাইনে সন্ধান,
সে কোথা গোপনে আছে, এ গৃহ যে করেছে নির্ম্মাণ।
পুনঃ পুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার,
হে গৃহকারক! গৃহ না পারিবি রচিবারে আর;
ভেঙেছে তোমার স্তম্ভ, চুরমার গৃহভিত্তিচয়,
সংস্কার-বিগত চিত্ত, তৃষ্ণা আজি পাইয়াছে ক্ষয়।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শীলভদ্র

অভিধর্ম্মকোষ-ব্যাখ্যার মঙ্গলাচরণে লেখা আছে যে, গ্রন্থকার বসুবন্ধু দ্বিতীয় বুদ্ধের ন্যায় বিরাজ করিতেন। এ কথা যদি ভারতবর্ষের পক্ষে সত্য হয়, তাহা হইলে সমস্ত এশিয়ার পক্ষে য়ুয়াং চুয়াং যে দ্বিতীয় বুদ্ধের ন্যায় বিরাজ করিতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। চীনে যত বৌদ্ধ পণ্ডিত জন্মিয়াছিলেন, য়ুয়াং চুয়াং তাঁহাদের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়। তাঁহারই শিষ্য-প্রশিষ্য এক সময়ে জাপান কোরিয়া মঙ্গলিয়া ছাইয়া ফেলিয়াছিল। য়ুয়াং চুয়াং বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও যোগ শিখিবার জন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি যাহা শিখিবার জন্য আসিয়াছিলেন, তাহার চেয়ে অনেক বেশী শিখিয়া যান। যাঁহার পদতলে বসিয়া তিনি এত শাস্ত্র শিখিয়াছিলেন, তিনি একজন বাঙ্গালী। ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়। ইঁহার নাম শীলভদ্র, সমতটের এক রাজার ছেলে। য়ুয়াং চুয়াং যখন ভারতবর্ষে আসেন, তখন তিনি নালন্দা বিহারের অধ্যক্ষ, বড় বড় রাজা এমন কি সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধন পর্য্যন্ত তাঁহার নামে তটস্থ হইতেন। শীলভদ্রের পদের গৌরব অপেক্ষা বিদ্যার গৌরব অনেক বেশী ছিল। য়ুয়াং চুয়াং একজন বিচক্ষণ বহুদর্শী লোক ছিলেন। তিনি গুরুকে দেবতার মত ভক্তি করিতেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে, নানা দেশে নানা গুরুর নিকট বৌদ্ধ শাস্ত্রের গ্রন্থ-সকল অধ্যয়ন করিয়া, তাঁহার যে সকল সন্দেহ

কিছুতেই মিটে নাই, শীলভদ্রের উপদেশে সেই সকল সন্দেহ মিটিয়া গিয়াছে। কাশ্মীরের প্রধান প্রধান বৌদ্ধ পণ্ডিত তাঁহার যে সমস্ত সংশয় দূর করিতে পারেন নাই, শীলভদ্র তাহা এক এক কথায় দূর করিয়া দিয়াছিলেন। শীলভদ্র মহাযান বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধদিগের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সমস্ত গ্রন্থই তাঁহার পড়া ছিল। এ ত অনেক বৌদ্ধেরই থাকিতে পারে, বিশেষ যাঁহারা বড় বড় মহাযান বিহারের কর্ত্তা ছিলেন, তাঁহাদের থাকাই ত উচিত; কিন্তু শীলভদ্রের ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল—তিনি ব্রাহ্মণদের সমস্ত শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়াছিলেন। পাণিনি তাঁহার বেশ অভ্যাস ছিল এবং সে সময়ে উহার যে সকল টীকা-টিপ্পনী হইয়াছিল, তাহাও তিনি পড়াইতেন। ব্রাহ্মণের আদি গ্রন্থ যে বেদ, তাহাও তিনি য়ুয়াং চুয়াংকে পড়াইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার মত সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত ভারতবর্ষেও আর দেখিতে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। তাঁহার যেমন পাণ্ডিত্য ছিল, তেমনি মনের উদারতা ছিল। য়ুয়াং চুয়াংএর পাণ্ডিত্য ও উৎসাহ দেখিয়া যখন নালন্দার সমস্ত পণ্ডিতবর্গ তাঁহাকে দেশে যাইতে দিবেন না স্থির করিলেন, তখন শীলভদ্র বলিয়া উঠিলেন, "চীন একটি মহাদেশ, য়ুয়াং চুয়াং ঐখানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিবেন, ইহাতে তোমাদের বাধা দেওয়া উচিত নয়। সেখানে গেলে ইঁহার দ্বারা সদ্‌ধর্ম্মের অনেক উন্নতি হইবে, এখানে বসিয়া থাকিলে কিছুই হইবে না।" আবার যখন কুমাররাজ ভাস্কর বর্ম্মা য়ুয়াং চুয়াংকে কামরূপ যাইবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন এবং তিনি যাইতে রাজী হইলেন না, তখনও শীলভদ্র বলিলেন, "কামরূপে বৌদ্ধধর্ম্ম এখনও প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই, সেখানে গেলে যদি বৌদ্ধধর্ম্মের কিছুমাত্র

বিস্তার হয়, তাহাও পরম লাভ।" এই সমস্ত ঘটনায় শীলভদ্রের ধর্ম্মানুরাগ, দূরদর্শিতা ও নীতি-কৌশলের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁহার বাল্যকালের কথাও এখানে কিছু বলা আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তিনি সমতটের রাজার ছেলে, তিনি নাকি ব্রাহ্মণ ছিলেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার বিদ্যায় অনুরাগ ছিল এবং খ্যাতি-প্রতিপত্তিও খুব হইয়াছিল। তিনি বিদ্যার উন্নতির জন্য সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া ত্রিশ বৎসর বয়সে নালন্দায় আসিয়া উপস্থিত হন। সেখানে বোধিসত্ত্ব ধর্ম্মপাল তখন সর্ব্বময় কর্ত্তা। তিনি ধর্ম্মপালের ব্যাখ্যা শুনিয়া তাঁহার শিষ্য হইলেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই ধর্ম্মপালের সমস্ত মত আয়ত্ত করিয়া লইলেন। এই সময় দক্ষিণ হইতে একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মগধের রাজার নিকট ধর্ম্মপালের সহিত বিচার প্রার্থনা করেন। রাজা ধর্ম্মপালকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ধর্ম্মপাল যাইবার জন্য উদ্যোগ করিলেন। শীলভদ্র বলিলেন, "আপনি কেন যাইবেন?" তিনি বলিলেন, "বৌদ্ধধর্ম্মের আদিত্য অস্তমিত হইয়াছে। বিধর্ম্মীরা চারি দিকে মেঘের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। উহাদিগকে দূর করিতে না পারিলে সদ্ধর্ম্মের উন্নতি নাই।" শীলভদ্র বলিলেন, "আপনি থাকুন, আমি যাইতেছি।" শীলভদ্রকে দেখিয়া দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হাসিয়া উঠিলেন,—"এই বালক আমার সহিত বিচার করিবে?" কিন্তু শীলভদ্র অতি অল্পেই তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া দিলেন। সে শীলভদ্রের—না যুক্তি খণ্ডন করিতে পারিল, না বচনের উত্তর দিতে পারিল, লজ্জায় অধোবদন হইয়া সে সভা ত্যাগ করিয়া গেল। শীলভদ্রের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া রাজা তাঁহাকে একটি নগর দান করিলেন। শীলভদ্র বলিলেন,

"আমি যখন কাষায় গ্রহণ করিয়াছি তখন অর্থ লইয়া কি করিব?" রাজা বলিলেন, "বুদ্ধদেবের জ্ঞানজ্যোতি ত বহুদিন নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে, এখন যদি আমরা গুণের পূজা না করি, তবে ধর্ম্ম কিরূপে রক্ষা হইবে? আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন না।" তখন শীলভদ্র তাঁহার কথায় রাজি হইয়া নগরটি গ্রহণ করিলেন এবং উহার রাজস্ব হইতে একটি প্রকাণ্ড সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন।

য়ুয়াং চুয়াং এক জায়গায় বলিতেছেন যে, শীলভদ্র বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্মানুরাগ, নিষ্ঠা প্রভৃতিতে প্রাচীন বৌদ্ধগণকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি দশ-কুড়িখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তিনি যে সকল টীকা-টিপ্পনী লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা অতি পরিষ্কার, ও তাহার ভাষা অতি সরল।

য়ুয়াং চুয়াংএর গুরু শীলভদ্র বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত অতি বিরল। ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয়।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ

রে পথিক! রে পাষাণহৃদয় পথিক! কি লোভে এত ত্রস্তে দৌড়িতেছ? কি আশায় খণ্ডিত শির বর্শার অগ্রভাগে বিদ্ধ করিয়া লইয়া যাইতেছ? এ শিরে—হায়! খণ্ডিত শিরে—তোমার প্রয়োজন কি? সীমার! হোসেন তোমার কি করিয়াছিল? হোসেনের শির তোমার বর্শাগ্রে কেন? তুমিই বা সে শির লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে এত বেগে দৌড়িয়াছ কেন?

সীমার অবিশ্রান্ত যাইতেছে। দিনমণি মলিনমুখ, অস্তাচল-গমনে উদ্যোগী। নিশাও প্রায় সমাগত। সীমার যায় কোথায়? সে এক গৃহীর আশ্রয়ে উপস্থিত হইয়া ঐ স্থানে নিশা-যাপন করিবে জানাইল। বর্শাবিদ্ধ খণ্ডিত শির, অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত, বুঝি জয়সংক্রান্ত কেহ-বা মনে করিয়া গৃহস্বামী আর কোন কথা বলিলেন না, সাদরে সীমারকে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, পথশ্রান্তি দূরীকরণের উপকরণ-আদি ও আহার্য্য দ্রব্যসামগ্রী আনিয়া ভক্তিসহকারে অতিথি-সেবা করিলেন। ক্ষণকাল বিশ্রামের পর অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "মহাশয়! যদি অনুমতি করেন তবে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।"

"কি কথা?"

"কথা আর কিছু নহে, আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন? আর এই বর্শাবিদ্ধ শির কোন্ মহাপুরুষের?"

"ইহার কথা অনেক। তবে তোমাকে অতি সংক্ষেপে

বলিতেছি :—মদিনার রাজা হোসেন—যাহার পিতা আলী, এবং মহম্মদের কন্যা ফতেমা যাহার জননী—এ তাহারই শির। কার্‌বালা-প্রান্তরে মহারাজ এজিদ্‌-প্রেরিত সৈন্য-সহিত সমরে পরাস্ত হইয়া এই অবস্থা। দেহ হইতে মস্তক ভিন্ন করিয়া মহারাজের নিকটে লইয়া যাইতেছি, পুরস্কার পাইব। লক্ষ্য টাকা পুরস্কার। তুমি পৌত্তলিক, তোমার গৃহে নানা দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তি আছে দেখিয়াই আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছি। মহম্মদের শিষ্য হইলে কখনও তোমার গৃহে আসিতাম না। তোমার আদর-অভ্যর্থনাতেও ভুলিতাম না, তোমার আহার্য্যও গ্রহণ করিতাম না।"

"হাঁ, এতক্ষণে জানিলাম, আপনি কে; আর আপনার অনুমানও মিথ্যা নহে। আমি একেশ্বরবাদী নহি। নানা প্রকার দেব-দেবীই আমার উপাস্য। আপনি মহারাজ এজিদের প্রিয় সৈন্য, আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। স্বচ্ছন্দে বিশ্রাম করুন। কিন্তু বর্শাবিদ্ধ শির এ প্রকারে না রাখিয়া আমার নিকট দিলে ভাল হইত। আমি আজ রাত্রি আপন তত্ত্বাবধানে রাখিতাম। প্রাতে আপনি যথা-ইচ্ছা গমন করিতেন; কারণ যদি কোন শত্রু আপনার অনুসরণে আসিয়া থাকে, নিশীথ-সময়ে, কৌশলে কি বলপ্রয়োগে এই মহামূল্য শির আপনার নিকট হইতে কাড়িয়া লয়, কি আপনি ক্লান্তিজনিত অবশ আলস্যে ঘোর নিদ্রায় অচেতন হইলে আপনার অজ্ঞাতে এই মহামূল্য শির—আপাততঃ যাহার মূল্য লক্ষ টাকা—যদি কেহ লইয়া যায়, তবে মহাদুঃখের কারণ হইবে; আমাকে দিন, আমি সাবধানে রাখি, আপনি প্রত্যূষে লইবেন। আমার তত্ত্বাবধানে রাখিলে আপনি নিশ্চিন্ত-ভাবে নিদ্রা-সুখ অনুভব করিতে পারিবেন।"

সীমারের কর্ণে কথাগুলি বড়ই মিষ্ট বোধ হইল। সে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রস্তাব-শ্রবণমাত্রই সম্মত হইল। গৃহস্বামী হোসেন-মস্তক সম্মানের সহিত মস্তকে লইয়া বহু সমাদরে গৃহমধ্যে রাখিয়া দিলেন। পথশ্রান্তিহেতু সীমারের কেবল শয়নে বিলম্ব; যেমনি শয়ন, অমনি অচেতন।

গৃহস্বামী বাস্তবিক হজরৎ মহম্মদ মস্তাফার শিষ্য ছিলেন না। নানাপ্রকার দেব-দেবীর আরাধনাতেই সর্ব্বদা রত থাকিতেন। তাঁহার নাম আজর। তাঁহার উপযুক্ত তিন পুত্র এবং এক স্ত্রী।

সীমারের নিদ্রার ভাব জানিয়া আজর স্ত্রীপুত্রসহ হোসেনের মস্তক ঘিরিয়া বসিলেন এবং আদ্যন্ত ঘটনা বলিলেন। পিতাপুত্র সকলে একত্র হইয়া হোসেন-শোকে কাঁদিতে লাগিলেন।

জগৎ জাগিল। পূর্ব্বগগন লোহিত রেখায় পরিশোভিত হইল। সীমার শয্যা হইতে উঠিয়া প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপন করিল। সে সজ্জিত হইয়া বর্শা-হস্তে দণ্ডায়মান হইল এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "ওহে! আমি আর বিলম্ব করিতে পারিব না। আমার রক্ষিত মস্তক আনিয়া দাও। শীঘ্র যাইব।"

আজর বহির্ভাগে আসিয়া বলিবেন, "ভ্রাতঃ! তোমার নামটি কি, শুনিতে চাই। আর তুমি কোন্ ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব তাহাও জানিতে চাই। ভাই! রাগ করিও না; ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, যুদ্ধনীতি, অর্থনীতি, যুক্তি, বিধি, ব্যবস্থা, ইহাদের কিছুতেই এ কথা পাওয়া যায় না যে, শত্রুর মৃতশরীরেও শত্রুতা-সাধন করিতে হয়। বন্য পশু এবং অসভ্য জাতিরাই গত-জীবন শত্রুর শরীরে নানা প্রকার লাঞ্ছনা দিয়া মনে মনে আনন্দ অনুভব করে। ভ্রাতঃ!

তোমার রাজা সুসভ্য, তুমিও দিব্য সভ্য, এ অবস্থায় এ পশু-আচার কেন, ভাই?

"রাত্রিতে আমাকে আশ্রয় দিয়াছ, তোমার প্রদত্ত অন্নে উদর পরিপূর্ণ করিয়াছি, সুতরাং সীমারের বর্শা হইতে রক্ষা পাইলে। সাবধান! ও সকল হিতোপদেশ আর কখনও মুখে আনিও না। তোমার হিতোপদেশ তোমার মনেই থাকুক। ভাই সাহেব! বিড়াল-তপস্বী, কপট ঋষি, ভণ্ড গুরু, স্বার্থপর পীর, লোভী মৌলবী জগতে অনেক আছে,—অনেক দেখিয়াছি, আজিও দেখিলাম। ধর্ম্মাবতারের ধূর্ত্ততা, চতুরতা সীমারের বুঝিতে আর বাকি নাই; কথায় মহাবীর সীমার ভুলিবে না। আর এ মোটা কথাটা কে না বুঝিবে যে, হোসেন-মস্তক তোমার নিকট রাখিয়া যাই, আর তুমি দামেস্কে যাইয়া মহারাজের নিকট বাহাদুরী জানাইয়া লক্ষ টাকা পুরস্কার লাভ কর। যদি ভাল চাও, যদি আপন প্রাণ বাঁচাইতে চাও, তবে শীঘ্র খণ্ডিত মস্তক আনিয়া দাও।"

"দেখ ভাই! তোমার সহিত বাদবিসংবাদ, কৌশল করিতে আমার ইচ্ছামাত্র নাই। তুমি মহারাজ এজিদের সৈনিক, আমি তাঁহার অধীন প্রজা,—সাধ্য কি রাজকর্ম্মচারীর আদেশ অবহেলা করি। একটু অপেক্ষা কর, খণ্ডিত শির আনিয়া দিতেছি।"

আজর স্ত্রীপুত্রগণের নিকট যাইয়া বিষণ্ণভাবে বলিলেন, "হোসেনের মস্তক রাখিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তাহা বুঝি ঘটিল না। মস্তক না লইয়া সৈনিক-পুরুষ কিছুতেই যাইতে চাহে না। আমি তোমাদের সহায়ে সৈনিক-পুরুষের ইহকালের মত লক্ষ টাকা-প্রাপ্তির আশা এই স্থান হইতে মিটাইয়া দিতে পারিতাম।

কিন্তু আমি স্বয়ং যাচ্ঞা করিয়া হোসেনের মস্তক আপন তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছি; আর সেও বিশ্বাস করিয়া উহা আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছে; এ অবস্থায় তাহার প্রাণবধ করিলে সম্পূর্ণ বিশ্বাস-ঘাতকতার সহিত নরহত্যা-পাপ-পঙ্কিলে ডুবিতে হয়। রাজ-অনুচর, রাজ-কর্ম্মচারী, রাজাশ্রিত লোককে প্রজা হইয়া প্রাণে মারা, সেও মহাপাপ। আমার স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, নিজ মস্তক স্কন্ধোপরি রাখিয়া হোসেনের মস্তক সৈনিক-হস্তে কখনই দিব না। তোমরা ঐ খড়্গ-দ্বারা আমার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সৈনিকের হস্তে দাও, সে বর্শায় বিদ্ধ করুক। খণ্ডিত শির প্রাপ্ত হইলে তিলার্দ্ধকালও এখানে থাকিবে না বলিয়াছে। তোমরা যত্নের সহিত হোসেনের মস্তক কার্‌বালায় লইয়া, দেহ সন্ধান করিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উদ্যোগ করিবে, এই আমার শেষ উপদেশ।"

আজরের জ্যেষ্ঠপুত্র সায়াদ বলিতে লাগিলেন, "পিতঃ! আমরা ভ্রাতৃত্রয় বর্ত্তমান থাকিতে আপনার মস্তক দেহ-বিচ্ছিন্ন হইবে? আমরা কি এমনি নরাকার পশু যে, স্বহস্তে পিতৃমস্তক ছেদন করিব? খণ্ডিত মস্তক প্রাপ্ত হইলেই যদি সৈনিক-পুরুষ চলিয়া যায়, তবে আমার মস্তক লইয়া তাহার হস্তে ন্যস্ত করুন। সকল গোল মিটিয়া যাউক।"

"ধন্য সায়াদ! তুমি ধন্য! জগতে তুমিই ধন্য! পরোপকার-ব্রতে তুমিই যথার্থ দীক্ষিত। তোমার জন্ম সার্থক; আমারও জীবন সার্থক!" ইহা বলিয়াই আজর দোলায়মান খড়্গ টানিয়া লইয়া হস্ত উত্তোলন করিলেন। পিতার হস্ত-উত্তোলনের ইঙ্গিত দেখিয়া সায়াদ গ্রীবা নত করিলেন, আজরের স্ত্রী চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। কবির কল্পনা-আঁখি ধাঁধা লাগিয়া বন্ধ হইল।

সুতরাং কি ঘটিল, কি হইল, লেখনী তাহা প্রকাশ করিতে পারিল না।

এ দিকে সীমার বর্শা-হস্তে বহির্ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া মহা-চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "খণ্ডিত শির হস্তে না করিয়া যে আমার সম্মুখে আসিবে, তাহার মস্তক ধূলায় লুণ্ঠিত হইবে, অথচ হোসেনের মস্তক লইয়া যাইব।"

আজর খণ্ডিত শির হস্তে করিয়া সীমার-সম্মুখে উপস্থিত হইলে, সীমার মহাহর্ষে শির বর্শায় বিদ্ধ করিতে যাইয়া দেখিল যে, উহা সদ্যঃকর্ত্তিত, শোণিতরঞ্জিত,—রক্তধারা বহিয়া পড়িতেছে। সীমার আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, "এ কি? তুমি উন্মত্ত হইয়া এ কি করিলে? এ মস্তক লইয়া আমি কি করিব? লক্ষ টাকা-প্রাপ্তির আশায় হোসেন-মস্তক গোপন করিয়া কাহাকে বধ করিলে? তোমার মত নরপিশাচ অর্থলোভী ত আমি কখনও দেখি নাই। এই বুঝি তোমার হিতোপদেশ! এই বুঝি তোমার পরোপকারব্রত! আরে নরাধম! এই বুঝি তোর সাধুতা! কি প্রবঞ্চক! কি পাষণ্ড! ওরে নরপিশাচ! আমাকে ঠকাইতে আসিয়াছিস্?"

"ভ্রাতঃ! আমি ঠকাইতে আসি নাই; তুমিই ত বলিয়াছ যে, খণ্ডিত মস্তক পাইলে চলিয়া যাইবে। এখন এ কি কথা—এক মুখে দুই কথা কেন, ভাই?"

"আমি কি জানি যে তুমি একজন প্রধান দস্যু? টাকার লোভে কাহার কি সর্ব্বনাশ করিলে, কে জানে?"

"তুমি কি পুণ্যবলে হোসেন-মস্তক কাটিয়াছিলে, ভাই? মস্তক পাইলেই চলিয়া যাইবে কথা ছিল, এখন বিলম্ব কেন? আমার

কথা আমি রক্ষা করিলাম, এখন তোমার কথা তুমি ঠিক রাখ।”

সীমার মহাগোলযোগে পড়িল। একটু চিন্তা করিয়া বলিল, “এ শির এইখানেই রাখিয়া দাও, আমি খণ্ডিত মস্তক পাইলেই চলিয়া যাইব, পুনরায় প্রতিজ্ঞা করিলাম। আন দেখি, এ বারে হোসেন-শির না আনিয়া আর কি আনিবে? আন দেখি।”

আজরের মুখভাব দেখিয়াই মধ্যমপুত্র বলিলেন, “পিতঃ, চিন্তা কি? আমরা সকলেই শুনিয়াছি, খণ্ডিত মস্তক পাইলেই সৈনিক-প্রবর চলিয়া যাইবেন। অধম সন্তান এই দণ্ডায়মান হইল, খড়্গ হস্তে করুন, আমরা বাঁচিয়া থাকিতে মহাপুরুষ হোসেনের শির দামেস্করাজের ক্রীড়ার জন্য লইয়া যাইতে দিব না।”

আজর পুনরায় খড়্গ হস্তে লইলেন, যাহা হইবার হইয়া গেল। শির লইয়া সীমারের নিকট আসিলে, সীমার আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মনে মনে বলিল, ‘এ উন্মাদ কি করিতেছে!’ প্রকাশ্যে বলিল, “ওহে পাগল! তোমার এ পাগলামি কেন? আমি হোসেনের শির চাহিতেছি।”

“এ কি কথা? ভ্রাতঃ! তোমার একটি কথাতেও বিশ্বাসের লেশ নাই। ধিক্ তোমাকে!”

পুনরায় সীমার বলিল, “দেখ ভাই! তুমি হোসেনের শির রাখিয়া কি করিবে? এ মস্তকের পরিবর্ত্তে দুইটি প্রাণ অনর্থক বিনাশ করিলে, বল ত ইহারা তোমার কে?”

“এ দুইটি আমার সন্তান।”

“তবে ত তুমি বড় ধূর্ত্ত ডাকাত! টাকার লোভে আপনার সন্তান স্বহস্তে বিনাশ করিতেছ! ছি! ছি! তোমার ন্যায়

অর্থপিশাচ জগতে আর কে আছে? তুমি তোমার পুত্রের মস্তক ঘরে রাখিয়া দাও, শীঘ্র হোসেনের মস্তক আনয়ন কর, নতুবা তোমার নিস্তার নাই।"

"ভ্রাতঃ! আমার গৃহে একটি মস্তক ব্যতীত আর নাই, আনিয়া দিতেছি লইয়া যাও।"

"আরে হাঁ হাঁ, সেইটিই চাহিতেছি; সেই একটি মস্তক আনিয়া দিলেই আমি এখনই চলিয়া যাই।"

আজর শীঘ্র শীঘ্র যাইয়া যাহা করিলেন তাহা লেখনীতে লেখা অসাধ্য। পাঠক! বোধ হয় বুঝিয়া থাকিবেন, এ বারে কনিষ্ঠ সন্তানের শির লইয়া আজর সীমারের নিকট উপস্থিত হইলেন।

সীমার ক্রোধে অধীর হইয়া বলিতে লাগিল, "আমি এতক্ষণ অনেক সহ্য করিয়াছি। পিশাচ! আমার সঞ্চিত শির লইয়া তুই পুরস্কার লইবি? তাহা কখনও পারিবি না।"

"আমি পুরস্কার চাহি না। আমার লক্ষ লক্ষ বা লক্ষাধিক লক্ষ মূল্যের তিনটি মস্তক তোমাকে দিয়াছি ভাই! তবু তুমি এখান হইতে যাইবে না?"

"ওরে পিশাচ! টাকার লোভ কে সংবরণ করিতে পারে? হোসেনের শির তুই কি জন্য রাখিয়াছিস্? শীঘ্র হোসেনের মস্তক আনিয়া দে।"

"আমি হোসেনের মস্তক তোমাকে দিব না। এক মস্তকের পরিবর্তে তিনটি দিয়াছি আর দিব না—তুমি চলিয়া যাও।"

সীমার ক্রোধে অধীর হইয়া বলিল, "তুই মনে করিস্ না যে, হোসেন-মস্তক মহারাজ এজিদের নিকট লইয়া যাইয়া পুরস্কার লাভ করিবি। এই যা—একেবারে দামেস্কে চলিয়া যা!" সীমার

সজোরে আজরের বক্ষে বর্শাঘাত করিয়া তাহাকে ভূতলশায়ী করিল, এবং বীরদর্পে আজরের শয়নগৃহের দ্বারে যাইয়া দেখিল, স্বর্ণ-পাত্রোপরি হোসেনের মস্তক স্থাপিত রহিয়াছে,—আজরের স্ত্রী খড়্গ-হস্তে তাহা রক্ষা করিতেছেন। সীমার এক লম্ফে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া হোসেনের মস্তক পূর্ব্ববৎ বর্শাবিদ্ধ করিয়া আজরের স্ত্রীকে বলিল, "তোকে মারিব না, ভয় নাই। সীমারের হস্ত কখনই স্ত্রী-বধে উত্তোলিত হয় নাই; কোন ভয় নাই।"

আজরের স্ত্রী বলিলেন, "আমার আবার ভয় কি? যাহা হইবার হইয়া গেল। এই পবিত্র মস্তক রক্ষার জন্য আজ সর্ব্বস্ব-হারা হইলাম, আর ভয় কি? মনের আশা পূর্ণ হইল না—হোসেনের শির কার্‌বালায় লইয়া যাইয়া সৎকার করিতে পারিলাম না, ইহাই দুঃখ। তোমাকে আমার কিছুই ভয় নাই। আমাকে তুমি কি অভয় দান করিবে? আমি ত মরিয়াই আছি। তোমার অনুগ্রহ আমি কখনই চাহি না।"

"কি তুই আমার অনুগ্রহ চাহিস্ না? সীমারের অনুগ্রহ চাহিস্ না? ওরে পাপীয়সি! তুই স্বচক্ষেই ত দেখিলি, তোর স্বামীকে কি করিয়া মারিয়া ফেলিলাম! তুই স্ত্রীলোক হইয়া আমার অনুগ্রহ চাহিস্ না?"

এই বলিয়া সীমার বর্শা-হস্তে আজরের স্ত্রীর দিকে যাইতেই, আজরের স্ত্রী খড়্গ-হস্তে রোষভরে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "দেখিতেছিস্! ওরে পাপিষ্ঠ নরাধম, দেখিতেছিস্! তিনটি পুত্রের রক্তে আজ খড়্গ রঞ্জিত করিয়াছি; পর পর আঘাতে স্পষ্টতঃ তিনটি রেখা দেখা যাইতেছে। পামর! নিকটে আয়, চতুর্থ রেখা তোর দ্বারা পূর্ণ করি।"

এই কথা বলিতে বলিতে আজর-স্ত্রী সীমারের মস্তক লক্ষ্য করিয়া খড়্গাঘাত করিলেন। সীমারের হস্তস্থিত বর্শায় বাধা লাগিয়া উহা তাহার দক্ষিণ হস্তে আঘাত করিল। বর্শাবিদ্ধ হোসেন-মস্তক বর্শাচ্যুত হইয়া মৃত্তিকায় পতিত হইবামাত্র আজর-স্ত্রী উহা ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া বেগে পলাইতে লাগিলেন; কিন্তু সীমার বাম হস্তে সাধ্বী সতীর বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া তাঁহার ক্রোড় হইতে সজোরে হোসেন-শির কাড়িয়া লইল। আজরের স্ত্রী তখন একেবারে হতাশ হইয়া নিকটস্থ খড়্গ-দ্বারা আত্মবিসর্জ্জন করিলেন,—সীমারের বর্শাঘাতে তাঁহাকে মরিতে হইল না। সীমার হোসেন-শির পূর্ব্ববৎ বর্শায় বিদ্ধ করিয়া দামেস্কাভিমুখে চলিল।

মীর মশররফ হোসেন মরহুম

বঙ্গদর্শন ও বঙ্কিমচন্দ্র

কোনও সমাজে নূতন চিন্তা ও ভাবের প্রেরণায় যখন একটা নূতন জীবনের সাড়া পড়ে, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম, দর্শন, ইতিহাস, সঙ্গীত, কবিতা, নাট্যকলা প্রভৃতি সাহিত্যের সকল বিভাগেই এই নূতন জীবন আপনাকে ফুটাইয়া তুলিতে আরম্ভ করে। এ সকলের দ্বারাই সেই সমাজের নব চেতনা ও নূতন প্রাণতার প্রমাণ এবং প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। ব্যাপক অর্থে সাহিত্য বলিতে ধর্ম্মতত্ত্ব, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং আলোচনা হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রাম্য গাথা পর্য্যন্ত জাতির ভাব ও চিন্তা যে দিকেই নিজেকে ভাষার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে, তাহার সাকুল্যটা বুঝায়। বাংলার নবযুগের সাহিত্য বলিতে এইরূপ সাকুল্যটাই বুঝি। অক্ষয়কুমার দত্তের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, দ্বিজেন্দ্রনাথের তত্ত্ববিদ্যা, কালীপ্রসন্ন সিংহের "হুতোম পেঁচার নক্সা," প্যারীচাঁদের "আলালের ঘরের দুলাল," ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা, মাইকেলের মহাকাব্য ও গীতিকাব্য, —এ সকলের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গের মাঝিদিগের আধুনিক গান পর্য্যন্ত সকলই বাংলার নবযুগের নূতন সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। তবে এ সকল নূতন সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে এই নবযুগের প্রাণবস্তুর নিগূঢ় সাড়া থাকিলেও, ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্য-সৃষ্টিতে প্রাণবস্তুর প্রকাশের তারতম্য আছে। কোনও সাহিত্য-সৃষ্টিতে এই প্রাণবস্তু বেশী ফুটিয়া উঠিয়াছে, কোথাও-বা আত্মপ্রকাশের অবসর পায়

নাই। আর এই তারতম্য আছে বলিয়াই, যে সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে এই প্রাণবস্তু বিশেষভাবে ফুটিয়াছে, তাহাকে বিশিষ্ট অর্থে বাংলার নবযুগের সাহিত্য কহিতে পারা যায়। এই অর্থেই বাংলার নবযুগের সাহিত্যে বঙ্গদর্শন ও বঙ্কিমচন্দ্র একটা বিশেষ উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছেন।

বঙ্গদর্শন ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী-সমাজে এক যুগান্তর প্রবর্ত্তিত করে। বঙ্গদর্শন-প্রচারের পূর্ব্বে নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালী বাংলা বই পড়িতেন না বলিলেও চলে। অক্ষয়কুমার দত্ত এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গ্রন্থাবলী স্কুলে পড়া হইত। রঙ্গলালের কবিতাও স্কুল-পাঠ্য কবিতাবলীতে কিছু-কিছু সংগৃহীত হইয়াছিল। এ সকল স্কুল-পাঠ্য গ্রন্থ ব্যতীত শিক্ষিত বাঙ্গালীর বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষ কোনও পরিচয় ছিল না। বালকেরা স্কুল বুক সোসাইটীর প্রচারিত "চীনদেশীয় রাজকন্যার কথা" প্রভৃতি "গার্হস্থ্য গ্রন্থাবলীর" দুই-পাঁচখানা কখনও কখনও পড়িত। যাহারা গল্প পড়িতে ভালবাসিত তাহারা "গুলে বকওয়ালী," "কামিনীকুমার" প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জাতীয় উপন্যাস আগ্রহ-সহকারে গিলিত। আরব্য উপন্যাসের বাংলা অনুবাদও তখন হইয়াছে। অনেকে এখানিও আদর করিয়া পড়িতেন। মাইকেলের কবি-প্রতিভা তখন বাংলা সাহিত্যের মধ্যাহ্নগগনে যাইয়া উঠিয়াছে। "মেঘনাদ-বধ" এবং "ব্রজাঙ্গনা" সেকালের বাংলা সাহিত্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম রত্নরূপে শিক্ষিত সমাজের অতিশয় আদরের বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল। তবে সকলে মেঘনাদ-বধের গুণকীর্ত্তন করিলেও ততটা পঠনপাঠন করিতেন না, বা করিতে পারিতেন না। সেকালের সাধারণ ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীর পক্ষে

মাইকেলের অমিত্রাক্ষর পড়া সোজা ছিল না, বুঝা কঠিনই ছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও মাইকেলের প্রভাব শিক্ষিত বাঙ্গালী-সমাজকে অত্যন্ত অভিভূত করিয়াছিল। বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই "হুতোম পেঁচা" ও "আলালের ঘরের দুলাল" প্রকাশিত হয়, এবং এই দুইখানাও শিক্ষিত সমাজের আদরের বস্তু হইয়া উঠে। এ ছাড়া দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ," "নবীন তপস্বিনী," "জামাই বারিক," এবং "সধবার একাদশী"ও প্রকাশিত হইয়াছিল। দীনবন্ধুর নাটকে সেকালের সমাজচিত্র বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। শিক্ষিত সমাজের উপরে তখনকার ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব কতটা বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, দীনবন্ধুর গ্রন্থাবলীতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বঙ্গদর্শনের পূর্ব্বেকার আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে মোটের উপরে ব্রাহ্মযুগের সাহিত্য বলিতে পারা যায়। ব্যক্তিগত চরিত্রে শুদ্ধতা-সাধন এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রেরণায় সমাজসংস্কার, ইহাই আধুনিক বাংলার ব্রাহ্মযুগের প্রধান লক্ষণ ছিল। এই দুই লক্ষণই এই যুগের বাংলা সাহিত্যে বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত। এক ব্রাহ্মযুগ, আর এক বঙ্কিমযুগ। বঙ্গদর্শন এই বঙ্কিমযুগের সূচনা করে।

রাজা রামমোহনের পরে ব্রাহ্মসমাজ য়ুরোপীয় চিন্তার প্রভাবে অনেকটা বদলাইয়া যায়; সুতরাং রাজার পরবর্ত্তী ব্রাহ্মসাহিত্যও য়ুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রভাবেই বিশেষভাবে গড়িয়া উঠে। অক্ষয়কুমারের ত কথাই নাই, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্যেও বিদেশের প্রভাব অন্তঃসলিলের মত প্রবাহিত। ব্রাহ্মযুগের বাংলা সাহিত্যে, কাজেই, তেমন-একটা মৌলিকতা ফুটিয়া উঠে নাই। বর্ত্তমান

নবযুগের বাংলা সাহিত্যে এই মৌলিকতা প্রথম ফুটিতে আরম্ভ করে,—বঙ্গদর্শনে। এই জন্যই বঙ্গদর্শন আধুনিক বাংলার চিন্তা এবং ভাবে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল। বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হইলে সর্ব্বপ্রথমে ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী আগ্রহ-সহকারে বাংলা সাহিত্য পড়িতে আরম্ভ করেন। (বঙ্গদর্শন বাংলা সাহিত্যে একটা নূতন ও উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কমণ্ডলরূপে উদিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন এই জ্যোতিষ্কমণ্ডলের সূর্য্যস্বরূপ; আর তাঁহাকে ঘিরিয়া অক্ষয়চন্দ্র, তারাপ্রসাদ, হেমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ, রাজকৃষ্ণ প্রভৃতি নবীন সাহিত্যরথগণ বঙ্গদর্শনকে আশ্রয় করিয়া বাংলার বর্ত্তমান নবযুগের সাহিত্যে এক নূতন অভিব্যক্তি-ধারার সূচনা করেন।)

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসীস্ চিন্তার এবং সাধনার ইতিহাসে Encyclopædist-দের যে স্থান, আধুনিক বাংলার সাধনা এবং চিন্তার ইতিহাসে বঙ্গদর্শন কতকটা সেই স্থান অধিকার করিয়াছিল। আজিকালি বাংলার ইতিহাসের চর্চ্চা অনেকেই করিতেছেন। অনেক চিন্তাশীল পণ্ডিতে বাংলার বৈশিষ্ট্যের খোঁজ আরম্ভ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসেরও অনেক সন্ধান হইতেছে। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজেরা বাংলার এবং ভারতবর্ষের যে কল্পিত ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন, আমরা তাহাকেই সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলাম; এবং সেই ইতিহাসের আলো লইয়াই নিজেদের জাতীয় জীবনের ও জাতীয় চরিত্রের প্রত্যক্ষ পরিচয়-লাভের চেষ্টা করিতেছিলাম। বঙ্গদর্শনই সর্ব্বপ্রথমে, ইংরাজ বাংলার যে ইতিহাস গড়িয়াছেন, তাহা ছাড়া বাঙ্গালীর একটা সত্য ইতিহাস আছে, এবং সেই ইতিহাসে বাংলার চরিত্র-সাধনার যে ছবি ফুটিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালীর গৌরবের ও শ্লাঘার

বিষয় বিস্তর আছে,—এই কথাটা প্রচার করে। এইরূপে বাংলার আধুনিক স্বাদেশিকতাকে বঙ্গদর্শনই সর্ব্বপ্রথমে ঐতিহাসিক সত্যের উপরে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করে। এই কাজটা আরম্ভ করেন স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। তাঁহার অকালমৃত্যুতে বঙ্গদর্শনের একটা শ্রেষ্ঠ অঙ্গ নষ্ট হয়; এবং তিনি যে গবেষণার সূচনা করিয়াছিলেন, তাহাও নিজের সিদ্ধিপথে যথাসম্ভব অগ্রসর হইতে পারে নাই। তবে বঙ্কিমচন্দ্র নিজে যথাসাধ্য, প্রায় জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত, এই কাজটা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার ঐতিহাসিক প্রবন্ধে ইহার কতকটা প্রমাণ-পরিচয় পাওয়া যায়।

বিপিনচন্দ্র পাল.

ডিরোজিয়ো ও তৎকালীন শিক্ষা

ডিরোজিয়োর নাম এখনকার ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেরই অপরিচিত। কিন্তু এক সময়ে তিনি বঙ্গের ইংরাজী-শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের, বিশেষতঃ হিন্দু-কলেজের ছাত্রদিগের, হৃদয়ে যে কিরূপ রাজত্ব করিয়াছিলেন, এখন তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে ও দর্শনে ডিরোজিয়োর অসাধারণ অধিকার ছিল। তেইশ বৎসর মাত্র বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়; কিন্তু সেই অল্প বয়সে তিনি যে বিদ্যাবুদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অনেক প্রাচীন ব্যক্তিতেও দুর্লভ। তাঁহার অষ্টাদশবর্ষ বয়সের কবিতা অনেক প্রবীণ কবিকেও লজ্জিত করিবে। (কিন্তু কবি-শক্তির অথবা বিদ্যাবুদ্ধির জন্য ডিরোজিয়োর প্রশংসা নয়; ছাত্রদিগের মনোবৃত্তির উন্মেষ করিবার জন্য তিনি যে আন্তরিক যত্ন করিতেন, তাহারই জন্য তাঁহার প্রশংসা।) বোধ হয়, এ সম্বন্ধে, বঙ্গদেশের আর কোন বৈদেশিক শিক্ষকই তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। ছাত্রদিগকে কেবল বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিয়াই তিনি পরিতৃপ্ত থাকিতেন না; তাঁহাদিগের মধ্যে অনেককে নিজের বাটীতেও লইয়া গিয়া শিক্ষা দিতেন। পাশ্চাত্ত্য কবিগণের কাব্যের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অংশ, রোম, গ্রীস প্রভৃতি দেশের পুরাবৃত্ত হইতে তত্তদ্দেশীয় মহাপুরুষদিগের স্বদেশ-প্রেম, সত্যনিষ্ঠা এবং আত্ম-বিসর্জ্জন প্রভৃতি তিনি ছাত্রদিগকে পাঠ করিয়া শুনাইতেন। তাঁহার অধ্যাপনার ও কথোপকথনের এমনই আকর্ষণ ছিল যে, তাঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে

অনেকে কলিকাতার অতি দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও, ঝটিকা-বৃষ্টি ভেদ করিয়া, এমন কি গুরুজনদিগের নিষেধ অবহেলা করিয়া, তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইতেন। কি যেন এক ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে তিনি তাঁহার ছাত্রদিগকে মুগ্ধ করিতেন। তিনি নিজে অতি সুমধুর কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার "ফকীর অব্ জঙ্গিরা" নামক খণ্ডকাব্য এবং নানাবিষয়িণী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলি সে সময়ে অতি আদরের সহিত পঠিত হইত। কলেজে থাকিতে তিনি "হেস্পেরস" (Hesperus) এবং কলেজ পরিত্যাগ করিয়া "ইষ্ট ইণ্ডিয়ান" (East Indian) নামক একখানি পত্র সম্পাদন করিতেন। তাঁহার ছাত্রদিগকে তিনি এই সকল পত্রে লিখিবার জন্য সর্ব্বদা উৎসাহ দিতেন। তাঁহার উৎসাহদানের ফলে ও প্রদত্ত শিক্ষার গুণে তাঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকে ইংরাজী ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন, এবং পরিণামে সাহিত্যের সেবা করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "এন্‌কোয়ারার" (Enquirer) এবং রসিককৃষ্ণ মল্লিকের "জ্ঞানান্বেষণ" ডিরোজিয়োরই প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। কোন সুলেখক বলিয়াছেন, উপযুক্ত ছাত্রেই সদ্গুরুর পরিচয়; ডিরোজিয়োর ছাত্রদিগের জীবন পর্য্যালোচনা করিলেও এ কথা সপ্রমাণ হইতে পারে। তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকেই কর্ম্মশীল ও যশোভাজন হইয়াছিলেন। সুপ্রতিষ্ঠিত রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক এবং রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি অনেক প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি ডিরোজিয়োর শিষ্য। বঙ্গীয় সমাজের অনেক শুভজনক কার্য্য ইঁহাদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

ডিরোজিয়ো তাঁহার ছাত্রদিগকে কেবল ইংরাজী ভাষায় অধিকারলাভে সাহায্য করিয়া নিরস্ত থাকিতেন না; যাহাতে তাঁহারা সত্যনিষ্ঠ, স্বদেশপ্রেমিক এবং চিন্তাশীল হইয়া, স্বদেশের ও স্বজাতির কল্যাণ-সাধন করিতে পারেন, তজ্জন্যও উপযুক্ত শিক্ষা দিতেন। তিনি জাতিতে ফিরিঙ্গি ছিলেন বটে, কিন্তু সাধারণ ফিরিঙ্গি-সম্প্রদায়ের ন্যায় তিনি ভারতবাসীদিগকে পর এবং ভারতবর্ষকে তাঁহার বিদেশ বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি ভারতবর্ষকেই তাঁহার স্বদেশ এবং ভারতবাসীদিগকেই তাঁহার স্বজাতি বলিয়া বিবেচনা করিতেন। ভারতের অতীত গৌরব ও বর্ত্তমান দুরবস্থা স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইত। কবিতায়, ছাত্রদিগকে প্রদত্ত উপদেশে এবং সংবাদপত্রের স্তম্ভে—নানা প্রকারে তিনি ভারতভূমির সম্বন্ধে তাঁহার অনুরাগ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার প্রণীত "ফকীর অব্ জঙ্গিরা" নামক কাব্যের উৎসর্গপত্র পাঠ করিলে ভারতভূমির প্রতি তাঁহার যে কিরূপ আন্তরিক অনুরাগ ছিল, তাহা সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

ডিরোজিয়ো এ দেশে সাধারণতঃ শিক্ষক-নামেই পরিচিত; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি সংস্কারকের কার্য্যই করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে সময়ও তাঁহার উদ্দেশ্য-সাধনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল ছিল। রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্মমত লইয়া তখন বঙ্গদেশের গৃহে গৃহে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল এবং কলিকাতার ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানের মধ্যে যাঁহারা সমধিক প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই হয় ধর্ম্মসভা, না হয় ব্রহ্মসভা, উভয়ের একতর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। সতীদাহ-প্রথা-নিবারণ লইয়া তখন ভারতের

এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আলোড়িত হইতেছিল। ডিরোজিয়ো তাঁহার ছাত্রদিগকে এই সকল আন্দোলনে যোগদান করিতে উপদেশ দিতেন। ভারতের মঙ্গলজনক কোন অনুষ্ঠান দেখিলে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না। তাঁহার অধ্যাপনাগৃহ ছাত্রদিগের সমাজ-, নীতি- এবং ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ক্ষেত্রস্বরূপ ছিল। শিক্ষকের সহিত অসঙ্কোচে তর্কবিতর্ক করিয়া ছাত্রেরা প্রত্যেক বিষয়েরই যৌক্তিকতা অথবা অযৌক্তিকতা নির্দ্ধারণ করিতে শিক্ষা করিতেন। স্বর্গীয় রেভারেণ্ড লালবিহারী দে ডিরোজিয়োর অধ্যাপনাগৃহকে প্লেটোর "একাডেমস" (Academus) অথবা আরিষ্টটলের "লাইসিয়ম" (Lyceum)-এর ক্ষুদ্র অনুরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।✓ যাহাতে তাঁহার ছাত্র-দিগের চিন্তাশক্তির ও বিচারশক্তির উন্মেষ হইতে পারে, তজ্জন্য ডিরোজিয়ো, প্লেটোর "একাডেমি"র নামানুসারে, "একাডেমি" নামে ছাত্রদিগের এক সভা প্রতিষ্ঠিত করাইয়াছিলেন। মাণিক-তলায়, সিংহবাবুদিগের উদ্যানে, যেখানে বহুদিন ওয়ার্ড্স্ ইন্‌ষ্টিটিউশন ছিল, সেইখানে এই সভার অধিবেশন হইত। প্রতি-সপ্তাহে তাঁহার ছাত্রগণ সেখানে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতেন। এই সভার প্রতিপত্তি এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং গবর্নর জেনারেলের প্রাইভেট সেক্রেটারীর ন্যায় পদস্থ ব্যক্তিগণও তাহার কোন কোন অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতেন।

সভাস্থলেই হউক বা বিদ্যালয়েই হউক, ডিরোজিয়োর শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য এই ছিল যে, তিনি তাঁহার ছাত্রদিগকে নিরপেক্ষ

ও স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে বলিতেন। যাহা পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে, তাহাই সত্য ও সম্মানার্হ, এবং যাহা নূতন তাহা অসত্য ও অবজ্ঞেয়, এই চিরবদ্ধমূল বিশ্বাস দূর করিবার জন্ম তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। চিরপ্রচলিত সংস্কারের ও শাস্ত্রানুশাসনের পরিবর্ত্তে, যাহাতে তাঁহার ছাত্রেরা যুক্তি ও বিবেকবলে হিতাহিত নির্ণয় করিতে পারেন, তাহাই তাঁহার উপদেশের সার মর্ম্ম ছিল। হিন্দুশাস্ত্র বা খ্রীষ্টীয়শাস্ত্র, কোন দেশের কোন শাস্ত্রই, তিনি অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতেন না। শাস্ত্রানুশাসন যেখানে ব্যক্তিত্বের অথবা স্বাধীনতার ও সহজজ্ঞানের বিরোধী, সেখানে তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার জন্য তিনি ছাত্রদিগকে উপদেশ দিতেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহার স্বসমাজের ও হিন্দুসমাজের যে সকল আচার-ব্যবহার তাঁহার বিবেচনায় স্বাধীনতার ও সহজজ্ঞানের বিরোধী ছিল, তিনি তাহা নির্দ্দেশ করিতেন। ডিরোজিয়োর শিক্ষাগুণে নব্য সম্প্রদায় এক অভিনব আলোক প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারা একাডেমির অধিবেশনে এবং সংবাদপত্রের স্তম্ভে হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। ডিরোজিয়োর তত্ত্বাবধানে "পার্থিনন" (Parthenon) নামে ছাত্রদিগের একখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত; তাহাতে হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে এরূপ আপত্তিজনক বিষয়-সকল লিখিত হইতে লাগিল যে, কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ অবশেষে তাহার প্রচার-নিবারণের আজ্ঞা দিতে বাধ্য হইলেন।

ডিরোজিয়োর শিক্ষায় যেমন অনেক প্রশংসনীয় গুণ ছিল, তেমনই কতকগুলি গুরুতর দোষও ছিল। তিনি ছাত্রদিগের হৃদয়ে যে পরিমাণে স্বাধীনতাপ্রিয়তার উন্মেষ করিয়াছিলেন, সে পরিমাণে আত্মসংযমের ও ভক্তিভাবের সঞ্চার করিতে পারেন নাই।

হিন্দুসন্তানগণ পুরুষানুক্রমে শাস্ত্রশাসন-দ্বারা পরিচালিত; সহসা তাঁহাদিগের নিকট যুক্তির দ্বার উন্মুক্ত করিতে যাইয়া তিনি তাঁহাদিগকে স্বাধীন করিবার পরিবর্ত্তে স্বেচ্ছাচারী করিয়া তুলিয়াছিলেন। ডিরোজিয়োর হিন্দুশাস্ত্রে অধিকার ছিল না; সুতরাং শাস্ত্রকারদিগের গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া, তিনি তাঁহাদিগের সকল মতই ভ্রমাত্মক ও হিন্দুজাতির সকল আচারই কুসংস্কারমূলক বলিয়া মনে করিতেন। বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ হইলেও প্রৌঢ় বয়সের গাম্ভীর্য্য ও অভিজ্ঞতা তাঁহার ছিল না। যুবজনোচিত ঔদ্ধত্যের ও চপলতার সহিত তিনি অনেক বিষয়ের মীমাংসা করিতেন। শাস্ত্রকারগণ বহুশত বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, যুক্তির ও সহজজ্ঞানের প্রাধান্য স্থাপন করিতে যাইয়া তিনি একেবারে তাহাদিগের মূলোৎপাটন করিতে চাহিতেন।

এরূপ শিক্ষার ফল এই হইয়াছিল যে, ডিরোজিয়োর ছাত্রগণ ভ্রম- ও কুসংস্কার-সংশোধনের নামে ঘোরতর উচ্ছৃঙ্খলতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। স্বাধীনতা অর্থে স্বেচ্ছাচার ও সংস্কার অর্থে সমূলোৎপাটন—এই তাঁহারা বুঝিয়া লইলেন। পুরাণোক্ত তেত্রিশ কোটি দেবতার উচ্ছেদ করিতে যাইয়া তাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব-সম্বন্ধেও সন্দিহান হইলেন, এবং হিন্দুসমাজে সহমরণপ্রথার ন্যায় কুসংস্কার ছিল বলিয়া, সমাজ-প্রচলিত যে কোন প্রথাই তাঁহারা কুসংস্কারমূলক বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। সুরাপান, গোমাংস-ভক্ষণ প্রভৃতি কার্য্য তাঁহারা সমাজ-সংস্কারের পরাকাষ্ঠা বলিয়া বুঝিয়া লইলেন। এই সকল সংস্কার কার্য্যে পরিণত করিতেও তাঁহারা ত্রুটি করিতেন না। যে সকল আচার-ব্যবহার

সম্পূর্ণরূপে সমাজবিরুদ্ধ, তাহারই অনুষ্ঠান করিয়া আপনাদিগের উচ্ছৃঙ্খলতার—তাঁহাদিগের মতে নৈতিক বলের—পরিচয় দিতেন। তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত অন্যান্য স্কুল-কলেজেরও ছাত্রদিগের মধ্যে প্রচারিত হইতে লাগিল। কলিকাতার গৃহে গৃহে হুলস্থুল পড়িয়া গেল এবং অনেক মাতা-পিতা সন্তানদিগকে ইংরাজী শিক্ষা দিতে ভীত হইলেন।

ডিরোজিয়োর শিক্ষায় কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে যে বিপ্লব-তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল, অনুকূল বায়ুবলে তাহা আরও বিশালাকার ধারণ করিল। ডিরোজিয়োর শিক্ষার সমকালেই বঙ্গদেশে ইংরাজী-শিক্ষা-প্রচারের পথ পরিষ্কৃত হইয়াছিল। এ দেশে কিরূপ শিক্ষা প্রচলন করা কর্ত্তব্য, এই লইয়া সে সময়কার রাজপুরুষদিগের মধ্যে কিছুদিন হইতে আন্দোলন চলিতেছিল। এক দল বলিতেছিলেন, ইংরাজী ভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ও পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের প্রচার করা এ দেশে গবর্নমেণ্টের কর্ত্তব্য; অপর দল বলিতেছিলেন, দেশীয় ভাষাসমূহের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন ও এ দেশীয়দিগকে তাঁহাদিগের জাতীয় সাহিত্যে সুশিক্ষিত করাই গবর্নমেণ্টের পক্ষে সঙ্গত। উভয় দলেই বহুসংখ্যক বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বর্ত্তমান ছিলেন। খ্যাতনামা আলেকজাণ্ডার ডফ ও প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ হোরেস হেমান উইলসন, যথাক্রমে পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্যভাষা-প্রচারার্থীদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এ দেশীয়দিগের মধ্যে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় পাশ্চাত্ত্য এবং সুপ্রতিষ্ঠ বাবু রামকমল সেন প্রাচ্যভাষা-প্রচারের পক্ষপাতী ছিলেন। উভয় পক্ষই দীর্ঘকাল ধরিয়া তর্ক ও যুক্তির দ্বারা আপন আপন পক্ষ-সমর্থনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিবাদের শেষাবস্থায় সুপ্রসিদ্ধ

লর্ড মেকলে পাশ্চাত্যভাষা-প্রচারার্থীদিগের পক্ষ অবলম্বন করাতে তাঁহারই অবলম্বিত পক্ষ জয়লাভ করিল। মহাত্মা লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই মার্চ্চ দিবসের প্রসিদ্ধ অবধারণ-দ্বারা স্থির করিলেন যে, ইংরাজী ভাষার সাহায্যে ভারতবাসীদিগের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান-প্রচারই গবর্নমেণ্টের প্রধান কর্ত্তব্য এবং শিক্ষা-সম্বন্ধীয় অধিকাংশ অর্থই সেই উদ্দেশ্যসাধনে ব্যয় করা হইবে।

মহাত্মা বেণ্টিঙ্কের এই অবধারণ ভারত-সমাজে কি যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে তাহা বর্ণনা করা অনাবশ্যক। মুসলমান রাজগণ ছয়-সাত শত বৎসরেও যে পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই, বিন্দুমাত্র বলপ্রকাশ-ব্যতিরেকে এক ইংরাজী ভাষার প্রচার হইতে লোকের মানসিক ভাব- ও প্রবণতা-সম্বন্ধে তাহার অপেক্ষা শতগুণ অধিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ডিরোজিয়োর শিক্ষা নব্য-শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের সাংসারিক আচার-ব্যবহারে পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিল; গবর্নমেণ্টের অবধারণ তাঁহাদিগের চিন্তা ও মানসিক ভাব-সম্বন্ধে যুগান্তর উপস্থিত করিল। একেই ত দেশীয় শাস্ত্র ও গ্রন্থানুশীলনে নব্য-শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের বিতৃষ্ণা ছিল, তাহার উপর গবর্নমেণ্টের এই অবধারণ প্রকাশিত হইবার পর সংস্কৃত গ্রন্থ স্পর্শ করিতেও আর তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি রহিল না। গবর্নমেণ্টের শিক্ষা-সম্বন্ধীয় অবধারণ প্রকাশিত হইবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, সতীদাহ-নিবারণ লইয়া ঘোরতর আন্দোলন উঠিয়াছিল। যাঁহারা সতীদাহ-নিবারণের পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের যুক্তি-খণ্ডনের নিমিত্ত হিন্দুশাস্ত্রে যে সমস্ত ভ্রম-প্রমাদ আছে, তাহাদিগের উল্লেখ করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহাদিগের ন্যায়

পাশ্চাত্ত্যভাষা-প্রচারার্থিগণও সংস্কৃত গ্রন্থসমূহে যে সকল অলৌকিক ও অতিরঞ্জিত ঘটনার উল্লেখ আছে, প্রতিবাদীদিগকে নিরস্ত ও অপদস্থ করিবার জন্য সেই সকলের কঠোর সমালোচনা করিতেও বিরত হইলেন না। সে সময়কার ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আদর্শ পুরুষ ইংরাজ; এবং সেই ইংরাজের ইংরাজ মেকলে সাহেব যখন বলিলেন যে, সংস্কৃত সাহিত্য অতি অসার, তখন তাহাতে যে কিছু অনুকরণীয় বা জ্ঞাতব্য থাকিতে পারে তাহা চিন্তা করিবারও তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি রহিল না। লর্ড মেকলে তাঁহার অভ্যাসানুরূপ অতিরঞ্জন-বহুল ভাষায় বলিলেন, "A single shelf of a good European library is worth the whole native literature of India and Arabia." অর্থাৎ, কোন য়ুরোপীয় উৎকৃষ্ট পুস্তকালয়ের একটিমাত্র আলমারিও সমগ্র আরব্য ও সংস্কৃত সাহিত্যের সমতুল্য। কেবল ইহাই নয়; তিনি অসঙ্কুচিতচিত্তে বলিলেন যে, অন্য ভাষার কথা দূরে থাকুক, সংস্কৃত সাহিত্য স্যাক্সন ও নর্ম্মান সাহিত্যেরও সমতুল্য কি না, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে—"I doubt whether the Sanskrit literature be as valuable as that of our Saxon and Norman progenitors."

লর্ড মেকলের এরূপ মন্তব্যের উপর কোন কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। সংস্কৃত ভাষায় যাঁহার বিন্দুমাত্রও অধিকার ছিল না এবং যিনি সংস্কৃত ভাষার আলোচনা পণ্ডশ্রমমাত্র জ্ঞান করিতেন, তাঁহার পক্ষে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা যে কতদূর ধৃষ্টতার কার্য্য হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান কবি ফর্দ্দুসী গজনী রাজসভা-সম্বন্ধে বিদ্রূপ

করিয়া বলিয়াছিলেন, "গজ্‌নী রাজসভা মহাসমুদ্রের তুল্য, কিন্তু কেহ কখন তাহা হইতে মুক্তা প্রাপ্ত হয় না।" আলেকজাণ্ডার ডফ ফর্দ্দুসীর সেই কবিতার অনুকরণ করিয়া বলিলেন, "প্রাচ্য-ভাষাসমূহও সমুদ্রের ন্যায় মহান্‌, অতল এবং অকূল কিন্তু বহুদিন অন্বেষণ করিয়াও আমি কখন ইহাতে মুক্তা দেখিতে পাইলাম না।" ডফের ও মেকলের এই সকল কথা নূতন ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট বড়ই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইল। তাঁহারা সত্য সত্যই মনে করিলেন, সংস্কৃত সাহিত্যে শিক্ষণীয় কিছুই নাই; ইহা কেবলই কুশ-তৃণের গুণাগুণে এবং ঘৃত, দুগ্ধ ও দধি-সমুদ্রের বর্ণনাতেই পরিপূর্ণ। এই বিশ্বাস-অনুসারে তাঁহারা রামায়ণ-মহাভারতের ন্যায় মহাকাব্যে এবং অভিজ্ঞান-শকুন্তলের ন্যায় নাটকে মুক্তা না পাইয়া, ইলিয়াডে, ইনিয়াডে এবং ফিল্ডিং-এর উপন্যাসে মুক্তা-অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ অতি কৃপাপাত্র, এবং সংস্কৃত সাহিত্যের অনুশীলন নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক, এই তাঁহাদিগের প্রতীতি জন্মিল। স্বদেশীয় কাব্য, পুরাণাদিতে অভিজ্ঞতা-লাভের চেষ্টা করা দূরে থাকুক, সে সম্বন্ধে কোনরূপ জ্ঞান না থাকাই যেন তাঁহাদিগের পক্ষে গৌরবকর বোধ হইল। তাঁহারা আকিলিসের অথবা আগামেম্‌ননের ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষের নাম বলিতে পারিতেন, কিন্তু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরের পিতৃব্য কি প্রপৌত্র জিজ্ঞাসা করিলে নির্ব্বাক্‌ হইয়া থাকিতেন! সেক্সপিয়র বা মিল্টনের গ্রন্থের কোন্‌ স্থলে কি আছে, তাহা তাঁহাদিগের জিহ্বাগ্রে বিরাজ করিত, কিন্তু বনপর্ব্বে রামচন্দ্রের বনবাস কি যুধিষ্ঠিরের নির্ব্বাসন লিখিত আছে, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বিপদ্‌ বোধ করিতেন।

বেদব্যাসের ও বাল্মীকির ভাষারই যখন এই দুর্দ্দশা ঘটিল, তখন দুঃখিনী বাঙ্গালা ভাষার অবস্থা আর কি লিখিব? হিন্দু-কলেজের অনেক খ্যাতনামা ছাত্র বাঙ্গালায় বিশুদ্ধরূপে আপন আপন নামও লিখিতে পারিতেন না। বাঙ্গালা ভাষা বলিয়া যে একটা স্বতন্ত্র ভাষার অস্তিত্ব আছে বা থাকিতে পারে, তাহা তাঁহাদিগের মনে উদিত হইত না। দোকানদারদিগের ও অশিক্ষিত বৃদ্ধদিগের পাঠের জন্য রামায়ণ-মহাভারত নামে দুইখানি পদ্যগ্রন্থ আছে, এই মাত্র তাঁহারা জানিতেন। গুপ্ত কবির "প্রভাকর" তখন বঙ্গসমাজের এক অংশে জ্যোতি দান করিতেছিল বটে, কিন্তু নব্য-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট তাহার বড় সমাদর ছিল না। নব্যদিগের মধ্যে যাঁহারা অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত, তাঁহারাই তাহার সমাদর করিতেন। বাঙ্গালা গ্রন্থসমূহ নব্যদিগের পাঠাগার হইতে নির্ব্বাসিত হইল; বাঙ্গালা ভাষায় কথাবার্ত্তা কহা এবং বাঙ্গালায় পরস্পরকে পত্রলেখা অগৌরবকর বলিয়া তাঁহাদিগের ধারণা জন্মিল। আমরা যাহাকে বিপ্লবকাল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি, তাহা এইরূপে পূর্ণ হইল। ডিরোজিয়োর শিক্ষার ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের নব্য-শিক্ষিত সম্প্রদায় স্বদেশীয় আচার ও স্বদেশীয় সাহিত্য উভয়ই সমভাবে নির্ব্বাসিত করিতে প্রস্তুত হইলেন।

যোগীন্দ্রনাথ বসু

বিশ্ববিদ্যালয়

মধ্য এসিয়ার মরুভূমিতে যে সব পর্য্যাটক প্রাচীন যুগের চিহ্ন সন্ধান করেচেন তাঁরা দেখেচেন সেখানে কত সমৃদ্ধ জনপদ আজ বালি চাপা পড়ে হারিয়ে গেছে। এককালে সে সব জায়গায় জলের সঞ্চয় ছিল, নদীর রেখাও পাওয়া যায়। কখন রস এল শুকিয়ে, এক পা এক পা করে এগিয়ে এল মরু, শুষ্ক রসনা মেলে লেহন করে নিল প্রাণ, লোকালয়ের শেষ স্বাক্ষর মিলিয়ে গেল অসীম পাণ্ডুরতার মধ্যে। বিপুল-সংখ্যক গ্রাম নিয়ে আমাদের যে-দেশ, সেই দেশের মনোভূমিতেও রসের জোগান আজ অবসিত। যে-রস অনেক কাল থেকে নিম্নস্তরে ব্যাপ্ত হয়ে আছে তাও দিনে দিনে শুষ্ক বাতাসের উষ্ণ নিঃশ্বাসে উবে যাবে, অবশেষে প্রাণনাশা মরু অগ্রসর হয়ে তৃষ্ণার অজগর সাপের মতো পাকে পাকে গ্রাস করতে থাকবে আমাদের এই গ্রামে-গাঁথা দেশকে। এই মরুর আক্রমণটা আমাদের চোখে পড়চে না, কেন-না বিশেষ শিক্ষার গতিকেই দেশ-দেখা চোখ আমরা হারিয়েছি, গবাক্ষলণ্ঠনের আলোর মতো আমাদের সমস্ত দৃষ্টির লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত শিক্ষিত সমাজের দিকে।

আমি একদিন দীর্ঘকাল ছিলুম বাংলাদেশের গ্রামের নিকট-সংস্রবে। গরমের সময়ে একটা দুঃখের দৃশ্য পড়ত চোখে। নদীর জল গিয়েচে নেমে, তীরের মাটি গিয়েচে ফেটে, বেরিয়ে পড়েচে পাড়ার পুকুরের পঙ্কস্তর, ধূ ধূ করচে তপ্ত বালু। মেয়েরা

বহু দূর পথ থেকে ঘড়ায় করে নদীর জল বয়ে আনচে, সেই জল বাংলাদেশের অশ্রুজলমিশ্রিত। গ্রামে আগুন লাগলে নিবোবার উপায় পাওয়া যায় না, ওলাউঠো দেখা দিলে নিবারণ করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

এই গেল এক, আর এক দুঃখের বেদনা আমার মনে বেজেছিল। সন্ধ্যে হয়ে এসেচে, সমস্ত দিনের কাজ শেষ করে চাষীরা ফিরেচে ঘরে। একদিকে বিস্তৃত মাঠের উপর নিস্তব্ধ অন্ধকার, আর একদিকে বাঁশঝাড়ের মধ্যে এক একটি গ্রাম যেন রাত্রির বন্যার মধ্যে জেগে আছে ঘনতর অন্ধকারের দ্বীপের মতো। সেই দিক্ থেকে শোনা যায় খোলের শব্দ, আর তারি সঙ্গে একটানা সুরে কীর্ত্তনের কোনো একটা পদের হাজারবার তারস্বরে আবৃত্তি। শুনে মনে হোত এখানেও চিত্ত-জলাশয়ের জল তলায় এসে পড়েচে। তাপ বাড়চে, কিন্তু ঠাণ্ডা করবার উপায় কতটুকুই বা। বছরের পর বছর যে অবস্থাদৈন্যের মধ্যে দিন কাটে তাতে কী করে প্রাণ বাঁচবে যদি মাঝে মাঝে এটা অনুভব না করা যায় যে হাড়ভাঙা মজুরীর উপরেও মন ব'লে মানুষের একটা কিছু আছে যেখানে তার অপমানের উপশম, দুর্ভাগ্যের দাসত্ব এড়িয়ে যেখানে হাঁফ ছাড়বার জায়গা পাওয়া যায়। তাকে সেই তৃপ্তি দেবার জন্যে একদিন সমস্ত সমাজ প্রভূত আয়োজন করেছিল। তার কারণ, সমাজ এই বিপুল জনসাধারণকে স্বীকার করে নিয়েছিল আপন লোক ব'লে। জান্‌ত, এরা নেমে গেলে সমস্ত দেশ যায় নেমে। আজ মনের উপবাস ঘোচাবার জন্যে কেউ তাদের কিছুমাত্র সাহায্য করে না। তাদের আত্মীয় নেই, তারা নিজে নিজেই আগেকার দিনের তলানি নিয়ে কোনোমতে

একটু সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করে। আর কিছু দিন পরে এটুকুও যাবে শেষ হয়ে; সমস্ত দিনের দুঃখধন্দার রিক্ত প্রান্তে নিরানন্দ ঘরে আলো জ্বলবে না, সেখানে গান উঠবে না আকাশে। ঝিল্লী ডাকবে বাঁশবনে, ঝোপঝাড়ের মধ্য থেকে শেয়ালের ডাক উঠবে প্রহরে প্রহরে, আর সেই সময়ে সহরে শিক্ষাভিমানীর দল বৈদ্যুত আলোয় সিনেমা দেখতে ভিড় করবে।

এক দিকে আমাদের দেশে সনাতন শিক্ষার ব্যাপ্তি রুদ্ধ হয়ে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের অনাবৃষ্টি চিরকালীন হয়ে দাঁড়াল, অন্য দিকে আধুনিক কালের নতুন বিদ্যার যে আবির্ভাব হোলো তারো প্রবাহ বইল না সর্ব্বজনীন দেশের অভিমুখে। পাথরে গাঁথা কুণ্ডের মতো স্থানে স্থানে সে আবদ্ধ হয়ে রইল, তীর্থের পাণ্ডাকে দর্শনী দিয়ে দূর থেকে এসে গণ্ডূষ ভর্ত্তি করতে হয়, নানা নিয়মে তার আটঘাট বাঁধা। মন্দাকিনী থাকেন শিবের ঘোরালো জটাজূটের মধ্যে বিশেষ ভাবে, তবুও দেব-ললাট থেকে তিনি তাঁর ধারা নামিয়ে দেন, বহে যান সাধারণভাবে ঘাটে ঘাটে মর্ত্ত্যজনের দ্বারের সম্মুখ দিয়ে, ঘটে ঘটে ভরে দেন আপন প্রসাদ। কিন্তু আমাদের দেশে প্রবাসিনী আধুনিকী বিদ্যা তেমন নয়। তার আছে বিশিষ্ট রূপ, সাধারণ রূপ নেই। সেই জন্যে ইংরেজি শিখে যাঁরা বিশিষ্টতা পেয়েচেন তাঁদের মনের মিল হয় না সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে। দেশে সকলের চেয়ে বড়ো জাতিভেদ এইখানেই, শ্রেণীতে শ্রেণীতে অস্পৃশ্যতা।

ইংরেজি ভাষায় অবগুণ্ঠিত বিদ্যা স্বভাবতই আমাদের মনের সহবর্ত্তিনী হয়ে চলতে পারে না। সেই জন্যেই আমরা অনেকেই যে পরিমাণে শিক্ষা পাই সে পরিমাণে বিদ্যা পাইনে। চারি দিকের

আবহাওয়ার থেকে এ বিদ্যা বিচ্ছিন্ন, আমাদের ঘর আর ইস্কুলের মধ্যে ট্রাম চলে, মন চলে না। ইস্কুলের বাইরে পড়ে আছে আমাদের দেশ, সেই দেশে ইস্কুলের প্রতিবাদ রয়েচে বিস্তর, সহযোগিতা নেই বললেই হয়। সেই বিচ্ছেদে আমাদের ভাষা ও চিন্তা অধিকাংশ স্থলেই ইস্কুলের ছেলের মতোই। ঘুচল না আমাদের নোট বইয়ের শাসন, আমাদের বিচার-বুদ্ধিতে নেই সাহস, আছে নজির মিলিয়ে অতি সাবধানে পা ফেলে চলা। শিক্ষার সঙ্গে দেশের মনের সহজ মিলন ঘটাবার আয়োজন আজ পর্য্যন্ত হোলো না। যেন কনে রইল বাপের বাড়ির অন্তঃপুরে, শ্বশুরবাড়ি নদীর ওপারে বালির চর পেরিয়ে। খেয়া নৌকাটা গেল কোথায়?

পারাপারের একখানা ডোঙা দেখিয়ে দেওয়া হয়, তাকে বলে সাহিত্য। এ কথা মানতেই হবে আধুনিক বঙ্গসাহিত্য বর্ত্তমান যুগের অন্নে বস্ত্রে মানুষ। এই সাহিত্য আমাদের মনে লাগিয়েচে একালের ছোঁওয়া, কিন্তু খাদ্য তো ওপার থেকে পুরোপুরি বহন করে আনচে না। যে-বিদ্যা বর্ত্তমান যুগের চিত্তশক্তিকে বিচিত্র আকারে প্রকাশ করচে, উদ্‌ঘাটন করচে বিশ্বরহস্যের নব নব প্রবেশদ্বার, বাংলা সাহিত্যের পাড়ায় তার যাওয়া আসা নেই বললেই হয়। চিন্তা করে যে-মন, যে-মন বিচার করে, বুদ্ধির সঙ্গে ব্যবহারের যোগ সাধন করে যে, সে পড়ে আছে পূর্ব্ব-যুগান্তরে, আর যে-মন রস সম্ভোগ করে সে যাতায়াত সুরু করেচে আধুনিক ভোজের নিমন্ত্রণ-শালার আঙিনায়। স্বভাবতই তার ঝোঁক পড়েচে সেই দিক্‌টাতে যে-দিকে চলেচে মদের পরিবেষণ, যেখানে ঝাঁঝালো গন্ধে বাতাস হয়েচে মাতাল।

গল্প কবিতা নাটক নিয়ে বাংলা সাহিত্যের পনেরো আনা আয়োজন। অর্থাৎ ভোজের আয়োজন, শক্তির আয়োজন নয়। পাশ্চাত্য দেশের চিত্তোৎকর্ষ বিচিত্র চিত্তশক্তির প্রবল সমবায় নিয়ে। মনুষ্যত্ব সেখানে দেহ মন প্রাণের সকল দিকেই ব্যাপৃত। তাই সেখানে যদি ত্রুটি থাকে তো পূর্তিও আছে। বটগাছের কোনো ডাল-বা ঝড়ে ভাঙল, কোনোখানে-বা পোকায় ছিদ্র করেচে, কোনো বৎসর-বা বৃষ্টির কার্পণ্য, কিন্তু সবশুদ্ধ জড়িয়ে বনস্পতি জমিয়ে রেখেচে আপন স্বাস্থ্য আপন বলিষ্ঠতা। তেমনি পাশ্চাত্য দেশের মনকে ক্রিয়াবান্ করে রেখেচে তার বিদ্যা তার শিক্ষা তার সাহিত্য সমস্ত মিলে, তার কর্ম্মশক্তির অক্লান্ত উৎকর্ষ ঘটিয়েচে এই সমস্তের উৎকর্ষ।

আমাদের সাহিত্যে রসেরই প্রাধান্য। সেই জন্যে যখন কোনো অসংযম, কোনো চিত্তবিকার, অনুকরণের নালা বেয়ে এই সাহিত্যে প্রবেশ করে তখন সেটাই একান্ত হয়ে ওঠে, কল্পনাকে রুগ্ন বিলাসিতার দিকে গাঁজিয়ে তোলে। প্রবল প্রাণশক্তি জাগ্রৎ না থাকলে দেহের ক্ষুদ্র বিকার কথায় কথায় বিষফোড়া হয়ে রাঙিয়ে ওঠে। আমাদের দেশে সেই আশঙ্কা। এ নিয়ে দোষ দিলে আমরা নজির দেখাই পাশ্চাত্য সমাজের, বলি এটাই তো সভ্যতার আধুনিকতম পরিণতি। কিন্তু সেই সঙ্গে সকল দিকে আধুনিক সভ্যতার যে সচিন্ত সচল প্রবল বৃহৎ সমগ্রতা আছে, সেটার কথা চাপা রাখি।

একদা পাড়াগাঁয়ে যখন বাস করতুম তখন সাধুসাধকের বেশধারী কেউ কেউ আমার কাছে আসত, তারা সাধনার নামে উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়চর্চ্চার সংবাদ আমাকে জানিয়েচে। তাতে ধর্ম্মের

প্রশ্রয় ছিল। তাদেরই কাছে শুনেচি এই প্রশ্রয় সুরঙ্গপথে সহর পর্য্যন্ত গোপনে শিয়ে প্রশিয়ে শাখায়িত। এই পৌরুষনাশী ধর্ম্মনামধারী লালসার লোলতা ব্যাপ্ত হবার প্রধান কারণ এই যে, আমাদের সাহিত্যে সমাজে সেই সমস্ত উপাদানের অভাব যাতে বড়ো বড়ো চিন্তাকে বুদ্ধির সাধনাকে আশ্রয় ক'রে কঠিন গবেষণার দিকে মনের ঔৎসুক্য জাগিয়ে রাখতে পারে।

এ জন্যে অন্তত বাঙালী সাহিত্যিকদের দোষ দেওয়া যায় না। আমাদের সাহিত্য সারগর্ভ নয় বলে এ'কে নিন্দা করা সহজ, কিন্তু কী করলে এ'কে সারালো করা যায় তার পন্থা নির্ণয় করা তত সহজ নয়। রুচির সম্বন্ধে লোকে বেপরোয়া, কেন-না ওদিকে কোনো শাসন নেই। অশিক্ষিত রুচিও রসের সামগ্রী থেকে যা হোক কোন একটা আস্বাদন পায়। আর যদি সে মনে করে তারই বোধ রসবোধের চরম আদর্শ, তবে তা নিয়ে তর্ক তুললে ফৌজদারী পর্য্যন্ত পৌঁছতে পারে। কবিতা গল্প নাটকের বাজারের দিকে যারা সমজদারের রাজপথটা পায়নি, অন্তত তারা আনাড়ি-পাড়ার মাঠ দিয়েও চলতে পারে, কোনো মাশুল দিতে হয় না কোথাও। কিন্তু যে-বিদ্যা মননের, সেখানে কড়া পাহারার সিংহদ্বার পেরিয়ে যেতে হয়, মাঠ পেরিয়ে নয়। যে-সব দেশের পরে লক্ষ্মী প্রসন্ন এবং সরস্বতীও, তারা সেই বিদ্যার দিকে নতুন নতুন পথ পাকা করচে প্রত্যহ, পণ্যের আদানপ্রদান চলচে দূরে নিকটে, ঘরে বাইরে। আমাদের দেশেও তো বিলম্ব করলে চলবে না।

বাংলার আকাশে দুর্দ্দিন এসেচে চার দিক্ থেকে ঘন ঘোর ক'রে। একদা রাজদরবারে বাঙালীর প্রতিপত্তি ছিল যথেষ্ট।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে বাঙালী কর্ম্মে পেয়েচে খ্যাতি, শিক্ষা-প্রসারণে হয়েচে অগ্রণী। সে দিন সেখানকার লোকের কাছে সে শ্রদ্ধা পেয়েচে, পেয়েচে অকুণ্ঠিত কৃতজ্ঞতা। আজ রাজপুরুষ তার প্রতি অপ্রসন্ন, অন্যান্য প্রদেশে তার সম্বন্ধে আতিথ্য সঙ্কুচিত, দ্বার অবরুদ্ধ। এ দিকে বাংলার আর্থিক দুর্গতিও চরমে এলো।

অবস্থার দৈন্যে অশিক্ষার আত্মগ্লানিতে যেন বাঙালী নীচে তলিয়ে না যায়, যেন তার মন মাথা তুলতে পারে দুর্ভাগ্যের ঊর্দ্ধে, এই দিকে আমাদের সমস্ত চেষ্টা জাগাতে হবে তো। মানুষের মন যখন ছোটো হয়ে যায় তখন ক্ষুদ্রতার নখচঞ্চুর আঘাতে সকল উদ্যোগকেই সে ক্ষুণ্ণ করে। বাংলাদেশে এই ভাঙন-ধরানো ঈর্ষ্যা নিন্দা দলাদলি এবং দুয়ো দেবার উত্তেজনা তো বরাবরই আছে, তার উপরে চিত্তের আলো যতই ম্লান হয়ে আসবে ততই নিজের পরে অশ্রদ্ধাবশতই অন্য সকলকে খর্ব্ব করবার অহৈতুক প্রয়াস আরো উঠবে বিষাক্ত হয়ে। আজ হিন্দুমুসলমানে যে একটা লজ্জাজনক আড়াআড়ি দেশকে আত্মঘাতে প্রবৃত্ত করচে তার মূলেও আছে সর্ব্বদেশব্যাপী অবুদ্ধি। অলক্ষ্মী সেই অশিক্ষিত অবুদ্ধির সাহায্যেই আমাদের ভাগ্যের ভিত্তি ভাঙবার কাজে চর লাগিয়েচে, আত্মীয়কে তুলচে শত্রু ক'রে, বিধাতাকে করচে আমাদের বিপক্ষ। শেষকালে নিজের সর্ব্বনাশ করবার জেদ এতদূর পর্য্যন্ত আজ এগোলো যে বাঙালী হয়ে বাংলা ভাষার মধ্যেও ফাটল ধরাবার চেষ্টা আজ সম্ভবপর হয়েচে; শিক্ষার ও সাহিত্যের যে উদার ক্ষেত্রে সকল মতভেদ সত্ত্বেও এক-রাষ্ট্রীয় মানুষের মেলবার জায়গা, সেখানেও স্বহস্তে কাঁটাগাছ রোপণ করবার উৎসাহ বাধা পেল না, লজ্জা পেল না। দুঃখ পাই তাতে

ধিকার নেই কিন্তু দেশজোড়া অশিক্ষাগ্রস্ত হেয়তা আমাদের মাথা হেঁট ক'রে দিল, ব্যর্থ করে দিল আমাদের সকল মহৎ উদ্যম। রাষ্ট্রিক হাটে রাষ্ট্রাধিকার নিয়ে দরদস্তুর ক'রে হট্টগোল যতই পাকানো যাক, সেখানে গোলটেবিলের চক্রবাত্যায় প্রতিকারের চরম উপায় মিলবে না, তরীর তলায় যেখানে বাঁধন আলগা সেইখানে অবিলম্বে হাত লাগাতে হবে।

সকলের গোড়ায় চাই শিক্ষিত মন। ইস্কুল কলেজের বাইরে শিক্ষা বিছিয়ে দেবার উপায় সাহিত্য। কিন্তু সেই সাহিত্যকে সর্ব্বাঙ্গীণরূপে শিক্ষার আধার করতে হবে, দেখতে হবে তাকে গ্রহণ করবার পথ সর্ব্বত্র সুগম হয়েচে। এ জন্যে কোন্ বন্ধুকে ডাকব, বন্ধু যে আজ দুর্লভ হোলো। তাই বাংলা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারেই আবেদন উপস্থিত করচি।

মস্তিষ্কের সঙ্গে স্নায়ুজালের অবিচ্ছিন্ন যোগ সমস্ত দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। বিশ্ববিদ্যালয়কে সেই মস্তিষ্কের স্থান নিয়ে স্নায়ুতন্ত্র প্রেরণ করতে হবে দেশের সর্ব্বদেহে। প্রশ্ন এই, কেমন করে করা যেতে পারে। তার উত্তরে আমার প্রস্তাব এই যে, একটা পরীক্ষার বেড়াজাল দেশজুড়ে পাতা হোক। এমন সহজ ও ব্যাপকভাবে তার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ইস্কুল কলেজের বাইরে থেকেও দেশে পরীক্ষাপাঠ্য বইগুলি স্বেচ্ছায় আয়ত্ত করবার উৎসাহ জন্মে। অন্তঃপুরের মেয়েরা কিংবা পুরুষদের যারা নানা বাধায় বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হতে পারে না, তারা অবকাশকালে নিজের চেষ্টায় অশিক্ষার লজ্জা নিবারণ করচে এইটি দেখবার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় জেলায় জেলায় পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপন করতে পারে। বহু বিষয় একত্র জড়িত ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি দেওয়া হয়,

এ ক্ষেত্রে উপাধি দেবার উপলক্ষে সে রকম বহুলতার প্রয়োজন নেই। প্রায়ই ব্যক্তিবিশেষের মনের প্রবণতা থাকে বিষয়বিশেষে। সেই বিষয়েই আপন বিশেষ অধিকারের পরিচয় দিতে পারলে সমাজে সে আপন বিশেষ স্থান পাবার অধিকারী হয়। সেটুকু অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করবার কোনো কারণ দেখিনে।

বিশ্ববিদ্যালয় আপন পীঠস্থানের বাহিরেও যদি ব্যাপক উপায়ে আপন সত্তা প্রসারণ করে, তবেই বাংলা ভাষায় যথোচিত পরিমাণে শিক্ষাপাঠ্য গ্রন্থ-রচনা সম্ভবপর হবে। নইলে কোনো কালেই বাংলা সাহিত্যে বিষয়ের দৈন্য ঘুচতেই পারে না। যে সব শিক্ষণীয় বিষয় জানা থাকলে আত্মসম্মান রক্ষা হয় তার জন্যে অগত্যা যদি ইংরেজি ভাষারই দ্বারস্থ হতে হয়, তবে সেই অকিঞ্চনতায় মাতৃভাষাকে চিরদিন অপমানিত করে রাখা হবে। বাঙালী যারা বাংলাভাষাই জানে শিক্ষিত-সমাজে তারা কি চিরদিন অন্ত্যজ শ্রেণীতেই গণ্য হয়ে থাকবে। এমনো এক সময় ছিল যখন ইংরেজি ইস্কুলের পয়লা শ্রেণীর ছাত্রেরা বাংলা জানিনে বলতে অগৌরব বোধ করত না, এবং দেশের লোকেরাও সসম্ভ্রমে তাদের চৌকি এগিয়ে দিয়েচে। সে দিন আজ আর নেই বটে কিন্তু বাঙালীর ছেলেকে মাথা হেঁট করতে হয় শুধু কেবল বাংলাভাষা জানি বলতে। এ দিকে রাষ্ট্রক্ষেত্রে স্বরাজ পাবার জন্যে প্রাণপণ দুঃখ স্বীকার করি কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বরাজ পাবার উৎসাহ আমাদের জাগেনি বললে কম বলা হয়। এমন মানুষ আজও দেশে আছে যারা তার বিরুদ্ধতা করতে প্রস্তুত, যারা মনে করে শিক্ষাকে বাংলাভাষার আসনে বসালে তার মূল্য যাবে কমে। বিলাতে যাতায়াতের প্রথম যুগে ইঙ্গবঙ্গী নেশা যখন উৎকট ছিল তখন

সেই মহলে স্ত্রীকে সাড়ি পরালে প্রেষ্টিজ হানি হোত। শিক্ষা-সরস্বতীকে সাড়ি পরালে আজও অনেক বাঙালী বিদ্যার মানহানি কল্পনা করে। অথচ এটা জানা কথা যে, সাড়িপরা বেশে দেবী আমাদের ঘরের মধ্যে চলা ফেরা করতে আরাম পাবেন, খুরওয়ালা বুটজুতোয় পায়ে পায়ে বাধা পাবার কথা।

একদিন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে, যখন আমার শক্তি ছিল, তখন কখনো কখনো ইংরেজি সাহিত্য মুখে মুখে বাংলা করে শুনিয়েচি। আমার শ্রোতারা ইংরেজি জানতেন সবাই। তবু তাঁরা স্বীকার করেচেন ইংরেজি সাহিত্যের বাণী বাংলা ভাষায় তাঁদের মনে সহজে সাড়া পেয়েচে। বস্তুত আধুনিক শিক্ষা ইংরেজি ভাষাবাহিনী ব'লেই আমাদের মনের প্রবেশপথে তার অনেকখানি মারা যায়। ইংরেজি খানার টেবিলে আহারের জটিল পদ্ধতি যার অভ্যস্ত নয় এমন বাঙালীর ছেলে বিলেতে পাড়ি দেবার পথে পি. এণ্ড ও. কোম্পানীর ডিনার কামরায় যখন খেতে বসে, তখন ভোজ্য ও রসনার মধ্যপথে কাঁটা ছুরির দৌত্য তার পক্ষে বাধাগ্রস্ত ব'লেই ভরপূর ভোজের মাঝখানেও ক্ষুধিত জঠরের দাবী সম্পূর্ণ মিটতে চায় না। আমাদের শিক্ষার ভোজেও সেই দশা,—আছে সবই অথচ মাঝপথে অনেকখানি অপচয় হয়ে যায়। এ যা বলচি এ কলেজি যজ্ঞের কথা, আমার আজকের আলোচ্য বিষয় এ নিয়ে নয়। আমার বিষয়টা সর্ব্বসাধারণের শিক্ষা নিয়ে। শিক্ষার জলের কল চালানোর কথা নয়, পাইপ যেখানে পৌঁছয় না সেখানে পানীয়ের ব্যবস্থার কথা। মাতৃভাষায় সেই ব্যবস্থা যদি গোষ্পদের চেয়ে প্রশস্ত না হয় তবে এই বিদ্যাহারা দেশের মরুবাসী মনের উপায় হবে কী।

বাংলা যার ভাষা সেই আমার তৃষিত মাতৃভূমির হয়ে বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে চাতকের মতো উৎকণ্ঠিত বেদনায় আবেদন জানাচ্ছি—তোমার অভ্রভেদী শিখরচূড়া বেষ্টন ক'রে পুঞ্জ পুঞ্জ শ্যামল মেঘের প্রসাদ আজ বর্ষিত হোক ফলে শস্যে, সুন্দর হোক পুষ্পে পল্লবে, মাতৃভাষার অপমান দূর হোক, যুগশিক্ষার উদ্বেল ধারা বাঙালীচিত্তের শুষ্ক নদীর রিক্ত পথে বান ডাকিয়ে বয়ে যাক, দুই কূল জাগুক পূর্ণ চেতনায়, ঘাটে ঘাটে উঠুক আনন্দধ্বনি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাহিত্যের সামগ্রী

একেবারে খাঁটিভাবে নিজের আনন্দের জন্যই লেখা, সাহিত্য নহে। অনেকে কবিত্ব করিয়া বলেন যে, পাখী যেমন নিজের উল্লাসেই গান করে, লেখকের রচনার উচ্ছ্বাসও সেইরূপ আত্মগত —পাঠকেরা যেন তাহা আড়ি পাতিয়া শুনিয়া থাকেন। পাখীর গানের মধ্যে পক্ষিসমাজের প্রতি যে কোনো লক্ষ্য নাই, এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারি না। না থাকে ত না-ই রহিল, তাহা লইয়া তর্ক করা বৃথা—কিন্তু লেখকের রচনার প্রধান লক্ষ্য পাঠকসমাজ। তাই বলিয়াই যে সেটাকে কৃত্রিম বলিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। মাতার স্তন্য একমাত্র সন্তানের জন্য, তাই বলিয়াই তাহাকে স্বতঃস্ফূর্ত্ত বলিবার কোন বাধা দেখি না।

নীরব কবিত্ব এবং আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস, সাহিত্যে এই দুটো বাজে কথা কোন কোন মহলে চলিত আছে। যে কাঠ জ্বলে নাই, তাহাকে আগুন নাম দেওয়াও যেমন, যে মানুষ আকাশের দিকে তাকাইয়া আকাশেরই মত নীরব হইয়া থাকে, তাহাকেও কবি বলা সেইরূপ। প্রকাশই কবিত্ব, মনের তলার মধ্যে কি আছে বা না আছে, তাহা আলোচনা করিয়া বাহিরের লোকের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। কথায় বলে 'মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ'—ভাণ্ডারে কি জমা আছে, তাহা আন্দাজে হিসাব করিয়া বাহিরের লোকের কোন সুখ নাই, তাহাদের পক্ষে মিষ্টান্নটা হাতে-হাতে পাওয়া আবশ্যক।

সাহিত্যে আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসও সেই রকমের একটা কথা। রচনা রচয়িতার নিজের জন্য নহে, ইহাই ধরিয়া লইতে হইবে—এবং সেইটে ধরিয়া লইয়াই বিচার করিতে হইবে।

আমাদের মনের ভাবের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই এই, সে নানা মনের মধ্যে নিজেকে অনুভূত করিতে চায়। প্রকৃতিতে আমরা দেখি, ব্যাপ্ত হইবার জন্য, টিকিয়া থাকিবার জন্য, প্রাণীদের মধ্যে সর্ব্বদা একটা চেষ্টা চলিতেছে। যে জীব সন্তানের দ্বারা আপনাকে যত বহুগুণিত করিয়া যত বেশি জায়গা জুড়িতে পারে, তাহার জীবনের অধিকার তত বেশি বাড়িয়া যায়, নিজের অস্তিত্বকে সে যেন তত অধিক সত্য করিয়া তোলে। মানুষের মনোভাবের মধ্যেও সেই রকমের একটা চেষ্টা আছে। তফাতের মধ্যে এই যে, প্রাণের অধিকার দেশে ও কালে, মনোভাবের অধিকার মনে এবং কালে। মনোভাবের চেষ্টা বহুকাল ধরিয়া বহুমনকে আয়ত্ত করা।

এই একান্ত আকাঙ্ক্ষায় কত প্রাচীন কাল ধরিয়া কত ইঙ্গিত, কত ভাষা, কত লিপি,—কত পাথরে খোদাই, ধাতুতে ঢালাই, চামড়ায় বাঁধাই,—কত গাছের ছালে, পাতায়, কাগজে,—কত তূলিতে, খোন্তায়, কলমে, কত আঁকজোক, কত প্রয়াস—বাঁ দিক্ হইতে ডাহিনে, ডাহিন দিক্ হইতে বাঁয়ে, উপর হইতে নীচে, এক সার হইতে অন্য সারে! কি ?—না, আমি যাহা চিন্তা করিয়াছি, আমি যাহা অনুভব করিয়াছি, তাহা মরিবে না, তাহা মন হইতে মনে, কাল হইতে কালে চিন্তিত হইয়া, অনুভূত হইয়া, প্রবাহিত হইয়া চলিবে। আমার বাড়িঘর, আমার আসবাবপত্র, আমার শরীরমন, আমার সুখদুঃখের সামগ্রী, সমস্তই যাইবে—কেবল

আমি যাহা ভাবিয়াছি, যাহা বোধ করিয়াছি, তাহা চিরদিন মানুষের বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া সজীব সংসারের মাঝখানে বাঁচিয়া থাকিবে।

মধ্য এশিয়ায় গোবি-মরুভূমির বালুকা-স্তূপের মধ্য হইতে যখন বিলুপ্ত মানব-সমাজের বিস্মৃত প্রাচীনকালের জীর্ণ পুঁথি বাহির হইয়া পড়ে, তখন তাহার সেই অজানা ভাষার অপরিচিত অক্ষরগুলির মধ্যে কি-একটি বেদনা প্রকাশ পায়। কোন্ কালের কোন্ সজীব চিত্তের চেষ্টা আজ আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশলাভের জন্য আঁকুপাঁকু করিতেছে। যে লিখিয়াছিল, সে নাই; যে লোকালয়ে লেখা হইয়াছিল, তাহাও নাই—কিন্তু মানুষের মনের ভাবটুকু মানুষের মনের সুখদুঃখের মধ্যে লালিত হইবার জন্য যুগ হইতে যুগান্তরে আসিয়া আপনার পরিচয় দিতে পারিতেছে না—দুই বাহু বাড়াইয়া মুখের দিকে চাহিতেছে।

জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-সম্রাট্ অশোক আপনার যে কথাগুলিকে চিরকালের শ্রুতিগোচর করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাদিগকে তিনি পাহাড়ের গায়ে খুদিয়া দিয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন, পাহাড় কোনোকালে মরিবে না, সরিবে না—অনন্তকালের পথের ধারে অচল হইয়া দাঁড়াইয়া নব নব যুগের পথিকদের কাছে এক কথা চিরদিন ধরিয়া আবৃত্তি করিতে থাকিবে। পাহাড়কে তিনি কথা কহিবার ভার দিয়াছিলেন। পাহাড় কালাকালের কোন বিচার না করিয়া তাঁহার ভাষা বহন করিয়া আসিয়াছে। কোথায় অশোক, কোথায় পাটলিপুত্র, কোথায় ধর্ম্মজাগ্রৎ ভারতবর্ষের সেই গৌরবের দিন! কিন্তু পাহাড় সে দিনকার সেই কথাকয়টি বিস্মৃত অক্ষরে অপ্রচলিত ভাষায় আজও উচ্চারণ

করিতেছে। কত-দিন অরণ্যে রোদন করিয়াছে,—অশোকের সেই মহাবাণীও কত-শত-বৎসর মানবহৃদয়কে বোবার মত কেবল ইসারায় আহ্বান করিয়াছে। পথ দিয়া রাজপুত গেল, পাঠান গেল, মোগল গেল, বর্গির তরবারি বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্রবেগে দিগ্‌দিগন্তে প্রলয়ের কশাঘাত করিয়া গেল—কেহ তাহার ইসারায় সাড়া দিল না। সমুদ্রপারের যে ক্ষুদ্র দ্বীপের কথা অশোক কখনো কল্পনাও করেন নাই—তাঁহার শিল্পীরা পাষাণফলকে যখন তাঁহার অনুশাসন উৎকীর্ণ করিতেছিল, তখন যে-দ্বীপের অরণ্যচারী "ড্রুয়িদ্"গণ আপনাদের পূজার আবেগ ভাষাহীন প্রস্তর-স্তূপে স্তম্ভিত করিয়া তুলিতেছিল, বহুসহস্র বৎসর পরে সেই দ্বীপ হইতে একটি বিদেশী আসিয়া কালান্তরের সেই মূক ইঙ্গিতপাশ হইতে তাহার ভাষাকে উদ্ধার করিয়া লইলেন। রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের ইচ্ছা এত শতাব্দী পরে একটি বিদেশীর সাহায্যে সার্থকতা লাভ করিল। সে ইচ্ছা আর কিছুই নহে, তিনি যত বড় সম্রাট্‌ই হউন, তিনি কি চান্ কি না চান্, তাঁহার কাছে কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ, তাহা পথের পথিককেও জানাইতে হইবে। তাঁহার মনের ভাব এত যুগ ধরিয়া সকল মানুষের মনের আশ্রয় চাহিয়া পথপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আছে। রাজচক্রবর্ত্তীর সেই একাগ্র আকাঙ্ক্ষার দিকে পথের লোক কেহ-বা চাহিতেছে, কেহ-বা না চাহিয়া চলিয়া যাইতেছে।

তাই বলিয়া অশোকের অনুশাসনগুলিকে আমি যে সাহিত্য বলিতেছি, তাহা নহে। উহাতে এইটুকু প্রমাণ হইতেছে, মানব-হৃদয়ের একটা প্রধান আকাঙ্ক্ষা কি? আমরা যে মূর্ত্তি গড়িতেছি, ছবি আঁকিতেছি, কবিতা লিখিতেছি, পাথরের মন্দির নির্ম্মাণ

করিতেছি—দেশে-বিদেশে চিরকাল ধরিয়া অবিশ্রাম এই যে একটা চেষ্টা চলিতেছে, ইহা আর কিছুই নয়, মানুষের হৃদয় মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অমরতা প্রার্থনা করিতেছে। যাহা চিরকালীন মানুষের হৃদয়ে অমর হইতে চেষ্টা করে, সাধারণত তাহা আমাদের ক্ষণকালীন প্রয়োজন ও চেষ্টা হইতে নানাপ্রকারের পার্থক্য অবলম্বন করে। আমরা সাংবৎসরিক প্রয়োজনের জন্যই ধান-যব-গম প্রভৃতি ওষধির বীজ বপন করিয়া থাকি, কিন্তু অরণ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে চাই যদি, তবে বনস্পতির বীজ সংগ্রহ করিতে হয়।

সাহিত্যে সেই চিরস্থায়িত্বের চেষ্টাই মানুষের প্রিয় চেষ্টা। সেই জন্য দেশহিতৈষী সমালোচকেরা যতই উত্তেজনা করেন যে, সারবান্ সাহিত্যের অভাব হইতেছে—কেবল নাটক-নভেল-কাব্যে দেশ ছাইয়া যাইতেছে, তবু লেখকদের হুঁস্ হয় না; কারণ সারবান্ সাহিত্যে উপস্থিত প্রয়োজন মিটে, কিন্তু অপ্রয়োজনীয় সাহিত্যে স্থায়িত্বের সম্ভাবনা বেশি; কেন-না যাহা জ্ঞানের কথা, তাহা প্রচারিত হইয়া গেলেই তাহার উদ্দেশ্য সফল হইয়া শেষ হইয়া যায়। মানুষের জ্ঞানসম্বন্ধে নূতন আবিষ্কারের দ্বারা পুরাতন আবিষ্কার আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে। কাল যাহা পণ্ডিতের অগম্য ছিল, আজ তাহা অর্বাচীন বালকের কাছেও নূতন নহে। যে সত্য নূতন বেশে বিপ্লব আনয়ন করে, সেই সত্য পুরাতন বেশে বিস্ময়মাত্র উদ্রেক করে না। আজ যে সকল তত্ত্ব মূঢ়ের নিকটে পরিচিত, কোনকালে যে তাহা পণ্ডিতের নিকটেও বিস্তর বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহাই লোকের কাছে আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু হৃদয়ভাবের কথা প্রচারের দ্বারা পুরাতন হয় না। জ্ঞানের কথা একবার জানিলে আর জানিতে হয় না: আগুন গরম, সূর্য্য গোল, জল তরল, ইহা একবার জানিলেই চুকিয়া যায়—দ্বিতীয়বার কেহ যদি তাহা আমাদের নূতন শিক্ষার মত জানাইতে আসে, তবে ধৈর্য্য রক্ষা করা কঠিন হয়। কিন্তু ভাবের কথা বারবার অনুভব করিয়া শ্রান্তিবোধ হয় না। সূর্য্য যে পূর্ব্বদিকে ওঠে, এ কথা আর আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে না—কিন্তু সূর্য্যোদয়ের যে সৌন্দর্য্য ও আনন্দ, তাহা জীবসৃষ্টির পর হইতে আজ পর্য্যন্ত আমাদের কাছে অম্লান আছে। এমন কি, অনুভূতি যত প্রাচীন কাল হইতে যত লোকপরম্পরার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসে, ততই তাহার গভীরতাবৃদ্ধি হয়—ততই তাহা আমাদিগকে সহজে আবিষ্ট করিতে পারে। অতএব চিরকাল যদি মানুষ আপনার কোন জিনিষ মানুষের কাছে উজ্জ্বল নবীনভাবে অমর করিয়া রাখিতে চায়, তবে তাহাকে ভাবের কথাই আশ্রয় করিতে হয়। এই জন্য সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন জ্ঞানের বিষয় নহে, ভাবের বিষয়।

তাহা ছাড়া যাহা জ্ঞানের জিনিষ, তাহা এক ভাষা হইতে আর এক ভাষায় স্থানান্তর করা চলে। মূল রচনা হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া অন্য রচনার মধ্যে নিবিষ্ট করিলে অনেক সময়ে তাহার উজ্জ্বলতাবৃদ্ধি হয়। তাহার বিষয়টি লইয়া নানা লোকে নানা ভাষায় নানা রকম করিয়া প্রচার করিতে পারে—এইরূপেই তাহার উদ্দেশ্য যথার্থভাবে সফল হইয়া থাকে। কিন্তু ভাবের বিষয়সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। তাহা যে মূর্ত্তিকে আশ্রয় করে, তাহা হইতে আর বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না।

জ্ঞানের কথাকে প্রমাণ করিতে হয়, আর ভাবের কথাকে সঞ্চার করিয়া দিতে হয়। ঊষা যে আরক্তবর্ণ, তাহা প্রমাণ করিয়া দিবার যে কয়টি উপায় আছে, তাহা জানা শক্ত নহে—কিন্তু ঊষা আমার যে কেমন লাগিতেছে, তাহা অন্যকে ঠিকমত অনুভব করাইতে গেলে কোনো বাঁধা উপায়ের দোহাই দেওয়া চলে না। যুক্তিশাস্ত্রের বিধানের মত তাহা নির্দ্দিষ্ট নহে। তাহার জন্য নানাপ্রকার আভাস-ইঙ্গিত, নানাপ্রকার ছলাকলার দরকার হয়। তাহাকে কেবল বুঝাইয়া বলিলেই হয় না, তাহাকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতে হয়।

এই কলাকৌশলপূর্ণ রচনা, ভাবের দেহের মত। এই দেহের মধ্যে ভাবের প্রতিষ্ঠায় সাহিত্যকারের পরিচয়। এই দেহের প্রকৃতি- ও গঠন-অনুসারেই তাহার আশ্রিত ভাব মানুষের কাছে আদর পায়—ইহার শক্তি-অনুসারেই তাহা হৃদয়ে ও কালে ব্যাপ্তি-লাভ করিতে পারে। প্রাণের জিনিষ দেহের উপরে একান্ত নির্ভর করিয়া থাকে। জলের মত তাহাকে এক পাত্র হইতে আর এক পাত্রে ঢালা যায় না। দেহ এবং প্রাণ পরস্পর পরস্পরকে গৌরবান্বিত করিয়া একাত্ম হইয়া বিরাজ করে।

যেখানে রচনার সঙ্গে তাহার বিষয়ের এইরূপ একাত্মতা আছে, সেইখানেই সাহিত্য সজীবমূর্ত্তিতে প্রকাশ পায়। কুমারসম্ভবের মধ্যে যে বিষয়টুকু আছে, তাহা জানা হইলেই যে কুমারসম্ভব পড়ার ফল পাওয়া যায়, তাহা নহে। উহার ছন্দোবন্ধ, উহার আগাগোড়াই পড়িতে হইবে। কুমারসম্ভব ছাড়া আর কোনখানেই কুমারসম্ভবপাঠের উদ্দেশ্য সফল করিবার কোন উপায় নাই।

উজ্জয়িনীতে বসিয়া কত শতাব্দী পূর্ব্বে কালিদাস যে কয়টি কথা লিখিয়াছেন, তাহার একটি অক্ষর বাদ দিলে চলিবে না। তাঁহারই ভাব তাঁহারই ভাষায় তাঁহারই রচনার ভঙ্গীতে আমাদিগকে সমগ্র আকারে গ্রহণ করিতে হইবে, নতুবা তাহার প্রাণহানি হইবে। ইহাই যথার্থ বাঁচিয়া থাকা।

ভাব, বিষয়, তত্ত্ব সাধারণ মানুষের। তাহা একজন যদি বাহির না করে ত কালক্রমে আর একজন বাহির করিবে। কিন্তু রচনা লেখকের সম্পূর্ণ নিজের। তাহা একজনের যেমন হইবে, আর একজনের তেমন হইবে না। সেই জন্য রচনার মধ্যেই লেখক যথার্থরূপে বাঁচিয়া থাকে—ভাবের মধ্যে নহে, বিষয়ের মধ্যে নহে।

অবশ্য রচনা বলিতে গেলে ভাবের সহিত ভাবপ্রকাশের উপায় দুই সম্মিলিতভাবে বুঝায়—কিন্তু বিশেষ করিয়া উপায়টাই লেখকের। দীঘি বলিতে জল এবং খনন-করা আধার দুই একসঙ্গে বোঝায়। কিন্তু কীর্ত্তি কোন্‌টা? জল মানুষের সৃষ্টি নহে—তাহা চিরন্তন। সেই জলকে বিশেষভাবে সর্ব্বসাধারণের ভোগের জন্য সুদীর্ঘকাল রক্ষা করিবার যে উপায়, তাহাই কীর্ত্তিমান্ মানুষের নিজের। ভাব সেইরূপ মনুষ্যসাধারণের, কিন্তু তাহা বিশেষ মূর্ত্তিতে সর্ব্বলোকের বিশেষ আনন্দের সামগ্রী করিয়া তুলিবার উপায়-রচনাই লেখকের কীর্ত্তি।

অতএব দেখিতেছি, ভাবকে নিজের করিয়া সকলের করা, ইহাই সাহিত্য, ইহাই ললিতকলা। অঙ্গার জিনিষটা জলে-স্থলে-বাতাসে নানা পদার্থে সাধারণভাবে সাধারণের আছে—গাছপালা তাহাকে নিগূঢ়-শক্তিবলে বিশেষ আকারে প্রথমত নিজের করিয়া

লয়, এবং সেই উপায়েই তাহা সুদীর্ঘকাল বিশেষভাবে সর্ব্বসাধারণের ভোগের দ্রব্য হইয়া উঠে। শুধু যে তাহা আহার এবং উত্তাপের কাজে লাগে, তাহা নহে—তাহা হইতে সৌন্দর্য্য. ছায়া, স্বাস্থ্য বিকীর্ণ হইতে থাকে।

সাহিত্যের মূল জিনিষটা সেইরূপ অত্যন্ত সাধারণ। লেখক তাহাকে প্রথমত নিজের করিয়া লন। সেই উপায়ে তাহা মূর্ত্তি-গ্রহণ করে, সৌন্দর্য্যলাভ করে, সহজে সর্ব্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য হইয়া বিশেষ আকারে স্থায়িত্বপ্রাপ্ত হয়।

সৃষ্টির মূল উপাদান অসংখ্য নহে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন আধারে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হইয়া অসীম বৈচিত্র্য রচনা করিতেছে। সাহিত্যেরও মূল উপাদান সীমাবদ্ধ। একই ভাব সহস্র চিত্ত হইতে সহস্রভাবে প্রতিফলিত হইয়া মানুষের আনন্দলোককে নব নব বৈচিত্র্য দান করিতেছে।

অতএব দেখা যাইতেছে, সাধারণের জিনিষকে বিশেষভাবে নিজের করিয়া সেই উপায়েই তাহাকে পুনশ্চ বিশেষভাবে সাধারণের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ। তাহা যদি হয়, তবে জ্ঞানের জিনিষ সাহিত্য হইতে আপনি বাদ পড়িয়া যায়; কারণ ইংরাজিতে যাহাকে 'ট্রুথ্' বলে এবং বাংলাতে যাহাকে আমরা 'সত্য' নাম দিয়াছি অর্থাৎ যাহা আমাদের বুদ্ধির অধিগম্য বিষয়—তাহাকে ব্যক্তিবিশেষের নিজত্ববর্জ্জিত করিয়া তোলাই একান্ত দরকার। সত্য সর্ব্বাংশেই ব্যক্তিনিরপেক্ষ শুভ্র-নিরঞ্জন। মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব আমার কাছে একরূপ, অন্যের কাছে অন্যরূপ নহে। তাহার উপরে বিচিত্র হৃদয়ের নূতন নূতন রঙের ছায়া পড়িবার জো নাই।

যে সকল জিনিষ অন্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইবার জন্য প্রতিভাশালী হৃদয়ের কাছে সুর, রং, ইঙ্গিত প্রার্থনা করে—যাহা আমাদের হৃদয়ের দ্বারা সৃষ্ট না হইয়া উঠিলে অন্য হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না, তাহাই সাহিত্যের সামগ্রী। তাহা আকারে-প্রকারে, ভাবে-ভাষায়, সুরে-ছন্দে মিলিয়া তবেই বাঁচিতে পারে—তাহা মানুষের একান্ত আপনার—তাহা আবিষ্কার নহে, অনুকরণ নহে, তাহা সৃষ্টি। সুতরাং তাহা একবার প্রকাশিত হইয়া উঠিলে তাহার রূপান্তর, অবস্থান্তর করা চলে না—তাহার প্রত্যেক অংশের উপরে তাহার সমগ্রতা একান্তভাবে নির্ভর করে। যেখানে তাহার ব্যত্যয় দেখা যায়, সেখানে সাহিত্য-অংশে তাহা হেয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মর্য্যাদা

ভারতবর্ষ ছোট-বড়, স্ত্রী-পুরুষ, সকলকেই মর্য্যাদা দান করিয়াছে; এবং সে মর্য্যাদাকে দুরাকাঙ্ক্ষার দ্বারা লভ্য করে নাই। বিদেশীরা বাহির হইতে ইহা দেখিতে পায় না। যে ব্যক্তি যে পৈতৃক কর্ম্মের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে কর্ম্ম যাহার পক্ষে সুলভতম, তাহা পালনেই তাহার গৌরব—তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইলেই তাহার অমর্য্যাদা; এই মর্য্যাদা মনুষ্যত্বকে ধারণ করিয়া রাখিবার একমাত্র উপায়। পৃথিবীতে অবস্থার অসাম্য থাকিবেই, উচ্চ অবস্থা অতি অল্প লোকেরই ভাগ্যে ঘটে—বাকি সকলেই যদি অবস্থাপন্ন লোকের সহিত ভাগ্য তুলনা করিয়া মনে মনে অমর্য্যাদা অনুভব করে, তবে তাহারা আপন দীনতায় যথার্থ ই ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে। বিলাতের শ্রমজীবী প্রাণপণে কাজ করে বটে, কিন্তু সেই কাজে তাহাকে মর্য্যাদার আবরণ দেয় না। সে নিজের কাছে হীন বলিয়া যথার্থই হীন হইয়া পড়ে। এইরূপে য়ুরোপের পনের-আনা লোক দীনতায়, ঈর্ষ্যায়, ব্যর্থপ্রয়াসে অস্থির। য়ুরোপীয় ভ্রমণকারী নিজেদের দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীয়দের হিসাবে আমাদের দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীয়দের বিচার করে—ভাবে, তাহাদের দুঃখ ও অপমান, ইহাদের মধ্যেও আছে। কিন্তু তাহা একেবারেই নাই। ভারতবর্ষে কর্ম্মবিভেদ-শ্রেণীবিভেদ সুনির্দ্দিষ্ট বলিয়াই, উচ্চশ্রেণীয়েরা নিজের স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্য নিম্নশ্রেণীয়কে লাঞ্ছিত করিয়া বহিষ্কৃত করে না। ব্রাহ্মণের ছেলেরও বাগ্‌দি দাদা আছে। গণ্ডিটুকু অবিতর্কে

রক্ষিত হয় বলিয়াই পরস্পরের মধ্যে যাতায়াত, মানুষে-মানুষে হৃদয়ের সম্বন্ধ বাধাহীন হইয়া উঠে—বড়দের অনাত্মীয়তার ভার ছোটদের হাড়গোড় একেবারে পিষিয়া ফেলে না। পৃথিবীতে যদি ছোট-বড়র অসাম্য অবশ্যম্ভাবীই হয়, যদি স্বভাবতই সর্ব্বত্রই সকলপ্রকার ছোটর সংখ্যাই অধিক ও বড়র সংখ্যাই স্বল্প হয়, তবে সমাজের এই অধিকাংশকেই অমর্য্যাদার লজ্জা হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভারতবর্ষ যে উপায় বাহির করিয়াছে, তাহারই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

য়ুরোপে এই অমর্য্যাদার প্রভাব এতদূর ব্যাপ্ত হইয়াছে যে, সেখানে একদল আধুনিক স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোক হইয়াছে বলিয়াই, লজ্জা বোধ করে; সন্তানবতী হওয়া, স্বামি-সন্তানের সেবা করা, তাহারা কুণ্ঠার বিষয় জ্ঞান করে। মানুষ বড়, কর্ম্মবিশেষ বড় নহে; মনুষ্যত্ব-রক্ষা করিয়া যে-কর্ম্মই করা যায়, তাহাতেই অপমান নাই; —দারিদ্র্য লজ্জাকর নহে, সেবা লজ্জাকর নহে, হাতের কাজ লজ্জাকর নহে,—সকল কর্ম্মে, সকল অবস্থাতেই সহজে মাথা তুলিয়া রাখা যায়, এ ভাব য়ুরোপে স্থান পায় না। সেই জন্য সমর্থ অসমর্থ, সকলেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবার জন্য সমাজে প্রভূত নিষ্ফলতা, অন্তহীন বৃথাকর্ম্ম ও আত্মঘাতী উদ্যমের সৃষ্টি করিতে থাকে। ঘর ঝাঁট দেওয়া, জল আনা, বাটনা বাটা, আত্মীয়-অতিথি সকলের সেবাশেষে নিজে আহার করা, ইহা য়ুরোপের চক্ষে অত্যাচার ও অপমান, কিন্তু আমাদের পক্ষে ইহা গৃহলক্ষ্মীর উন্নত অধিকার, —ইহাতেই তাহার পুণ্য, তাহার সম্মান। বিলাতে এই সমস্ত কাজে যাহারা প্রত্যহ রত থাকে, শুনিতে পাই, তাহারা ইতরভাব প্রাপ্ত হইয়া শ্রীভ্রষ্ট হয়; কারণ কাজকে ছোট জানিয়া তাহা

করিতে বাধ্য হইলে, মানুষ নিজে ছোট হয়। আমাদের লক্ষ্মীগণ যতই সেবার কর্ম্মে ব্রতী হন,—তুচ্ছ কর্ম্ম-সকলকে পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া সম্পন্ন করেন,—অসামান্যতা-হীন স্বামীকে দেবতা বলিয়া ভক্তি করেন, ততই তাঁহারা শ্রী-সৌন্দর্য্য-পবিত্রতায় মণ্ডিত হইয়া উঠেন,—তাঁহাদের পুণ্যজ্যোতিতে চতুর্দ্দিক্ হইতে ইতরতা অভিভূত হইয়া পলায়ন করে।

য়ুরোপ এই কথা বলেন যে, সকল মানুষেরই সব হইবার অধিকার আছে—এই ধারণাতেই মানুষের গৌরব। কিন্তু বস্তুতই সকলের সব হইবার অধিকার নাই, এই অতি সত্য কথাটি সবিনয়ে গোড়াতেই মানিয়া লওয়া ভাল। বিনয়ের সহিত মানিয়া লইলে তাহার পরে আর কোন অগৌরব নাই। রামের বাড়িতে শ্যামের কোন অধিকার নাই, এ কথা স্থির নিশ্চিত বলিয়াই রামের বাড়িতে কর্ত্তৃত্ব করিতে না পারিলেও শ্যামের তাহাতে লেশমাত্র লজ্জার বিষয় থাকে না।/ কিন্তু শ্যামের যদি এমন পাগ্‌লামি মাথায় জোটে যে, সে মনে করে রামের বাড়িতে একাধিপত্য করাই তাহার উচিত—এবং সেই বৃথাচেষ্টায় সে বারংবার বিড়ম্বিত হইতে থাকে, তবেই তাহার প্রত্যহ অপমান ও দুঃখের সীমা থাকে না। আমাদের দেশে স্বস্থানের নির্দ্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সকলেই আপনার নিশ্চিত অধিকারটুকুর মর্য্যাদা ও শান্তি লাভ করে বলিয়াই, ছোট সুযোগ পাইলেই বড়কে খেদাইয়া দিতে চায় না; এবং বড়ও ছোটকে সর্ব্বদা সর্ব্ব-প্রযত্নে খেদাইয়া রাখে না।

য়ুরোপ বলে, এই সন্তোষই, এই জিগীষার অভাবই, জাতির মৃত্যুর কারণ। তাহা য়ুরোপীয় সভ্যতার মৃত্যুর কারণ বটে,

কিন্তু আমাদের সভ্যতার তাহাই ভিত্তি। যে লোক জাহাজে আছে, তাহার পক্ষে যে বিধান, যে লোক ঘরে আছে, তাহারও পক্ষে সেই বিধান নহে। য়ুরোপ যদি বলে সভ্যতামাত্রেই সমান এবং সেই বৈচিত্র্যহীন সভ্যতার আদর্শ কেবল য়ুরোপেই আছে, তবে তাহার সেই স্পর্দ্ধা-বাক্য শুনিয়াই তাড়াতাড়ি আমাদের ধনরত্নকে ভাঙা-কুলা দিয়া পথের মধ্যে বাহির করিয়া ফেলা সঙ্গত হয় না।

বস্তুত সন্তোষের বিকৃতি আছে বলিয়াই অত্যাকাঙ্ক্ষার যে বিকৃতি নাই, এ কথা কে মানিবে? সন্তোষে জড়ত্ব প্রাপ্ত হইলে কাজে শৈথিল্য আনে, যদি ইহা সত্য হয়, তবে অত্যাকাঙ্ক্ষার দম বাড়িয়া গেলে যে ভূরি ভূরি অনাবশ্যক ও নিদারুণ অকাজের সৃষ্টি হইতে থাকে, এ কথা কেন ভুলিব? প্রথমটাতে যদি রোগে মৃত্যু ঘটে, তবে দ্বিতীয়টাতে অপঘাতে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। এ কথা মনে রাখা কর্ত্তব্য, সন্তোষ এবং আকাঙ্ক্ষা দুইয়েরই মাত্রা বাড়িয়া গেলে বিনাশের কারণ জন্মে।

অতএব সে আলোচনা ছাড়িয়া দিয়া ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, সন্তোষ, সংযম, শান্তি, ক্ষমা, এ সমস্তই উচ্চতর সভ্যতার অঙ্গ। ইহাতে প্রতিযোগিতা—চকমকির ঠোকা-ঠুকি-শব্দ ও স্ফুলিঙ্গ-বর্ষণ নাই, কিন্তু হীরকের স্নিগ্ধ-নিঃশব্দ জ্যোতি আছে। সেই শব্দ ও স্ফুলিঙ্গকে এই ধ্রুব জ্যোতির চেয়ে মূল্যবান্ মনে করা বর্ব্বরতামাত্র। য়ুরোপীয় সভ্যতার বিদ্যালয় হইতেও যদি সে বর্ব্বরতা প্রসূত হয়, তবু তাহা বর্ব্বরতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিখ ও মারাঠার বৈশিষ্ট্য

মারাঠা ও শিখের অভ্যুত্থান ও পতনের কারণ-সম্বন্ধে তুলনা করিয়া বলিতে হইলে এই বলা যায় যে, শিখ একদা একটি অত্যন্ত বৃহৎ ভাবের আহ্বানে একত্র হইয়াছিল। এমন একটি সত্যধর্ম্মের বার্ত্তা তাহারা শুনিয়াছিল, যাহা কোন স্থান-বিশেষের চিরাগত প্রথার মধ্যে বদ্ধ নহে এবং যাহা কোন সময়-বিশেষের উত্তেজনা হইতে প্রসূত হয় নাই, যাহা চিরকালের এবং সকল মানবের, যাহা ছোট-বড় সকলেরই অধিকারকে প্রশস্ত করে, চিত্তকে মুক্তি দেয় এবং যাহাকে স্বীকার করিলে প্রত্যেক মানুষই মনুষ্যত্বের পূর্ণতম গৌরবকে উপলব্ধি করে। নানকের এই উদার ধর্ম্মের আহ্বানে বহু শতাব্দী ধরিয়া শিখ বহু দুঃখ সহ্য করিয়া ক্রমশ প্রসার লাভ করিতেছিল। এই ধর্ম্মবোধ ও দুঃখভোগের গৌরবে শিখদের মধ্যে অলক্ষ্যে একটি মহৎ ঐক্যের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল।

গুরুগোবিন্দ শিখদের এই ধর্ম্মবোধের ঐক্যানুভূতিকে কর্ম্ম-সাধনার সুযোগে পরিণত করিয়া তুলিলেন। তিনি একটি বিশেষ সাময়িক প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ধর্ম্ম-সমাজের ঐক্যকে রাষ্ট্রীয় উন্নতি-লাভের উপায়রূপে খর্ব্ব করিলেন। কিন্তু এই উপলক্ষে সম্প্রদায়কে সঙ্কীর্ণ করিয়া লইয়া, তিনি তাহার ঐক্যকে ঘনিষ্ঠ করিয়া লইলেন। যে জাতিভেদ তাহার প্রবল অন্তরায় ছিল, তাহাকে সমূলে উৎপাটিত করিলেন।

গুরুগোবিন্দ তাঁহার শিষ্যসমাজের মধ্য হইতে এই যে ভেদ-বিভাগকে এক কথায় দূর করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার প্রধান কারণ এই যে, নানকের উদার ধর্ম্মের প্রভাবে পরস্পরের মধ্যে ভেদ-বুদ্ধির ব্যবধান আপনিই তলে তলে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। গুরুগোবিন্দ তাহাতে আঘাত করিবামাত্র তাহা শতখণ্ড হইয়া পড়িল। পূর্ব্ব হইতেই গভীরতররূপে যদি ইহার আয়োজন না থাকিত, তবে সহস্র প্রয়োজন হইলেও গুরুগোবিন্দ কিছুই করিতে পারিতেন না। শুধু তাহাই নয়, সকল-কর্ম্ম-নাশা এই ভেদকে দূর করিতে হইবে, এই সঙ্কল্পমাত্রও তাঁহার মনে আকার গ্রহণ করিতে পারিত না।

কিন্তু গুরুগোবিন্দ কি করিলেন? ঐক্যকেই পাকা করিলেন; অথচ যে মহাভাবের শক্তির সহায়তায় তাহা করা সম্ভব হইল, তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন, অন্তত তাহার সিংহাসনে আর একজন প্রবল সরিক বসাইয়া দিলেন।

ঐক্যই ভাবের বাহন। এই কারণে মহাভাবমাত্রই সেই বাহনকে সৃষ্টি করিবার জন্য আপনার শক্তিকে নিযুক্ত করে। বাহনের গৌরব তাহার আরোহীর মাহাত্ম্যে। গুরুগোবিন্দ সাময়িক ক্রোধের উত্তেজনায় ও প্রয়োজন-বোধে বাহনকে প্রবল করিয়া তুলিলেন বটে, কিন্তু আরোহীকে খর্ব্ব করিয়া দিলেন। তাহা হইতে ফল এই হইল, উপস্থিতমত কিছু কিছু কার্য্যসিদ্ধি ঘটিল, কিন্তু যাহা মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতেছিল, তাহা বন্ধনে পড়িল; শিখদের মধ্যে পরস্পরকে নিবিড় করিবার ব্যবস্থা রহিল কিন্তু অগ্রসর করিয়া দিবার বেগ রহিল না। এই জন্য বহু শতাব্দী ধরিয়া যে-শিখ পরম গৌরবে মানুষ হইবার দিকে

চলিয়াছিল, তাহারা হঠাৎ এক সময়ে থামিয়া সৈন্য হইয়া উঠিল এবং ঐখানেই তাহাদের ইতিহাস শেষ হইয়া গেল।

শিবাজী যে উদ্দেশ্য-সাধনে তাঁহার জীবন প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা কোন সঙ্কীর্ণ সাময়িক প্রয়োজনমূলক ছিল না এবং পূর্ব্ব হইতেই দাক্ষিণাত্যের ধর্ম্মগুরুদের প্রভাবে তাঁহার ক্ষেত্র কতকটা প্রস্তুত হইয়াছিল। এই জন্য তাঁহার উৎসাহ কিছুকালের জন্য যেন সমস্ত মারাঠা জাতির মধ্যেই সঞ্চারিত হইতে পারিয়াছিল।

ফাটা পাত্রে জল ভরিয়া উঠিতে পারে, কিন্তু তাহাতে জল থাকে না। ক্ষণকালের ভাবোচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে মনে হয় সমস্ত বুঝি ছাপাইয়া এক হইয়া গেল, কিন্তু ছিদ্রের কাজ ভিতরে ভিতরে চলিতে থাকে। ভারতবর্ষের সমাজ ছিদ্রে পূর্ণ—কোনো ভাবকে তাহা ধরিয়া রাখিতে পারে না। এই জন্য এই সমাজে প্রাণময় ভাবের পরিবর্ত্তে শুষ্ক নির্জ্জীব আচারের এমন নিদারুণ প্রাদুর্ভাব।

শিবাজী তাঁহার সমসাময়িক মারাঠা হিন্দুসমাজে একটা প্রবল ভাবের প্রবর্ত্তন এতটা পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন যে, তাঁহার অভাবেও কিছুদিন পর্য্যন্ত তাহার বেগ নিঃশেষিত হয় নাই। কিন্তু শিবাজী সেই ভাবের আধারটিকে পাকা করিয়া তুলিতে পারেন নাই, এমন কি চেষ্টা মাত্র করেন নাই; সমাজের বড় বড় ছিদ্রগুলির দিকে না তাকাইয়া তাহাকে লইয়া ক্ষুব্ধ সমুদ্রে পাড়ি দিলেন। তখনি পাড়ি না দিলে নয় বলিয়া এবং পাড়ি দিবার আর কোনো উপকরণ ছিল না বলিয়াই যে অগত্যা এই কাজ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। এই ছিদ্রকেই পার করা তাঁহার লক্ষ্য ছিল। শিবাজী যে হিন্দুসমাজকে মোগল-আক্রমণের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, আচার-বিচারগত বিভাগ-বিচ্ছেদ সেই সমাজেরই

একেবারে মূলের জিনিষ। সেই বিভাগ-মূলক ধর্ম্ম-সমাজকেই তিনি সমস্ত ভারতবর্ষে জয়ী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাকেই বলে 'বালির বাঁধ বাঁধা'। ইহাই অসাধ্যসাধন।

শিবাজী এমন কোন ভাবকে আশ্রয় ও প্রচার করেন নাই, যাহা হিন্দুসমাজের মূলগত ছিদ্রসমূহকে পরিপূর্ণ করিয়া দিতে পারে। নিজের ধর্ম্ম বাহির হইতে পীড়িত ও অপমানিত হইতেছে, এই ক্ষোভ মনে লইয়া তাহাকে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিজয়ী করিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক হইলেও তাহা সফল হইবার নহে; কারণ ধর্ম্ম যেখানে ভিতর হইতেই পীড়িত হইতেছে, যেখানে তাহার ভিতরেই এমন সকল বাধা আছে যাহাতে মানুষকে কেবলই বিচ্ছিন্ন ও অপমানিত করিতেছে, সেখানে সে দিকে দৃষ্টিপাতমাত্র না করিয়া, এমন কি, সেই ভেদ-বুদ্ধিকেই মুখ্যত ধর্ম্মবুদ্ধি বলিয়া জ্ঞান করিয়া সেই শতদীর্ণ ধর্ম্মসমাজের স্বারাজ্য এই সুবৃহৎ ভারতবর্ষে স্থাপন করা কোন মানুষেরই সাধ্য নহে; কেন-না তাহা বিধাতার বিধানসঙ্গত হইতে পারে না। কেবল আঘাত পাইয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া, অভিমান করিয়া, কোন জাতি বড় হইতে, জয়ী হইতে পারে না। যতক্ষণ তাহার ধর্ম্মবুদ্ধির মধ্যেই অখণ্ডতার তত্ত্ব কাজ করিবার স্থান না পায়, যতক্ষণ মিলনের শক্তি কোন মহাভাবের অমৃতরসে চিরসঞ্জীবিত হইয়া সকল দিক্ দিয়া অন্তরে-বাহিরে তাহাকে এক করিবার অভিমুখে না লইয়া যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বাহিরের কোন আঘাতে এবং প্রতিভাশালী ব্যক্তি-বিশেষের কোন বীরত্বেই তাহাকে দৃঢ়ঘনিষ্ঠ, তাহাকে সজীব ও সচেতন করিয়া তুলিতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান

গত কয় বৎসর বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রায় সমস্তগুলিই পাঠ্যপুস্তকশ্রেণিভুক্ত। দুই-একখানি মাত্র সাধারণ পাঠোপযোগী। ইহা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্য হইতে বিজ্ঞান স্থানচ্যুত হইয়াছে। বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিতা হইয়া ইউরোপখণ্ডে ও এশিয়ার পূর্ব্ব প্রান্তে আশ্রয় লইয়াছেন। বাস্তবিক ষাট-সত্তর বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালা সাহিত্যের এ প্রকার দুর্গতি হয় নাই। বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকায় তখন বিজ্ঞান স্বীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল। অক্ষয়কুমার 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় পদার্থবিদ্যা-বিষয়ক যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, রাজেন্দ্রলাল 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' ভূতত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-বিষয়ক যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের অস্থিমজ্জাগত হইয়া থাকিবে। বাঙ্গালা সাহিত্যে বিজ্ঞানের যাহা কিছু সমাবেশ হইয়াছে, তজ্জন্য এই দুই মহাত্মার নিকট আমরা চিরঋণী থাকিব। ইঁহাদের কিছু পূর্ব্বে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লর্ড হার্ডিঞ্জের আনুকূল্যে Encyclopædia Bengalensis অথবা 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' আখ্যা দিয়া কয়েক খণ্ড পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। ইহাতে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও দর্শনতত্ত্ব-সকল প্রকাশিত হইত। কিন্তু ইঁহাদের পূর্ব্বেও বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসারের জন্য বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার

উপলব্ধি হইয়াছিল। শ্রীরামপুরের মিশনারীগণকে বর্ত্তমান বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের জন্মদাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; তাঁহারাই আবার বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান-প্রচারেরও প্রথম প্রবর্ত্তক। আমাদের জাতীয় অভিমান আঘাত-প্রাপ্ত হয় বলিয়া এ কথা আমাদের ভুলিয়া যাইলে, 'খৃষ্টানী বাঙ্গালা' বলিয়া তাঁহাদের কৃত কার্য্যকে উড়াইয়া দিলে চলিবে না; ঐতিহাসিক ন্যায়ের ও সত্যের তুলাদণ্ড হস্তে করিয়া যাহার যে সম্মান প্রাপ্য তাহাকে তাহা প্রদান করিতে হইবে।

১৮২৫ খৃঃ অব্দে উইলিয়ম ইয়েট্স্ প্রথমে 'সার পদার্থবিদ্যা' বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত করেন। ইহাতে পদার্থবিদ্যা ভিন্ন মৎস্য, পতঙ্গ, পক্ষী ও অন্যান্য জীবের বর্ণনা আছে। এতদ্ভিন্ন 'কিমিয়া বিদ্যাসার' নামক রসায়নবিদ্যা-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ শ্রীরামপুর হইতে প্রচারিত হয়। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় এই পুস্তকের সবিস্তার সমালোচনা করিয়াছেন। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ 'সমাচার-দর্পণ' নামে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশিত করেন, এবং তাঁহারাই আবার 'দিগ্‌দর্শন' নামক নানাতত্ত্ববিষয়িণী পত্রিকা পরিচালিত করিতেন। এই পত্রিকাতেই বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চ্চার প্রথম সূত্রপাত হয়।

ইহার পর ১৮২৮ খৃঃ অব্দে 'বিজ্ঞান-অনুবাদ-সমিতি' * নামে একটি সমিতি স্থাপিত হয়। প্রোফেসার উইল্‌সন্ এই সমিতির সভাপতি নিযুক্ত হন ও উক্ত সমিতির চেষ্টায় 'বিজ্ঞান-সেবধি' নামক

* Society for translating European Sciences.

গ্রন্থের ১৫ খণ্ড প্রকাশিত হয়। ইহার পর ১৮৫১ খৃঃ অব্দে 'বাঙ্গালা সাহিত্য-সমিতি' * নামে আর একটি সমিতি স্থাপিত হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসার এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও যাহাতে বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে জ্ঞানালোক প্রবেশ করিতে পারে তদ্বিষয়ে ইহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। মহাত্মা বেথুন ও বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এই সভার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; এতদ্ভিন্ন গবর্নমেণ্ট মাসিক ১৫০৲ চাঁদা দিয়া ইহার আনুকূল্য করিতেন। এই সভার উদ্যোগেই ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' প্রকাশ করেন। মহামতি হড্‌সন প্র্যাট এই সমিতির স্থাপয়িতা-দিগেব মধ্যে অন্যতম উদ্যোগী সভ্য ছিলেন। তিনি উক্ত সমিতির উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই :—

"বাঙ্গালার অধিবাসীদিগকে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাদিতে ব্যুৎপন্ন করার আশা একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং জাতীয় ভাষায় ইহাদিগের শিক্ষার পথ প্রসরতর করা কর্ত্তব্য। এই নিমিত্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন করা একান্ত প্রয়োজনীয়। * * ইহাদের নিমিত্ত সরল সুখপাঠ্য গ্রন্থ প্রচার করিয়া পাঠ-লিপ্সার সৃষ্টি করিতে হইবে। জ্ঞানার্জ্জনের নিমিত্ত তৃষ্ণা বৃদ্ধি করিতে হইবে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে অল্প মূল্যের গ্রন্থ প্রচার করিতে হইবে। সেই সকল গ্রন্থে বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও মানবশরীরতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় সহজ ও চিত্তাকর্ষী প্রবন্ধ থাকিবে। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য-সম্বন্ধেও প্রবন্ধাদি লিখিয়া প্রচার করিতে হইবে। * * * * এই সকল

* Vernacular Literary Society.

প্রয়োজন-সাধনের নিমিত্ত সহজ ও সরল সাহিত্য-প্রচার অতি আবশ্যক। এই সমিতিকে এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে হইবে।" *

বিজ্ঞান-প্রচার-সম্বন্ধে এই সমিতির আশা তাদৃশী ফলবতী হয় নাই। সতেরখানি পুস্তক প্রকাশের পর সমিতি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, গল্প ও আমোদজনক পুস্তকই এ দেশের পাঠক-সাধারণের অধিকতর প্রিয়। এতদ্ব্যতীত অপর শ্রেণীর পুস্তক আদৌ আদরে গৃহীত হয় না।

এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা উচিত যে, কলিকাতা, হুগলী ও ঢাকা—এই তিন স্থানে তিনটি নর্ম্যাল বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের ব্যবহারার্থ পদার্থবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, জ্যামিতি, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ক অনেকগুলি বাঙ্গালা পুস্তক প্রণীত হয়। ইহা ভিন্ন ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর পরীক্ষার উপযোগী পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, ও রসায়নবিদ্যা-বিষয়ক অনেক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। মেডিক্যাল স্কুল-সমূহের পাঠ্য অস্থিবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা-ঘটিত অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থও বাঙ্গালা ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ-প্রচারেও যে বাঙ্গালা ভাষার অনেকটা উন্নতি হইয়াছে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এখন আলোচনার বিষয় এই যে, অর্দ্ধশতাব্দীর অধিককাল ধরিয়া বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ-সকল প্রচারিত হইতেছে, কিন্তু ইহাতে বিশেষ কিছু ফললাভ হইয়াছে কি না। বিজ্ঞান-বিষয়ক যে সকল পুস্তকের কিছু কাটতি আছে, তাহা 'পাঠ্যপুস্তক-

* বিশ্বকোষ

নির্ব্বাচন কমিটি'র নির্ব্বাচিত তালিকাভুক্ত, সুতরাং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সোপান-স্বরূপ। একাদশ বা দ্বাদশ-বর্ষীয় বালক-দিগের গলাধঃকরণের জন্য যে সকল বিজ্ঞানপাঠ প্রচারিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের ইষ্ট কি অনিষ্ট সাধিত হইতেছে তাহা ঠিক বলা যায় না। আসল কথা এই, আমাদের দেশ হইতে প্রকৃত জ্ঞানস্পৃহা চলিয়া গিয়াছে। জ্ঞানের প্রতি একটা আন্তরিক টান না থাকিলে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই-তিনটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় বিশেষ ফললাভ হয় না। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত বিদ্যালয়-সমূহে বহুকাল হইতে বিজ্ঞান-অধ্যাপনের ব্যবস্থা হইয়াছে, তথাপি এই জ্ঞান-স্পৃহার অভাবেই, বিজ্ঞানের প্রতি আন্তরিক অনুরাগসম্পন্ন ব্যুৎপন্ন ছাত্র আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না; কেন-না ঘোড়াকে জলাশয়ের নিকট আনিলে কি হইবে?—উহার যে তৃষ্ণা নাই। পরীক্ষা পাস করাই যেখানকার ছাত্রজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, সেখানকার যুবকগণের দ্বারা অধীত বৈজ্ঞানিক বিদ্যার শাখা-প্রশাখাদির উন্নতি হইবে এরূপ প্রত্যাশা করা নিতান্তই বৃথা। সেই সকল মৃতকল্প, স্বাস্থ্যবিহীন যুবকগণের যত্নে জাতীয় ভাষার উন্নতি-বিধান কিংবা যে কোনও প্রকার দুরূহ ও অধ্যবসায়-মূলক কার্য্যের সাফল্য-সম্পাদনের আশা নিতান্তই সুদূরপরাহত। বস্তুতঃ পরীক্ষা পাস করিবার নিমিত্ত এরূপ হাস্যোদ্দীপক উন্মত্ততা পৃথিবীর অন্য কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। পাস করিয়া সরস্বতীর নিকট চিরবিদায়গ্রহণ,—শিক্ষিতের এরূপ জঘন্য প্রবৃত্তি আর কোন দেশেই নাই। আমরা এ দেশে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া জ্ঞানী ও গুণী হইয়াছি বলিয়া আহ্লাদে স্ফীত হই, অপরাপর দেশে সেই সময়েই প্রকৃত জ্ঞানচর্চ্চার কাল আরম্ভ

হয়; কারণ সে সকল দেশের লোকের জ্ঞানের প্রতি যথার্থ অনুরাগ আছে। তাঁহারা এ কথা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার হইতে বাহির হইয়াই জ্ঞান-সমুদ্র-মন্থনের প্রশস্ত সময়। আমরা দ্বারকেই গৃহ বলিয়া মনে করিয়াছি, সুতরাং জ্ঞানমন্দিরের দ্বারেই অবস্থান করি, অভ্যন্তরস্থ রত্নরাজি দৃষ্টিগোচর না করিয়াই ক্ষুণ্ণমনে প্রত্যাবর্ত্তন করি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক পঞ্জিকা পরীক্ষোত্তীর্ণগণের নামে পরিপূর্ণ দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। এক বৎসর হয়ত উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় দশজন প্রথম শ্রেণীতে এম.এ. পাস হইলেন। কিন্তু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এখানেই নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইল; সে সমুদয় যুবকগণকে দুই-এক বৎসর পরে আর বিদ্যামন্দিরের প্রাঙ্গণেও দেখিতে পাওয়া যায় না। পিপাসাশূন্য জ্ঞানালোচনার এই ত পরিণাম! জাপানের জ্ঞানতৃষ্ণার সহিত আমাদের যুবকগণের তৃষ্ণা তুলনা করিলে অবাক্ হইতে হয়। কোন বাঙ্গালী যুবক জাপানে পদার্পণ করিয়াই 'সঞ্জীবনী'তে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করা গেল :—

"জাপানীদের জ্ঞানতৃষ্ণা যেরূপ, অন্য কোন জাতির সেরূপ আছে কি না সন্দেহ। কি ছোট, কি বড়, কি ধনী, কি নির্ধন, কি বিদ্বান্, কি মূর্খ—সকলেই নূতন বিষয় জানিতে এতদূর আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে যে, ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। জাহাজ হইতে জাপানে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে যে আভাস পাইয়াছিলাম, তাহাতেই মনে করিয়াছিলাম এরূপ জাতির উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। * * চাকরাণীগুলি পর্য্যন্ত বাহিরের বিষয়-সম্বন্ধে যতটা খোঁজ রাখে, আমাদের দেশের অধিকাংশ ভদ্রমহিলাই তাহা জানেন না।"

এখন একবার ফ্রান্সের দিকে তাকাইয়া দেখা যাউক। ফরাসী-বিপ্লবের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এই জ্ঞানপিপাসা কি প্রকার বলবতী হইয়াছিল তাহা বাক্‌ল্ (Buckle) সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। যখন লাবোয়াসিয়ে, লালাণ্ড, বাঁফো প্রভৃতি মনীষিগণ প্রকৃতির নবতত্ত্ব-সকল আবিষ্কার করিয়া সরল ও সরস ভাষায় জনসাধারণের নিকট প্রচার করিতে লাগিলেন, তখন ফরাসী-সমাজে ধনীর রম্য হর্ম্ম্যে ও দরিদ্রের পর্ণকুটীরে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। ইহার পূর্ব্বে বিজ্ঞান-সমিতিতে যে সকল বৈজ্ঞানিক বিষয় আলোচিত হইত, তাহা শুনিবার জন্য দুই-চারিজন বিশেষজ্ঞ মাত্র উপস্থিত হইতেন। কিন্তু এই নূতন বারতা শুনিবার জন্য সকল শ্রেণীর লোক ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। যে সকল সম্ভ্রান্ত মহিলা ইতর লোকের সংস্পর্শে আসিলে নিজেকে অপবিত্র জ্ঞান করিতেন তাঁহারাই পদমর্য্যাদা ভুলিয়া লেক্‌চার শুনিবার জন্য নগণ্য লোকের সহিত ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া বসিবার একটু স্থান পাইলেই চরিতার্থ হইতেন।

সম্প্রতি এক ধুয়া উঠিয়াছে যে, বহু অর্থব্যয়ে যন্ত্রাগার (Laboratory) প্রস্তুত না হইলে বিজ্ঞান-শিক্ষা হয় না। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের গ্রামে ও নগরে, উদ্যানে ও বনে, প্রান্তরে ও ভগ্নস্তূপে, নদী ও সরোবরে, তরুকোটরে ও গিরিগহ্বরে, অনন্ত পরিবর্ত্তনশীল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অভ্যন্তরে জ্ঞানপিপাসুর যে কত প্রকার অনুসন্ধেয় বিষয় ছড়াইয়া রহিয়াছে, তাহা কে নির্ণয় করিবে? বাংলার দয়েল, বাংলার পাপিয়া, বাংলার ছাতারের জীবনের কথা কে লিখিবে? বাংলার মশা, বাংলার সাপ, বাংলার মাছ, বাংলার কুকুর, ইহাদের সম্বন্ধে কি আমাদের জানিবার কিছুই বাকী নাই? এ দেশের সোঁদাল, বেল, বাব্‌লা ও শ্যেওড়ার কাহিনী শুধু কি

ইউরোপীয় লেখকদিগের কেতাব পড়িয়াই আমাদিগকে শিখিতে হইবে? এ দেশের ভিন্ন ভিন্ন কৃষিপ্রণালী, প্রাচীন ভিন্ন ভিন্ন ক্রীড়াপদ্ধতি—এ সবের ভিতরে কি আমাদের জ্ঞাতব্য কিছুই থাকিতে পারে না?

রসায়ন, পদার্থবিদ্যাদি শাস্ত্র-সম্বন্ধে যাহাই হউক না কেন, প্রাণিতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা এবং ভূতত্ত্ববিদ্যার মৌলিক গবেষণা যে বিরাট্ যন্ত্রাগারের অভাবে কতক দূর চলিতে পারে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

ছুরি, কাঁচি, অণুবীক্ষণ ইত্যাদি সরঞ্জাম কিনিতে ১০০৲ টাকার অধিক মূল্য লাগে না; কিন্তু গোড়াতেই গলদ, জ্ঞানের পুণ্য-পিপাসা কোথায়? এ দেশের প্রকৃতি-বিদ্যার্থী যুবক দেখিয়াছেন, এখন একবার ইউরোপের প্রকৃতি-বিদ্যার্থী যুবকের কথা শুনুন। বিদ্যাবিষয়ক উপকরণ-আহরণের জন্য জ্ঞানপিপাসু ইউরোপীয় যুবক আফ্রিকার নিবিড় শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে প্রাণ হাতে করিয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহের অনুসন্ধানের নিমিত্ত আহার-নিদ্রা ভুলিয়া কার্য্য করিতে থাকেন। ভোগলালসা কখনও তাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। জ্ঞানপিপাসা তাঁহাদের হৃদয়ের একমাত্র আসক্তি। আপনারা অনেকেই জানেন, উদ্ভিদ্‌নিচয়-আহরণের জন্য স্যর জোসেফ হুকার ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে কত বিপদ্ আলিঙ্গন করিয়া হিমালয় পর্ব্বতের বহু উচ্চদেশ পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়াছিলেন। সে সময়ে দার্জ্জিলিং-হিমালয় রেলপথ হয় নাই। কাজেই তখন হিমাচলারোহণ এখনকার মত সুগম ছিল না। তুষারমণ্ডিত মেরুপ্রদেশের প্রাকৃতিক অবস্থা জানিবার জন্য কত অর্থব্যয়ে কতবার অভিযান প্রেরণ

করা হইয়াছে; কত বৈজ্ঞানিক তাহাতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য দেশের কি অদম্য উৎসাহ! কি অতৃপ্ত জ্ঞানপিপাসা!

ফল কথা এই যে, আমরা যত দিন স্বাধীনভাবে নূতন নূতন গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া মাতৃভাষায় সেই সকল তত্ত্ব প্রচার করিতে সমর্থ না হইব, তত দিন আমাদের ভাষার এই দারিদ্র্য ঘুচিবে না। প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া হিন্দুজাতি একপ্রকার মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। যেমন ধনীর সন্তান পৈতৃক বিষয়-বিভব হারাইয়া নিঃস্বভাবে কালাতিপাত করেন অথচ পূর্ব্বপুরুষগণের ঐশ্বর্য্যের দোহাই দিয়া গর্ব্বে স্ফীত হন, আমাদেরও দশা সেইরূপ। লেকি বলেন যে, খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দী হইতে ইউরোপখণ্ডে স্বাধীন চিন্তার স্রোত প্রথম প্রবাহিত হয়; প্রায় সেই সময় হইতেই ভারত-গগন তিমিরাচ্ছন্ন হইল। অধ্যাপক বেবর (Weber) যথার্থই বলিয়াছেন, ভাস্করাচার্য্য ভারত-গগনের শেষ নক্ষত্র। সত্য বটে, আমরা নব্য-স্মৃতি ও নব্য-ন্যায়ের দোহাই দিয়া বাঙ্গালী-মস্তিষ্কের প্রখরতার শ্লাঘা করিয়া থাকি; কিন্তু ইহা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যে সময়ে রঘুনাথ, গদাধর ও জগদীশ প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ বিবিধ জটিল টীকা-টিপ্পনী রচনা করিয়া টোলের ছাত্রদিগের আতঙ্ক উৎপাদন করিতেছিলেন, যে সময়ে এখানকার জ্যোতির্ব্বিদ্‌বৃন্দ প্রাতে দুই দণ্ড দশ পল গতে নৈঋর্ত কোণে বায়স কা কা রব করিলে সে দিন কি প্রকার যাইবে ইত্যাদি বিষয় নির্ণয়পূর্ব্বক কাকচরিত্র রচনা করিতেছিলেন, যে সময়ে এ দেশের অধ্যাপকবৃন্দ "তাল, পড়িয়া টিপ করে, কি টিপ করিয়া পড়ে" ইত্যাকার তর্কের মীমাংসায় সভাস্থলে ভীতি উৎপাদন করিয়া সমবেত জনগণের অন্তরে শান্তি-ভঙ্গের আয়োজন করিতে-

ছিলেন, সেই সময়ে ইউরোপখণ্ডে গ্যালিলিও, কেপ্লার, নিউটন প্রভৃতি মনস্বিগণ উদীয়মান হইয়া প্রকৃতির নূতন নূতন তত্ত্ব উদ্ঘাটনপূর্ব্বক জ্ঞানজগতে যুগান্তর উপস্থিত করিতেছিলেন ও মানবজীবনের সার্থকতা-সম্পাদন করিতেছিলেন।

তাই বলি, আজ সহস্র বৎসর ধরিয়া হিন্দুজাতি নিঃস্পন্দ ও অসাড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। যাহা হউক বিধাতার কৃপায় হাওয়া ফিরিয়াছে; মরা গাঙে সত্য সত্যই বান ডাকিয়াছে; আজ বাঙ্গালী জাতি ও সমগ্র ভারত নূতন উৎসাহে, নূতন উদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত। জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল জাতি পুরাতন আচার, ব্যবহার, জ্ঞান ও শিক্ষা-বিষয়ে নিতান্তই গোঁড়া, যাঁহারা প্রাচীন শিক্ষার ও প্রাচীন প্রথার নামে আত্মহারা হন, যাঁহারা বর্ত্তমান জগতের জীবন্তভাব জাতীয় জীবনে সংবেশিত করা হঠকারিতা বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা বর্ত্তমান কালের ইতিহাসে নগণ্য ও মৃতপ্রায়; এমন কি এই সমস্ত জাতি নূতনের প্রবল সংঘর্ষণে লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। এ বিষয়ে কিছু-মাত্রও সন্দেহ নাই যে, বর্ত্তমান ইউরোপের শিক্ষা অত্যল্পকাল হইল আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু আমরা ইহা যেন না ভুলি যে, বর্ত্তমান অবস্থায় ইউরোপ আমাদিগকে যোজনাধিক পশ্চাতে ফেলিয়া বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পূর্ণোন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। আমার স্বতঃই মনে হয়, আমাদের এই অধোগতির কারণ পুরাতনের প্রতি এক অস্বাভাবিক ও অনেক সময়ে অহেতুক আসক্তি ও অপরাপর জাতির গুণাবলীর প্রতি বিদ্বেষ ও অগ্রাহ্যের ভাব। এ স্থানে অবশ্য স্বীকার্য্য যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের আচার-পদ্ধতি ও শিক্ষা অনেক সময়ে বর্ত্তমান সভ্যজাতিগণের আচার-

পদ্ধতি হইতেও শ্রেষ্ঠ ছিল এবং সে সমুদয়ের প্রতি ভক্তিবিহীন হওয়া মূঢ়তার লক্ষণ, সন্দেহ নাই। কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনে যেমন বাহ্য জগতে তেমনই মানসিক রাজ্যে, অনেক বিষয়ের আমূল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে।

এ স্থানে প্রশ্নটি একটু বিশদভাবে আলোচনা করা কর্ত্তব্য। আমি শঙ্কিত হইতেছি পাছে কাহারও মনে অপ্রীতি-সঞ্চার করিয়া ফেলি, কিন্তু যদি স্বাধীন চিন্তা মানব মাত্রেরই পৈতৃক সম্পত্তি হয়, তাহা হইলে আমাকে বলিতেই হইবে যে, পরকীয় শিক্ষা ও জ্ঞানের গ্রহণেচ্ছা আমাদের আদৌ নাই। যদি থাকিত, তাহা হইলে অন্ততঃ বিজ্ঞান-বিষয়ে বর্ত্তমান ইউরোপ ও আমেরিকা আমাদের অনুকরণীয় হইত। এই প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য শিক্ষার সংমিশ্রণের উপরেই আমার মতে ভারতের সমৃদ্ধি নির্ভর করিতেছে। যে জাপান ত্রিংশৎ বর্ষ পূর্ব্বে ঘোর তমসাচ্ছন্ন ছিল, জগতে যাহার অস্তিত্ব (ঐতিহাসিক হিসাবে) সন্দেহের বিষয় ছিল, সেই জাপান পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা জাতীয় শিক্ষার সহিত সংযোজন করিয়া আজ কি এক অভিনব ক্ষমতাশালী জাতি হইয়া এশিয়ার পূর্ব্ব প্রান্তে বিরাজ করিতেছে।

এখন জ্ঞানজগতে যেমন তুমুল সংগ্রাম, পার্থিব জগতেও তদধিক। নূতনের দ্বারা পুরাতনের সংস্কার করিতেই হইবে; নচেৎ ভয় হয়, ভারতভাগ্যরবি প্রভাতাকাশে উঠিয়াই অকালে অস্তমিত হইবে।

প্রফুল্লচন্দ্র রায়

হৃষীকেশ

হৃষীকেশে অনেক পুরাতন মন্দির আছে; সেগুলি যে কত কালের তাহা ঠিক জানা যায় না। এই সকল মন্দিরের মধ্যে "ভরতজীর" মন্দির প্রধান; ইনি রামের ভাই ভরত নহেন; যে ভরতের নাম-অনুসারে "ভারতবর্ষ" হইয়াছে, ইনি সেই ভরত। ভরতজীর মন্দিরের কাছে আর একটি অধিকতর পুরাতন জীর্ণ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইলাম; মাটির ভিতর অনেকটা বসিয়া গিয়াছে, কিন্তু যতটুকু এখনও বিদ্যমান তাহাতেও প্রাচীন হিন্দুজাতির ভাস্কর-বিদ্যায় দক্ষতার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। এ মন্দির কত কালের তাহা কেহই বলিতে পারে না; প্রবাদ, শঙ্করাচার্য্য এইটি প্রস্তুত করান এবং তিনিই ইহাতে প্রথম ভরতজীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন; সে মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার বহুকাল পরে অন্য মন্দিরটিতে ভরতজীর মূর্ত্তি রক্ষিত হয়। এ দুটি মন্দির ভিন্ন রামসীতার আর একটি মন্দির আছে, তাহার অবস্থিতি অতি সুন্দর স্থানে; তাহার নীচেই একটা ঝরনা আছে, তাহাতে গরম জল আসিয়া গঙ্গায় পড়িতেছে।

হৃষীকেশের উত্তরে গঙ্গাতীরে তপোবন। এই তপোবনে মহামুনি ব্যাস সশিষ্য বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন; এখানে অন্যান্য বড় বড় মুনিঋষিরও আশ্রম ছিল। আমি যে সময়ে এখানে আসি তাহার অল্পদিন পরেই হরিদ্বারে সুপ্রসিদ্ধ কুম্ভমেলা বসিয়াছিল; এই উপলক্ষে এখানে অনেক সাধুসন্ন্যাসীর সমাগম

দেখিলাম। বৎসরের অধিকাংশ কালই হৃষীকেশের গঙ্গাতীরে সহস্রাধিক সন্ন্যাসী বাস করেন। এখানে গঙ্গা খুব প্রশস্ত নয়, কিন্তু গভীর, অতি স্বচ্ছসলিলা; উপলখণ্ড-সঙ্কুলা ও প্রখরবাহিনী এবং পাড় অত্যন্ত উচ্চ। নানা দেশের ধনবান্ লোকে এখানে গ্রীষ্ম ও বর্ষার কয়েক মাস সদাব্রত খুলিয়া রাখেন, সুতরাং সাধুগণের আহারের কোন অসুবিধা হয় না; প্রতিদিন দুই প্রহরের সময়ে সদাব্রত হইতে দুই-তিনখানি রুটি ও একটু ডাল, কোথাও-বা একটু শাক প্রত্যেককে দেওয়া হয়। অনেকেই সদাব্রতে উপস্থিত হইয়া আহার্য্য লইয়া যান। কতক সাধু আছেন তাঁহারা বাহির হন না,—সদাব্রতের লোক তাঁহাদের আশ্রমে গিয়া খাদ্যদ্রব্য দিয়া আইসে। আমি হৃষীকেশে যাইয়া দেখি, প্রায় পাঁচ হাজার সন্ন্যাসী তখন সেখানে বাস করিতেছেন। আমাদের পৌঁছানর পূর্ব্বেই অনেক লোক-সমাগম হওয়ায় কোন ধর্ম্মশালায় আমরা স্থান পাইলাম না; অবশেষে কোন সদাব্রতের একজন প্রধান কর্ম্মচারী অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার সদাব্রতে আমাদের আশ্রয় দিলেন। সেখানে স্থান অতি সঙ্কীর্ণ, শুধু রান্নাঘর ও জিনিষপত্র রাখিবার একটা ভাঁড়ার; সদাব্রতের লোকজন তাহারই মধ্যে থাকে এবং আমিও সেইখানে আশ্রয় পাইলাম।

স্নানাহার শেষ করিয়া সন্ধ্যার একটু আগে তপোবন-দর্শনে বাহির হওয়া গেল। গঙ্গার উপরেই শাল, বেল, তমাল, অশোক, চম্পক, আমলকী, হরীতকী প্রভৃতি বহুবিধ বৃক্ষ-পরিশোভিত, নয়ন-তৃপ্তিকর সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্র। এক দিকে কলনাদিনী প্রখরবাহিনী ভাগীরথী, অপর দিকে হিমাচল ক্রমোন্নত হইয়া গগনতল স্পর্শ করিয়াছে; শত শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরে এই প্রদেশ আচ্ছন্ন;

প্রাঙ্গণগুলি অতি পরিষ্কার; সন্ন্যাসীরা এই সমস্ত কুটীরে ও পর্ব্বতগুহায় বাস করেন! আমি সেখানে উপস্থিত হইয়া যে মধুর দৃশ্য দেখিলাম তাহা আর কখন ভুলিব না। তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছিল—পর্ব্বতের বৃক্ষচূড়ায় স্বর্ণমুকুটের ন্যায় তাহার শেষ-আলোকচ্ছটা দেখা যাইতেছিল। দেখিলাম, শত শত সাধুসন্ন্যাসী নিজ নিজ কার্য্যে ব্যস্ত; কেহ গীতা বা উপনিষদ্ পাঠ করিতেছেন, কেহ গম্ভীরস্বরে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন, কেহ-বা ধ্যানপরায়ণ। অমর কবি কালিদাসের সান্ধ্য-তপোবন-বর্ণনা আজ আকার ধরিয়া সম্মুখে প্রতিভাত হইল। দূরে তেমনি বায়ুহিল্লোলিত শ্যামল তরুরাজিশোভিত প্রান্তর, বৃক্ষশাখায় তেমনি সুন্দর বিহঙ্গকুলের মধুর সান্ধ্যকাকলী, ইতস্ততঃ তেমনি চঞ্চলনেত্র হরিণশিশুর নির্ভয় পদচারণ, আর বহুদূরবর্ত্তী শালবনে দলবদ্ধ ময়ূরের সহর্ষ কেকাধ্বনি! এই সমস্ত মধুর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমি স্থান-কাল বিস্মৃত হইলাম; আমার মনে হইল, আমি যেন বর্ত্তমান যুগের শিক্ষা-সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজত্ব অনেক পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়া এক বহু প্রাচীন, ব্রহ্মপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ জাতির সরলতা ও পবিত্রতার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি! এখানে প্রাচীন কবির বর্ণিত সকলই অল্পাধিক পরিমাণে দেখিতে পাইলাম; দেখিলাম না, কেবল নীবার-মুষ্টি-প্রত্যাশায় উটজদ্বাররোধী মৃগকুলের অভীষ্ট-ফলদাত্রী করুণা-স্বরূপিণী ঋষিপত্নীগণ, সরল ঋষিকুমারীগণের সযত্ন আলবালজল-সেচন এবং আতপাগমে কুটীর-প্রাঙ্গণে রাশীকৃত নীবারধান্য।

এখানে কোন বাঙ্গালী সন্ন্যাসী আছেন কি না জানিবার জন্য বড় কৌতূহল হইল; একটি সাধুকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমাকে

কিয়দ্দূরে একটি কুটীরের দ্বারদেশে পৌঁছাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন ; দ্বার বন্ধ দেখিয়া আমি বাহিরে কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিলাম। অল্পক্ষণ পরে দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া একটি বাঙ্গালী যুবক বাহিরে আসিলেন। এই দূরদেশে সন্ধ্যার সময়ে একজন অপরিচিত স্বদেশী লোক দেখিয়া প্রথমে তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং সাদরে কুটীরের ভিতর লইয়া গেলেন। ভিতরে গিয়া আরও দুইটি সন্ন্যাসী দেখিলাম। তিনজনই বাঙ্গালী, একজন আমার পূর্ব্বপরিচিত। অনেক দিন পরে হঠাৎ আজ তাঁহাকে পাইয়া এখানে এই মধুর সন্ধ্যায় প্রাণ ভরিয়া বাঙ্গালা কথা কহিয়া কহিয়া মনের খেদ মিটাইতে লাগিলাম।

পরদিন আমাদের হৃষীকেশের উত্তরে "লছমন-ঝোলা" যাইবার কথা। অতি প্রত্যূষে সন্ন্যাসীদিগের সেই পবিত্র আশ্রমের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। শত-সহস্র সন্ন্যাসী সেখানে বাস করিতেছেন অথচ একটু কলরবমাত্র নাই; দেখিয়া ভারি আশ্চর্য্য বোধ হইল। আমরা তিনজন মানব-সন্তান একত্র থাকিলে মনের স্ফূর্ত্তিতে এমন হট্টগোল লাগাইয়া দিই যে, দিগন্ত কাঁপিয়া উঠে; আর এখানে শত-শত মনুষ্য বৃথাবাক্যব্যয় না করিয়া যে রকম ভাবে দৈনিক কাজ-কর্ম্ম করিয়া যাইতেছেন তাহা দেখিয়া মনে হয়, যেন কতকগুলি পুতুলকে একত্র সাজাইয়া রাখিয়া কলে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, আর সেই সকল নির্ব্বাক্ পুতুলগুলি নিয়ামকের ইচ্ছামত কাজ করিয়া যাইতেছে। আর কিছু না হউক, আজ প্রভাতে এই সন্ন্যাসীদের ব্যবহার দেখিয়া এইটুকু শিক্ষালাভ করা গেল যে, বাক্যসংযম চিত্তসংযমের একটা প্রকৃষ্ট উপায় বটে। দেখিলাম, সন্ন্যাসীরা কেহ স্নান করিয়া মৃদুস্বরে

স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে আপন কুটীরে ফিরিয়া আসিতেছেন, কেহ-বা কুটীর-সম্মুখে পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া যোগাসনে উপবেশন-পূর্ব্বক সূর্য্যোদয়ের প্রতীক্ষা করিতেছেন; কোন স্থানে উলঙ্গ সন্ন্যাসী অনাবৃত প্রান্তরে যোগমগ্ন রহিয়াছেন। এই শীতের দিনে দুইপ্রস্থ পুরু কম্বল গায়ের উপর টানিয়া দিয়াও শীতের জ্বালায় আমরা হী হী করিতেছি, আর ঐ মনুষ্যপ্রবর অনাবৃত নদী-সৈকতে ভয়ানক তুষারপাতের মধ্যে প্রচণ্ড শীতে অনায়াসে বসিয়া আছেন! মানুষ মানুষের কাছে প্রতিপত্তি-লাভের জন্য নানা রকম কঠোরতা অভ্যাস করিতে পারে এবং সেরূপ করিতেও দেখা যায়; জনসাধারণের নিকট সাধু বলিয়া পরিচিত হইবার নিমিত্ত কত জন কত রকমে তাহাদের শরীরকে বিকৃত করিয়া থাকে। অনেক সময়েই আমরা প্রবঞ্চিত হই, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের উপরও অশ্রদ্ধা জন্মিয়া যায়। কিন্তু লোকালয় হইতে এত দূরে, এ ভাবে কঠোরতা সাধন করিবার আর যে-কোন উদ্দেশ্যই থাক, সাধু বলিয়া পরিচিত হইবার প্রলোভন যে তাঁহাদের নাই, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়; বনের বৃক্ষশ্রেণী ও বিহঙ্গম এবং পূতসলিলা ভাগীরথী ভিন্ন আর কেহ এখানে উপস্থিত নাই এবং এই পাষাণ-প্রাচীর-বেষ্টিত স্থানে কোন পার্থিব স্বার্থও যে সিদ্ধ হইবে, তাহারও কোন সম্ভাবনা নাই। তাই এই নির্জ্জন স্থানে সমাহিতচিত্ত সেই সন্ন্যাসীকে দেখিয়া আমার মনে ভক্তির উদ্রেক হইল। আমি তাঁহার মুখে দেবত্বের ছায়া দেখিতে লাগিলাম।

জলধর সেন

সেকালের সুখদুঃখ

নবাব সিরাজদ্দৌলার নাম সকলের কাছেই চিরপরিচিত। তিনি অতি অল্পদিন মাত্র বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার সিংহাসনে বসিয়াছিলেন; কিন্তু সেই অল্পদিনের মধ্যেই স্বদেশে এবং বিদেশে আপন নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। সিরাজদ্দৌলা নাই। তাঁহার সময়ে যে বাঙ্গালা দেশ ছিল, সে বাঙ্গালা দেশও নাই। মোগল বাদশাহেরা "সমুদয় মানব জাতির স্বর্গতুল্য বঙ্গভূমি" বলিয়া অনুশাসনপত্রে যাহার উল্লেখ করিতেন, সে স্বর্গ এখন গৌরবচ্যুত। সে শিল্প নাই, সে বাণিজ্য নাই, জমিদারদিগের সে জীবন-মরণের বিচারক্ষমতা নাই,—সে বাহুবল, সে রণকৌশল—সকলই এখন ইতিহাসগত অতীত কাহিনীতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সিরাজদ্দৌলা যে সময়ের লোক, সে সময় এখন বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছে।

সেকালের সকল চিত্রই এত পুরাতন, এত জরাজীর্ণ, এত অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, এখন আর ভাল করিয়া তাহার সৌন্দর্য্য বিচার করিবার উপায় নাই। বহুদিন হইতে এ দেশ হিন্দু-মুসলমানের জন্মভূমি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে; গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে বহুদিন হইতে হিন্দু-মুসলমান বাহুতে বাহুতে মিলিত হইয়া জীবন-সংগ্রামে জন্মভূমির রণপতাকা বহন করিতেছে। সিরাজদ্দৌলার সময়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ধর্ম্মগত পার্থক্য ছিল; কিন্তু ক্ষমতাগত, পদগৌরবগত কোনই পার্থক্য

ছিল না। মুসলমানের শিষ্টাচার, মুসলমানের প্রয়োজনাতীত-সৌজন্য-পরিপ্লুত, শ্লথ-বিন্যস্ত, শ্রুতিসুমধুর, সুমার্জ্জিত যাবনিক ভাষা এবং পদবিজ্ঞাপক যাবনিক উপাধি গৌরবের সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান সমভাবে ব্যবহার করিতেন।

দিল্লীর বাদসাহ নামমাত্র বাদসাহ; বাঙ্গালার নবাবই বাঙ্গালা দেশের প্রকৃত "মা-বাপ" হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেই নবাব-দরবারে হিন্দু-মুসলমানের কোনরূপ আসনগত পার্থক্য বা ক্ষমতাগত তারতম্য ছিল না, বরং অনেকাংশে হিন্দুদিগেরই বিশেষ প্রাধান্য জন্মিয়াছিল। বিলাসলোলুপ মুসলমান ওমরাহগণ আহার-বিহার লইয়াই সমধিক ব্যস্ত থাকিতেন; কর্ম্মকুশল হিন্দু অধিবাসিগণ, কেহ রাজা, কেহ মন্ত্রী, কেহ কোষাধ্যক্ষ, কেহ-বা সেনানায়ক হইয়া বুদ্ধিবলে, শাসনকৌশলে, বাহুবিক্রমে বাঙ্গালা দেশের ভাগ্য-বিবর্ত্তন করিতেন।

মুসলমান নবাব আপনাকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করিতেন না। বাঙ্গালা দেশই তাঁহার স্বদেশ, এবং বাঙ্গালী জাতিই তাঁহার স্বজাতি হইয়া উঠিয়াছিল। রাজকোষের ধনরত্ন বাঙ্গালা দেশেই সঞ্চিত থাকিত; যাহা ব্যয় হইত, তাহাও বাঙ্গালীগণ কেহ দ্রব্য-বিনিময়ে, কেহ শ্রম-বিনিময়ে কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া লইতে পারিত। দেশের টাকা দেশেই থাকিত, তাহা সাত সমুদ্র তের নদীর পারে চির-নির্ব্বাসিত হইত না।

সেই একদিন আর এই একদিন! আজ সে দিনের বিলুপ্ত কাহিনীর আলোচনা করিতে হইলে অতীতের স্বপ্ন-সমুদ্র সন্তরণ করিয়া বাস্তব রাজ্যের, বাস্তব চিত্রপটের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে; সেকালের চক্ষু লইয়া, সেকালের প্রাণ লইয়া সেকালের

ইতিহাস অধ্যয়ন করিতে হইবে। সে ইতিহাস কেবল হতভাগ্য সিরাজদ্দৌলার মর্ম্ম-বেদনার ইতিহাস নহে,—তাহা আমাদিগের পূজনীয় পিতৃপিতামহের সুখদুঃখের ইতিহাস।

সিরাজদ্দৌলার সময়ে বাঙ্গালা দেশ ১৩ চাক্‌লায় এবং ১,৬৬০ পরগনায় বিভক্ত ছিল।* পরগনাগুলি কোন-না-কোন জমীদারের অধিকারভুক্ত ছিল। তাঁহারা বাহুবলে আপন আপন রাজ্য রক্ষা করিয়া, বিচারবলে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া, যথাকালে নবাব-সরকারে রাজস্ব দিতে পারিলে তাঁহাদের স্বাধীন শক্তির প্রবল প্রতাপে কেহই বাধা দিতে চাহিত না। চাক্‌লায় চাক্‌লায় এক একজন হিন্দু অথবা মুসলমান "ফৌজদার" অর্থাৎ শাসনকর্ত্তা থাকিতেন; তাঁহারা যথাকালে রাজস্ব-সংগ্রহের সাহায্য করা ভিন্ন আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। গঙ্গা, ভাগীরথী, ব্রহ্মপুত্র বাঙ্গালীর বাণিজ্য-ভাণ্ডার বহন করিত; সে বাণিজ্যে জেতৃ-বিজিত বলিয়া শুল্কদানের কোনরূপ তারতম্য ছিল না। মুসলমান নবাব কোন কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে পাত্রমিত্র লইয়া দরবার করিতেন, কিন্তু আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য্যে প্রায়ই মনোনিবেশ করিবার অবসর পাইতেন না। জগৎ-শেঠের ইতিহাস-বিখ্যাত বিস্তৃত প্রাঙ্গণে বাদশাহের নামে স্বর্ণ- ও রৌপ্য-মুদ্রা মুদ্রিত হইত; পরগনাধিপতি জমীদারগণ জগৎ-শেঠের কোষাগারে রাজস্ব ঢালিয়া দিয়া মুক্তিপত্র গ্রহণ করিতেন, এবং কখন কখন শিষ্টাচারের অনুরোধে রাজধানীতে আসিয়া কাবা-চাপকান পরিয়া, উষ্ণীষ বাঁধিয়া, জানু পাতিয়া মুসলমানী প্রথায় নবাব-দরবারে সমাসীন হইতেন।

* Grant's Analysis of Finances of Bengal.

দেশে যে অত্যাচার-অবিচার ছিল না তাহা নহে; বরং অনেক সময়েই দেশে ভয়ানক অরাজকতা উপস্থিত হইত। কিন্তু সে অরাজকতায় জমীদার ও মহাজন যতই উৎপীড়িত হন না কেন, কৃষক-কুটীরে তাহার ছায়াস্পর্শ হইত না। কৃষক যথাকালে হল চালনা করিয়া, যথা-প্রাপ্য শস্য সঞ্চয় করিয়া, স্ত্রীপুত্র লইয়া যথাসম্ভব নিরুদ্বেগেই কালযাপন করিত। দেশে দস্যু-তস্করের উৎপীড়নের অভাব ছিল না, কিন্তু দেশের লোকের অস্ত্রশস্ত্র-ব্যবহারেও কোনরূপ নিষেধ ছিল না। সম্ভ্রান্ত বংশের যুবকেরাও লাঠি-তরবারি চালনা করিতে জানিতেন। দস্যু-তস্করের উপদ্রব হইলে গ্রামের লোকে দল বাঁধিয়া, রাত্রি জাগিয়া, লাঠি ঘুরাইয়া, মশাল জ্বালাইয়া, তরবারি ভাঁজিয়া, বর্শা চালাইয়া আত্মরক্ষা করিত। দস্যু-তস্কর ধরা পড়িলে গ্রামবাসীরাই দশজনে মিলিয়া প্রয়োজনাতীত উত্তম-মধ্যম দিয়া সংক্ষেপে বিচার-কার্য্য সমাধা করিয়া ফেলিত।

ইহাতে যেমন দুঃখ ছিল, সেইরূপ সুখও ছিল। আজকাল দস্যু-তস্করে উপদ্রব করিলে কেহ কাহারও সাহায্য করিতে বাহির হয় না; অসহায় গৃহস্থ ঘরে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতে থাকে! দস্যুদল সর্ব্বস্ব লুটিয়া, মানসম্ভ্রম পদদলিত করিয়া, হেলিতে দুলিতে ধীরে ধীরে বহুদূরে চলিয়া গেলে গৃহস্থ পঞ্চায়েৎ ডাকিয়া থানায় গিয়া পুলিসে সংবাদ দিয়া আসে। দারোগা, বক্সী, কনেষ্টবল এবং চৌকীদার মহাশয় অবসর-অনুসারে একে একে শুভাগমন করিলে গৃহস্থ ব্যস্তসমস্ত হইয়া একহাতে চোখের জল মুছিতে মুছিতে, আর একহাতে তাঁহাদের যথাযোগ্য মর্য্যাদা-রক্ষার জন্য ঋণ-গ্রহণে বাহির হয়। দস্যু-তস্কর ধরা পড়ুক বা না পড়ুক,

সন্দেহে পড়িয়া অনেক গরীবকে নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয়; দুই-এক স্থলে মিথ্যা অভিযোগ বলিয়া গৃহস্থকে রাজদ্বারে বিলক্ষণ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়। সেকালে সুবিচারের সূক্ষ্মযন্ত্র ছিল না, সুতরাং কাহাকেও বিচার-বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইত না!

অনেক বিষয়ে অসুবিধা ছিল, কিন্তু অনেক বিষয়ে সুবিধাও ছিল। পথ-ঘাট ছিল না, ত্বরিত গমনের সদুপায় ছিল না, দাতব্য-চিকিৎসালয় এবং বিনামূল্যে বিতরণীয় ঔষধালয় ছিল না;—কিন্তু লোকের ধনধান্য ছিল, স্বাস্থ্য ও বাহুবল ছিল; হা অন্ন! হা অন্ন! করিয়া দেশে দেশে ছুটিয়া বেড়াইবার বিশেষ প্রয়োজন হইত না। লোকে ঘরে বসিয়া হাতে-লেখা তুলট-কাগজের রামায়ণ মহাভারত পড়িত, অবসর-সময়ে কবিকঙ্কণের চণ্ডীর গান গাহিত, এবং আপন আপন বাসস্থলে নিপুণভাবে, প্রসন্নচিত্তে আপন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। অভাব অল্প হইলে দুঃখও অল্প হইয়া থাকে। সভ্যতাবিরোধী সুচিক্কণ সূক্ষ্ম-বস্ত্রের জন্য সকলেই লালায়িত হইত না; দেশের মোটা ভাত মোটা কাপড়েই অধিকাংশ লোকের এক রকম দিন চলিয়া যাইত। পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের অথবা তাঁহার বেত্রদণ্ডের মহিমায় যথাসম্ভব বিদ্যাভ্যাস করিয়া বালকেরা অবসর-সময়ে মাঠে মাঠে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইত; কখনও-বা ঘোড়া ধরিয়া তাহার অনাবৃত পৃষ্ঠে নিতান্ত অসঙ্গতরূপে একজনের স্থানে দুই-তিনজন চাপিয়া বসিত; কখনও-বা বর্ষার জলে—নদ, নদী, খাল, বিলে ঝাঁপাঝাঁপি করিয়া সাঁতার কাটিত; সময়ে-অসময়ে গৃহস্থের গরু-বাছুর চরাইয়া, হাট-বাজার বহিয়া, দিনশেষে ঠাকুরমার উপকথায় হুঁ দিতে দিতে স্নেহের কোলে ঘুমাইয়া

পড়িত। যুবকদল দিবসে তাস-পাশা খেলিয়া, দাবা-ব'ড়ে টিপিয়া, বৈকালে লাঠি-তরবারি ভাঁজিত; সন্ধ্যা-সমাগমে সযত্ন-বিন্যস্ত লম্বা কোঁচা দোলাইয়া, অনাবৃত দেহ-সৌষ্ঠবের গৌরব বাড়াইবার জন্য কাঁধের উপর রঙ্গিন গামছা ছড়াইয়া দিয়া, বাব্‌রী-চুলে চিরুনী গুঁজিয়া, শুক-সারি, অথবা নিতান্ত অভাবপক্ষে একটা পোষা বুল্‌বুল্, হাতে লইয়া তাম্বূল-রাগ-রঞ্জিত অধরোষ্ঠে মৃদুমন্দ শিস্ দিতে দিতে পাড়ায় বেড়াইতে বাহির হইত। বৃদ্ধেরা গৃহকর্ম্ম সারিয়া, পর্য্যাপ্ত ভোজনের পর তৈলাক্ত স্নিগ্ধতনু দিবা-নিদ্রায় সমাহিত করিয়া, সায়াহ্নে তামাকু সেবনের জন্য চণ্ডীমণ্ডপে, নদী-সৈকতে অথবা বৃক্ষতলে সমবেত হইয়া দেশের কথা, দশের কথা, কত কি আবশ্যক-অনাবশ্যক বিষয়ের মীমাংসা করিয়া সন্ধ্যার পর হরিসঙ্কীর্ত্তনে অথবা পুরাণশ্রবণে ভক্তি-গদ্‌গদ-হৃদয়ে নিমগ্ন হইতেন। সমাজের যাঁহারা লক্ষ্মীরূপিণী অর্দ্ধাঙ্গিনী, তাঁহারা দেবতা, ব্রাহ্মণ, অতিথি ও পোষ্যবর্গের সেবা করিয়া, সময়ে-অসময়ে ছেলে ঠেঙ্গাইয়া, নথ নাড়িয়া, চুল খুলিয়া সন্ধ্যার শীতল বাতাসে পুকুর-ঘাট আলো করিয়া বসিতেন; কত কথা, কত রঙ্গরস—তাহার সঙ্গে প্রৌঢ়ার সগর্ব্ব-হস্তসঞ্চালন, নবীনার অবগুণ্ঠন-জড়িত অস্ফুট সখী-সম্ভাষণ, এবং স্থবিরার স্খলদ্‌বচনে শিবমহিম্নস্তোত্রের বিকৃত আবৃত্তি সান্ধ্য সম্মিলনকে কতই মধুময় করিয়া তুলিত!

সে দিন আর নাই; এখন আমরা সভ্য হইয়াছি। বালকেরা দন্তোদ্গমের পূর্ব্বেই ক, খ ধরিয়া পাঁচ ঘণ্টা স্কুলের কঠিন কাষ্ঠাসনে কখন দাঁড়াইয়া, কখনও-বা বসিয়া, বৈকালে গৃহশিক্ষকের তীব্র তাড়না সহ্য করিয়া আহার না করিতেই ঘুমাইয়া পড়ে;

যুবারা হা অন্ন! হা অন্ন! করিয়া চাকরীর আশায়, উমেদাবীর আশায়, কখনও-বা শুধু একখানি প্রশংসাপত্র পাইবার আশায় দেশে-দেশে ছুটাছুটি করিয়া অল্প দিনেই অধ্যয়নক্লিষ্ট দুর্ব্বল দেহে নিতান্ত অসময়েই স্থবিরত্ব লাভ করে; বৃদ্ধেরা অনাবশ্যক উৎসাহে সেকালের জীর্ণ খুঁটার সঙ্গে উড্ডীয়মান জাতীয় জীবনকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য পাড়ায়-পাড়ায় দলাদলির বৈঠক করিয়া ক্ষুধাবৃদ্ধি করেন; আর সমাজের যাঁহারা লক্ষ্মীরূপিণী, সেই অর্দ্ধাঙ্গিনীগণ অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠনে স্বামিপুত্রের সঙ্গে দেশে-দেশে ফিরিয়া কেবল অনাবশ্যকরূপে চিকিৎসকের এবং স্বর্ণকারের ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়েন। এ সকল যদি একালের সুখের চিত্র বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারি, তবে সেকালে দেশের লোকের সুখশান্তির একেবারেই অভাব ছিল বলিয়া উপহাস করা শোভা পায় না।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

স্বদেশ-মন্ত্র

হে ভারত! ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয়-সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই "মায়ের" জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট্ মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।

হে বীর! সাহস অবলম্বন কর। সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী, আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভাবতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিনরাত, "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

স্বামী বিবেকানন্দ

গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমে

হৃষীকেশের গঙ্গা মনে আছে? সেই নির্ম্মল নীলাভ জল—যার মধ্যে দশ হাত গভীরের মাছের পাখ্‌না গোণা যায়, সেই অপূর্ব্ব সুস্বাদু হিমশীতল "গাঙ্গং বারি মনোহারি" আর সেই অদ্ভুত "হর্ হর্ হর্" তরঙ্গোত্থ ধ্বনি, সাম্‌নে গিরিনির্ঝরের "হর্ হর্" প্রতিধ্বনি! সে গঙ্গাজল-প্রীতি, গঙ্গার মহিমা, সে গাঙ্গ বারির বৈরাগ্যপ্রদ স্পর্শ, সে হিমালয়বাহিনী গঙ্গা, শ্রীনগর, টিহিরি, উত্তরকাশী, গঙ্গোত্রী, তোমাদের কেউ কেউ গোমুখী পর্য্যন্ত দেখেচ; কিন্তু আমাদের কর্দ্দমাবিলা, হরগাত্র-বিঘর্ষণশুভ্রা, সহস্রপোতবক্ষা এ কলিকাতার গঙ্গায় কি এক টান আছে, তা ভোলবার নয়। সে কি স্বদেশপ্রিয়তা বা বাল্যসংস্কার—কে জানে? হিন্দুর সঙ্গে মায়ের সঙ্গে এ কি সম্বন্ধ!—কুসংস্কার কি? হবে, গঙ্গা গঙ্গা কোরে জন্ম কাটায়, গঙ্গাজলে মরে, দূর-দূরান্তরের লোক গঙ্গাজল নিয়ে যায়, তাম্রপাত্রে যত্ন কোরে রাখে, পালপার্ব্বণে বিন্দু-বিন্দু পান করে। রাজারাজড়ারা ঘড়া পুরে রাখে, কত অর্থব্যয় কোরে গঙ্গোত্রীর জল রামেশ্বরের উপর নিয়ে গিয়ে চড়ায়; হিন্দু বিদেশে যায়—রেঙ্গুন, জাভা, হংকং, জাঞ্জীবর, মাডাগাস্কর, সুয়েজ, এডেন, মাল্টা—সঙ্গে গঙ্গাজল, সঙ্গে গীতা। গীতা-গঙ্গা—হিঁদুর হিঁদুয়ানি। গেল বারে আমিও একটু নিয়েছিলুম—কি জানি! বাগে পেলেই এক-আধ বিন্দু পান কর্‌তাম। পান কর্‌লেই

কিন্তু সে পাশ্চাত্ত্য জনস্রোতের মধ্যে, সভ্যতার কল্লোলের মধ্যে, সে কোটী কোটী মানবের উন্মত্তপ্রায় দ্রুতপদসঞ্চারের মধ্যে মন যেন স্থির হয়ে যেত। সে জনস্রোত, সে রজোগুণের আস্ফালন, সে পদে পদে প্রতিদ্বন্দ্বিসংঘর্ষ, সে বিলাসক্ষেত্র, অমরাবতীসম পারিস, লণ্ডন, নিউইয়র্ক, বার্লিন, রোম—সব লোপ হয়ে যেত, আর শুন্‌তাম—সেই "হর্ হর্ হর্," দেখ্‌তাম—সেই হিমালয়-ক্রোড়স্থ বিজন বিপিন, আর কল্লোলিনী সুরতরঙ্গিণী যেন হৃদয়ে মস্তকে শিরায়-শিরায় সঞ্চার কর্‌চেন, আর গর্জ্জে গর্জ্জে ডাক্‌চেন—"হর্ হর্ হর্!"

আপনার লোকের একটি রূপ থাকে, তেমন আর কোথাও দেখা যায় না। নিজের খ্যাঁদা-বোঁচা ভাই-বোন-ছেলে-মেয়ের চেয়ে গন্ধর্ব্বলোকেও সুন্দর পাওয়া যাবে না সত্য। কিন্তু গন্ধর্ব্বলোক বেড়িয়েও যদি আপনার লোককে যথার্থ সুন্দর পাওয়া যায়, সে আহ্লাদ রাখ্‌বার কি আর জায়গা থাকে? এই অনন্তশষ্পশ্যামলা সহস্রস্রোতস্বতীমাল্যধারিণী বাঙ্গালা দেশের একটি রূপ আছে। সে রূপ—কিছু আছে মলয়ালমে (মালাবারে), আর কিছু কাশ্মীরে। জলে কি আর রূপ নাই? জলে জলময়, মুষলধারে বৃষ্টি কচুর পাতার উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্চে, রাশি রাশি তাল-নারিকেল-খেজুরের মাথা একটু অবনত হয়ে সে ধারাসম্পাত বইচে, চারি দিকে ভেকের ঘর্ঘর আওয়াজ,—এতে কি রূপ নাই?

আর আমাদের গঙ্গার কিনারা,—বিদেশ থেকে না এলে, ডায়মণ্ড-হারবারের মুখ দিয়ে গঙ্গায় প্রবেশ না কর্‌লে, সে বোঝা যায় না। সে নীল নীল আকাশ, তার কোলে কালো মেঘ, তার কোলে সাদাটে মেঘ, সোণালি কিনারাদার, তার নীচে

ঝোপ ঝোপ তাল-নারিকেল-খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ চামরের মত হেলচে, তার নীচে ফিকে, ঘন, ঈষৎ পীতাভ একটু কালো-মেশানো ইত্যাদি হরেক রকম সবুজের কাঁড়ী-ঢালা আঁব-নীচু-জাম-কাঁটাল,—পাতাই পাতা—গাছ ডাল পালা আর দেখা যাচ্চে না, আশে-পাশে ঝাড় ঝাড় বাঁশ হেল্‌চে দুল্‌চে, আর সকলের নীচে—যার কাছে ইয়ারকান্দি ইরানি তুর্কিস্তানি গাল্‌চে-দুল্‌চে কোথায় হার মেনে যায়—সেই ঘাস, যতদূর চাও সেই শ্যাম-শ্যাম ঘাস, কে যেন ছেঁটে-ছুঁটে ঠিক কোরে রেখেচে; জলের কিনারা পর্য্যন্ত সেই ঘাস; গঙ্গার মৃদুমন্দ হিল্লোল যে অবধি জমিকে ঢেকেচে, যে অবধি অল্প অল্প লীলাময় ধাক্কা দিচ্চে, সে অবধি ঘাসে-আঁটা। তার নীচে আমাদের গঙ্গাজল। আবার পায়ের নীচে থেকে দেখ, ক্রমে উপরে যাও, উপর উপর মাথার উপর পর্য্যন্ত, একটি রেখার মধ্যে এত রঙের খেলা, একটি রঙে এত রকমারি, আর কোথাও দেখেচ? বলি, রঙের নেশা ধরেচে কখন কি—যে রঙের নেশায় পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে, মৌমাছি ফুলের গারদে অনাহারে মরে? হুঁ, বলি—এই বেলা এ গঙ্গা-মার শোভা যা দেখ্‌বার দেখে নাও, আর বড়-একটা-কিছু থাকচে না। দৈত্য-দানবের হাতে পড়ে এ-সব যাবে। ঐ ঘাসের যায়গায় উঠ্‌বেন ইটের পাঁজা, আর নাব্‌বেন ইটখোলার গর্ত্তকুল। যেখানে গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউগুলি ঘাসের সঙ্গে খেলা কর্‌চে, সেখানে দাঁড়াবেন—পাট-বোঝাই ফ্ল্যাট, আর সেই গাধাবোট; আর ঐ তাল-তমাল-আঁব-নীচুর রঙ, ঐ নীল আকাশ, মেঘের বাহার, ও-সব কি আর দেখ্‌তে পাবে? দেখ্‌বে—পাথুরে

কয়লার ধোঁয়া আর তার মাঝে মাঝে ভূতের মত অস্পষ্ট দাঁড়িয়ে আচেন কলের চিম্‌নি!

কি সুন্দর! সাম্‌নে যতদূর দৃষ্টি যায়, ঘন নীলজল—তরঙ্গায়িত, ফেনিল,—বায়ুর সঙ্গে তালে তালে নাচ্চে। পেছনে আমাদের গঙ্গাজল, সেই বিভূতিভূষণা—সেই "গঙ্গাফেনসিতা জটা পশুপতেঃ।" সে জল অপেক্ষাকৃত স্থির, সাম্‌নে মধ্যবর্ত্তী রেখা। জাহাজ এক বার সাদা জলের এক বার কালো জলের উপর উঠ্‌চে। ঐ সাদা জল শেষ হয়ে গেল। এবার খালি নীলাম্বু, সাম্‌নে-পেছনে আশে-পাশে খালি নীল নীল নীল জল, খালি তরঙ্গভঙ্গ। নীলকেশ, নীলকান্ত অঙ্গ-আভা, নীল-পট্টবাস-পরিধান! কোটী কোটী অসুর দেবভয়ে সমুদ্রের তলায় লুকিয়েছিল; আজ তাদের সুযোগ, আজ তাদের বরুণ সহায়, পবনদেব সাথী; মহাগর্জ্জন, বিকট-হুঙ্কার, ফেনময়-অট্টহাস দৈত্যকুল আজ মহোদধির উপর রণতাণ্ডবে মত্ত হয়েচে! তার মাঝে আমাদের অর্ণবপোত; পোতমধ্যে যে জাতি সসাগর-ধরাপতি, সেই জাতির নরনারী—বিচিত্র বেশভূষা, স্নিগ্ধ চন্দ্রের ন্যায় বর্ণ, মূর্ত্তিমান আত্মনির্ভর, আত্মপ্রত্যয়, কৃষ্ণবর্ণের নিকট দর্প ও দম্ভের ছবির ন্যায় প্রতীয়মান—সগর্ব্বে পাদচারণ করিতেছে। উপরে বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন আকাশের জীমূতমন্দ্র, চারি দিকে শুভ্রশির তরঙ্গকুলের লম্ফ-ঝম্ফ গুরুগর্জ্জন, পোতশ্রেষ্ঠের সমুদ্র-বল-উপেক্ষাকারী মহাযন্ত্রের হুহুঙ্কার—সে এক বিরাট্ সম্মিলন—তন্দ্রাচ্ছন্নের ন্যায় বিস্ময়রসে আপ্লুত হইয়া ইহাই শুনিতেছি।

স্বামী বিবেকানন্দ

জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি

"নানান্ দেশের নানান্ ভাষা,
বিনা স্বদেশের ভাষা পূরে কি আশা ?"

বঙ্গভাষা আজ আর উপেক্ষিত নহে,—বাঙ্গালী বলিয়া যাঁহারা গর্ব্ব করেন, তাঁহাদের নিকট বঙ্গভাষা বরং অপেক্ষিত। যখন বাঙ্গালীর ছেলে, বঙ্গভূমির বক্ষের উপর দাঁড়াইয়া বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলা, বা বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ অধ্যয়ন করাকে লজ্জাজনক, কতকটা-বা প্রত্যবায়জনক মনে করিতেন, সে দুর্দ্দিন কাটিয়া গিয়াছে, সে মোহ ভাঙ্গিয়াছে।

মহাকবি কৃত্তিবাস হইতে কবিবর রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বহু মনস্বী বঙ্গসন্তান বঙ্গবাণীর স্বর্ণমন্দির-রচনায় সাহায্য করিয়াছেন; রাজা রামমোহন, প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর, অমর বঙ্কিমচন্দ্র, চিন্তাশীল অক্ষয়কুমার প্রভৃতি বহু প্রতিভাশালী সারস্বতগণ সেই মন্দির-গাত্র নানাবিধ শিল্পসৌন্দর্য্যে খচিত করিয়াছেন।—বঙ্গভাষা এখন বাঙ্গালীর একটা প্রকৃত স্পর্দ্ধার সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যে জাতির নিজের পরিচয়যোগ্য ভাষা নাই, বা নিজের জাতীয় সাহিত্য নাই, সে জাতি বড়ই দুর্ভাগ্য। বাঙ্গালী ভারতের যে প্রাচীন মহা-বংশের ভগ্নাংশ, সেই প্রাচীন আর্য্য জাতির ভাষা-এবং সাহিত্য-ভাণ্ডার অনন্ত ও অমূল্য রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ। সুতরাং বাঙ্গালীকে নিজের জাতীয় সাহিত্য-গঠনে সম্পূর্ণরূপে পরের প্রত্যাশী হইতে হয় নাই। জগতের অপর অপর শিক্ষিত

ও সমুন্নত জাতির সমক্ষে, নিজের জাতীয় সাহিত্য লইয়া দাঁড়াইবার যোগ্যতায় বাঙ্গালী এখন বঞ্চিত নহে,—এ কথা সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া বর্ত্তমানে বঙ্গভাষার যতটা শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে, ইহাই যে বর্দ্ধিষ্ণু বঙ্গবাসীর পক্ষে পর্য্যাপ্ত, এ কথা আমি কদাচ স্বীকার করিতে পারি না।

ক্ষেত্র-কর্ষণ পরিশ্রম-সাধ্য কার্য্য হইলেও, সেই কর্ষিত ক্ষেত্রে বীজ-বপন ও উপযুক্ত সেচনাদির দ্বারা অঙ্কুরিত বীজের রক্ষণ এবং পরিবর্ত্তন অধিকতর পরিশ্রম-সাধ্য ও বিবেচনা-সাপেক্ষ। অঙ্কুরিত শস্যের আপদ্ অনেক। সেই সমস্ত আপদ্ হইতে রক্ষা করিয়া শস্যকে ফলোন্মুখ করিয়া তোলা বড়ই দক্ষতা-সাপেক্ষ। যে সময়ে জল-সেচনের প্রয়োজন তখন জল, যখন আতপ-নিবারণের প্রয়োজন তখন ছায়ার ব্যবস্থা আবশ্যক। এই সমুদয়ের কোন একটির অভাবেই কর্ষিত ভূমি শস্যশালিনী হইতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের বঙ্গভাষার সম্বন্ধেও ঐ রীতির অনুসরণ বিধেয়। বহুকাল, বহুশত বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম-সহকারে কৃত্তিবাস প্রভৃতি সাধকগণ তাঁহাদের আরাধ্য বঙ্গভাষার ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী অনেক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি সেই কর্ষিত ভূমির উর্ব্বরতা-বর্দ্ধনের নিমিত্ত নানা আয়াস করিয়াছেন। এখন দেশের শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলের সেই ভূমির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে; সকলেই সুফলের আশায় সেই ভূমির দিকে লোলুপ নয়নে চাহিতেছেন; কত উচ্চ আশায় উৎফুল্ল হইয়া নিজের মাতৃভাষার প্রতি ভক্তি- ও আদর-সহকারে দৃষ্টিপাত করিতেছেন; এমন সময়ে—দেশবাসীর এই আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ, উৎকণ্ঠাপূর্ণ সময়ে—ঐ কর্ষিত ভূমিতে বীজ বপন

করিতে হইবে। সুতরাং তাহাতে যে কত সতর্কতার প্রয়োজন, কত পূর্ব্বাপর বিবেচনার প্রয়োজন, তাহা বঙ্গবাসিমাত্রেরই বিশেষ বিবেচ্য। এত দিনের চেষ্টায় যে বঙ্গসাহিত্যের ক্ষেত্র পরিপাটী-রূপে প্রস্তুত হইয়াছে, আমাদের এবং আমাদের ভবিষ্যদ্-বংশধরগণের অবিবেচনার ফলে তাহা যেন নষ্ট না হয়—তাহার উর্ব্বরতা যেন কতকগুলি আবর্জ্জনাজনিত ক্ষারদাহে দগ্ধীভূত না হয়, ইহাই আমার অভিলাষ।

"বিশেষ বিবেচ্য" কেন বলিলাম, তাহাই বিবৃত করিতেছি। এত কাল অর্থাৎ প্রায় গত সার্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া বঙ্গভাষা যে ভাবে, যে গতিতে বঙ্গীয় জনসমাজে প্রসার লাভ করিতেছিল, এখন বঙ্গভাষার সেই গতির ক্ষিপ্রতা ক্রমেই বাড়িতেছে। পূর্ব্বে ছিল, যাঁহারা শিক্ষিত—কি প্রতীচ্য, কি প্রাচ্য এই উভয়বিধ শিক্ষার কোন একটিতে যাঁহারা সম্পন্ন—বঙ্গভাষার কতিপয় কমনীয় গ্রন্থ কেবল তাঁহাদের—সেই অল্প সংখ্যক ব্যক্তিদের—অবসর-বিনোদনের উপাদানমাত্র হইত। কার্য্যান্তরব্যাবৃত চিত্তকে কদাচিৎ প্রসন্ন করিবার জন্য তাঁহারা বঙ্গভাষার গ্রন্থাবলী পাঠ করিতেন। প্রকৃত পক্ষে যাহাদের লইয়া বঙ্গদেশ, যাহাদিগকে বাদ দিলে বাঙ্গালা দেশের প্রায় সমস্তই বাদ পড়ে, সেই বঙ্গের আপামর সাধারণের মধ্যে বঙ্গভাষার আদর কতটা ছিল? একপ্রকার ছিলই না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কৃত্তিবাস-কাশীদাস ব্যতীত অপর কয়জন বঙ্গসাহিত্যরথের নাম বঙ্গের জনসাধারণের মধ্যে সুপরিচিত? শিক্ষিত জনসঙ্ঘের সংখ্যা সাত কোটি বঙ্গবাসীর তুলনায় মুষ্টিমেয় বলিলেও অতিরঞ্জিত হয় না। এই মুষ্টিমেয় সমাজে যে বঙ্গভাষা এত দিন আবদ্ধ ছিল,

এখন সেই বঙ্গভাষা অতি ক্ষিপ্রগতিতে বাঙ্গালার সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রসার লাভ করিতেছে। সুতরাং এই সময়ে ভাষা যাহাতে সংযত-চরণে চলে, যাহাতে উচ্ছৃঙ্খল না হয়, সে পক্ষে বঙ্গের জাতীয় জীবনের উদ্বোধন-কর্ত্তাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আর সেই সঙ্গেই, আমাদের সুন্দরী মাতৃভাষা কি উপায়ে সুন্দরীতমা হইতে পারে, তাহাও ভাবিতে হইবে। কেবল গীতিকাব্য, মহাকাব্য বা গল্পগুচ্ছে জাতীয় সাহিত্য পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না। জাতীয় সাহিত্যের বিরাট্ সৌধের চত্বরে শিল্প, বিজ্ঞান, বার্ত্তাশাস্ত্র, সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি—সর্ব্ব প্রকার রত্নের সমাবেশ আবশ্যক। সর্ব্ববিধ কলার বিলাসে জাতীয় সাহিত্য-মন্দির বিলসিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যথা তাহাকে অসঙ্কোচে 'জাতীয় সাহিত্য' বলিতে পারা যায় না। বর্ত্তমান কালে, যখন বঙ্গভাষার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি অল্পবিস্তর নিপতিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, তখন বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক ঐ ভাষার গতিকে বঙ্গবাসীর ভবিষ্যৎ অভ্যুদয়ের অনুকূলভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া লইতে হইবে। জাতীয়তা গঠন করিতে হইলে জাতীয় সাহিত্য-গঠন সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। সেই জাতীয় সাহিত্য কিরূপভাবে গঠিত হইলে আমাদের মঙ্গল হইবে, কি প্রকারে, কোন্ দিকে জাতীয় সাহিত্যের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে ভবিষ্যতে আমাদের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে, সেই সম্বন্ধেই আমি দুই-একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

আমাদের দেশে "শিক্ষিত" বলিতে আমরা কি বুঝি? সর্ব্বসাধারণে কোন্ সম্প্রদায়কে "শিক্ষিত" বলিয়া স্বীকার করে? বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশে শিক্ষার কেন্দ্র মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়।

যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন, দেশবাসিগণ অসঙ্কোচে তাঁহাদিগকেই শিক্ষিত আখ্যা এবং শিক্ষিতের প্রাপ্য সম্মান প্রদান করেন। ভারতবর্ষের নানা বিপ্লবের মধ্যেও যাঁহারা পরম যত্নে বুকে বুকে রাখিয়া আমাদের প্রাচীন শাস্ত্ররাজি রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, সেই সংস্কৃতব্যবসায়ী অধ্যাপকবর্গের আসন দেশবাসী এখনও অনেক উচ্চে প্রদান করিয়া থাকেন; যদি অধ্যাপকবৃন্দ আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন, তবে উত্তর-কালেও তাঁহারা সে উচ্চাসনের অধিকারী থাকিবেন সত্য; কিন্তু সংখ্যাগত হিসাব ধরিলে, বঙ্গের প্রায় প্রতিপল্লীতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সদ্ভাব পরিদৃষ্ট হয়। যে স্থানে হয়ত পূর্ব্বে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার আদৌ প্রচার ছিল না, বর্ত্তমানে সে স্থানেও উক্ত শিক্ষার প্রতি লোকের আদর দেখা যাইতেছে। যেরূপ ভাবে গত কতিপয় বৎসরের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার বহুপ্রচার ঘটিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, অদূরবর্ত্তী সময়ে যেখানে ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তির অভাব, এমন পল্লী বঙ্গে থাকিবে না। সুতরাং বঙ্গের ভবিষ্যৎ জন-মত পরিচালনের এবং জনসাধারণের মত-গঠনের ভার উক্ত শিক্ষিতগণের হস্তেই ক্রমে ন্যস্ত হইবে।

যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব জন্মভূমিতে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন, যদি অকপটভাবে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিবেশীদিগের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীসমূহের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারিবেন। তাঁহাদের পল্লীবাসিগণ তাঁহাদিগের নিকটে অনেক আশা করেন। যে যে পল্লীতে তাঁহাদের বাস, সেই সেই পল্লীতে এবং তৎ তৎ সমাজের সর্ব্ববিধ উৎকর্ষাপকর্ষের জন্য তাঁহারাই অনেকটা দায়ী। আর্থিক,

সামাজিক, নৈতিক এবং স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় উন্নতির জন্য দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় অনেকটা দায়ী, কেন না লোকের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস—যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বাদ দিলে মানুষের আর কিছুই থাকে না, সেই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস—আকর্ষণপূর্ব্বক, যদি তাঁহারা বিবেচনা-সহকারে লোক-মত পরিচালনা করিতে পারেন, তবে তাঁহাদের প্রতিবেশীরা অম্লান মনে তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে চলিবে। যে যে গুণ থাকিলে মানুষের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ভাজন হওয়া যায়, শিক্ষা-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিতগণকে সেই সেই গুণে সম্পন্ন হইতে হইবে। দয়া, সমবেদনা, পরদুঃখকাতরতা, সত্য-প্রিয়তা, বিনীতভাব প্রভৃতি স্বর্গীয় সম্পদে হৃদয়কে সম্পন্ন করিতে পারিলেই প্রকৃত পক্ষে শিক্ষার ফল ফলিয়াছে, বলা যাইতে পারে। অন্যথা কেবল পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতাকেই শিক্ষার চরমফলপ্রাপ্তি বলিতে পারি না।

স্বজাতিকে আত্মমতের অনুকূল করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে স্বজাতির শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আকর্ষণ আবশ্যক, এ কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কেবল সামাজিক বা কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনে সমাজের প্রকৃত মঙ্গল-সাধন হয় না। প্রাত্যহিক কার্য্যের যেমন একটা তালিকা অন্ততঃ মনে মনে থাকিলেও কার্য্যের শৃঙ্খলা হয়,—সময়ের সদ্ব্যবহার হয়, তদ্রূপ জাতীয় সাহিত্য যদি সুগঠিত হয়, তবে সেই সাহিত্যের দ্বারা জাতীয়তা-গঠনের পক্ষেও বিশেষ সহায়তা ঘটে। এই জাতীয় সাহিত্য-গঠনের প্রকৃত ভার এখন ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের হস্তেই ন্যস্ত হইতেছে। অবকাশ মত কোন ভাবুক ভাবের স্রোতে ভাসিয়া দু'একটি কবিতা রচনা করিলেন, বা চিন্তাপূর্ণ দু'একটা

প্রবন্ধ পাঠ করিলেন, তাহাতে জাতীয় সাহিত্যের প্রকৃত গঠন হইবে না। তপস্যার ন্যায় একাগ্রতাপূর্ণ চেষ্টায় ঐ সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষায়ও বঙ্গভাষার অধ্যাপনা হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যাঁহারা শিক্ষালাভ করিতেছেন, তাঁহারা উভয়বিধ শিক্ষায় শিক্ষিত হইতেছেন। বঙ্গভাষায়ও তাঁহারা পাণ্ডিত্যসম্পন্ন হইতেছেন। এই ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের হস্তে বঙ্গভাষার ভবিষ্যৎ উন্নতির ভার নিহিত। সুতরাং তাঁহাদের এ সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে দু'একটি কথা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

এই ইংরাজী-শিক্ষিতগণ যদি একটু আদরের সহিত স্ব স্ব মাতৃভাষার আলোচনা করেন, মাতৃভাষারই হিতকল্পে মাতৃভাষার আলোচনা করেন, তবে তাহাতে সুফলের আশা অনেক! দেশের যাঁহারা উচ্চশিক্ষাবর্জ্জিত, সেই জনসাধারণকে তাঁহারা অতি অল্প আয়াসেই মাতৃভাষার প্রতি অধিকতর আগ্রহ-সম্পন্ন করিতে পারিবেন; কেন-না, তাঁহারাই প্রকৃত পক্ষে সাধারণ মত-গঠনের ও সাধারণ সদনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা বা এক হিসাবে কর্ত্তা হইবেন। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করা এবং সেই সঙ্গে ঐ মাতৃভাষাকে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বরেণ্য করিয়া তোলা ইংরাজী-শিক্ষিতগণের সর্ব্ব-প্রথম কর্ত্তব্য; কেন-না, তাঁহারা প্রতীচ্য ভাষায় পারদর্শী হইয়া সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন; লোকসমাজের স্পৃহণীয় আসনে উপবেশন করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতেছেন,—তাঁহাদের কথার, তাঁহাদের আচার-ব্যবহারের, তাঁহাদের আচরিত রীতিনীতির উপর জন-সাধারণের মঙ্গলামঙ্গল নিহিত। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে অতি

সহজেই সাধারণকে স্ব স্ব মতের বশবর্ত্তী করিতে পারিবেন। সুতরাং তাঁহাদের কর্ত্তব্য বড়ই গুরুতর। তাঁহাদের সামান্য স্খলনে, সামান্য উপেক্ষায়, একটি মহতী জাতির—উদীয়মান জাতিরও—স্খলন বা অধঃপতন হইতে পারে।

"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।"

এই মহাবাক্য স্মরণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পদক্ষেপ করিতে হইবে। তরণীর কর্ণধারের অনেক সতর্কতা আবশ্যক, অন্যথা নিমজ্জনের আশঙ্কা বলবতী।

যাহারা বঙ্গের অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষাপ্রাপ্ত, তাহারা যে ইংরাজী শিক্ষা করিয়া পরে আবার বঙ্গভাষা শিক্ষা করিবে, এরূপ আশা কদাচ করা যায় না। তাহাদিগকে—সেই mass অর্থাৎ সাধারণ জনসঙ্ঘকে—সৎপথে পরিচালিত করিতে যেমন দেশের শিক্ষিতগণই একমাত্র সমর্থ, সেইরূপ তাহাদিগকে অসৎপথে —উৎসন্নের পথে—অধঃপাতিত করিবার ক্ষমতাও তাঁহাদেরই হস্তে। সরলবিশ্বাস-সম্পন্ন জনসঙ্ঘের চিত্ত শিক্ষিতগণ শিক্ষার চাকচক্যে বশীভূত করিয়া যে দিকে ইচ্ছা প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন। সুতরাং শিক্ষিতগণের হস্তে দেশের প্রকৃত সম্পদ্ এবং বিপদ্—এই দু'য়েরই হেতু নিহিত রহিয়াছে। এক হিসাবে ইহাও এক মহা আতঙ্কের কথা, চিন্তার কথা! যাঁহাদের উপর দেশের সম্পদ্-বিপদ্ উভয়ই নির্ভর করিতেছে, তাঁহাদের কর্ত্তব্য যে কত গুরুতর, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

দেশের জনসঙ্ঘকে যদি সৎ পথেই লইয়া যাইতে হয়—মানুষ করিয়া তুলিতে হয়—বাঙ্গালী জাতিকে একটা মহাজাতিতে

পরিণত করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের মনের সম্পদ্ যাহাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা করিতে হইবে। পাশ্চাত্ত্য ভাষায় অনিপুণ থাকিয়াও যাহাতে বঙ্গের ইতর-সাধারণ, পাশ্চাত্ত্য প্রদেশের যাহা উত্তম, যাহা উদার এবং নির্ম্মল, তাহা শিখিতে পারে এবং শিখিয়া আত্মজীবনের ও আত্মসমাজের কল্যাণসাধন করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার মধ্যে যাহা নির্দ্দোষ, আমাদের পক্ষে যাহা পরম উপকারক, যে সমুদয় গুণগ্রাম অর্জ্জন করিতে পারিলে আমাদের সুন্দর সমাজদেহ ও দেশাত্মবোধ আরও সুন্দরতর, সুন্দরতম হইবে, সেই সকল বিষয় আমাদের মাতৃভাষার সাহায্যে বঙ্গের সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত করিতে হইবে। ক্রমেই যে ভয়ঙ্কর কাল আসিতেছে, সেই কালের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দেশবাসীদিগকে জয়ী হইতে হইলে, কেবল এ দেশীয় নহে, পাশ্চাত্ত্য আয়ুধেও সম্পন্ন হইতে হইবে। দু'একটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

প্রথমতঃ ইউরোপের ইতিহাস। ইতিহাস অল্পবিস্তর প্রায় সকল জাতিরই কিছু-না-কিছু আছে। বর্ত্তমান কালে ইউরোপ জগতের অভ্যুদিত দেশসমূহের শীর্ষস্থানীয়। সুতরাং ইউরোপের ইতিহাস আলোচনাপূর্ব্বক দেখিতে হইবে যে, কেমন করিয়া, কোন্ শক্তির বলে, বা কোন্ গূঢ় কারণে ইউরোপের কোন্ জাতির অভ্যুদয় ঘটিয়াছে; কোন্ পথে পরিচালিত হওয়ায় কোন্ জাতির কি উন্নতি হইয়াছে,—সেই উন্নতির কারণ এবং পথ, আমাদের এ দেশীয়গণের পক্ষে প্রযোজ্য কি না, তাহার প্রয়োগে আমাদের এ দেশে কতটা মঙ্গলের সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয় বিশেষ বিবেচনার সহিত আলোচনা করিয়া, যদি সঙ্গত মনে হয়,

এ দেশের পক্ষে হানিজনক না হয়, তবে সেই পথে আমাদের জাতিকে ধীরে ধীরে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। সেই প্রবর্ত্তনের একমাত্র সহজ পথ,—ঐ সকল কারণ, ঐ সকল উপায়-প্রণালী অতি বিশদরূপে আমাদের মাতৃভাষার দ্বারা সাধারণের মধ্যে প্রচার করা; এই প্রচারের একমাত্র কর্ত্তা যাঁহারা ইংরাজী ভাষায় দক্ষতা লাভ করিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষায়ও যাঁহাদের বিশেষ অধিকার জন্মিয়াছে, মাত্র তাঁহারাই,—অন্যে নহে।

দেশের কল্যাণ-কামনায় এবং স্ব মাতৃভাষার পরিপুষ্টি-বাসনায় যাঁহারা এই মহাব্রতে দীক্ষিত হইবেন, তাঁহাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য ইউরোপীয় ইতিহাসের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা। মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, প্রচারকর্ত্তাদের সামান্য ত্রুটীতে আমাদের অভ্যুদয়োন্মুখ জাতির মহা অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। সুতরাং দেশের শিক্ষিত-গণের প্রতিপদবিক্ষেপেই বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন।

যেমন এই অভ্যুদয়ের কথা বলিলাম, তেমনই এই সঙ্গে দেখিতে হইবে, কোন্ পথে যাওয়ায়, কোন্ দুর্নীতির আশ্রয়বশতঃ ইউরোপীয় জাতির অধঃপাত ঘটিয়াছে, বা ঘটিতেছে—সর্ব্বনাশ হইয়াছে। কোন্ জাতি উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরূঢ় হইয়াও কোন্ কর্ম্মের দোষে অধঃপাতের অতলতলে নিপতিত হইয়াছে—পতনের সেই সেই কারণনিচয় অতি সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়া সেই সেই সর্ব্বনাশের হেতুগুলি পরিহার করিতে হইবে। আমাদের মাতৃভাষার স্বচ্ছ দর্পণে এই ভাবে দোষগুণের প্রতিবিম্বনপূর্ব্বক দোষ-পরিহার ও গুণ-গ্রহণের প্রতি দেশবাসীর আগ্রহ এবং ঔৎসুক্য জন্মাইতে হইবে।

ইহকালই জীবনের সর্ব্বস্ব নহে। ইহকালকেই একমাত্র সার ভাবিয়া কার্য্য করার ফলে, ঐহিকবাদী ইউরোপীয়দিগের মধ্যে ধর্ম্মভাব আদৌ নাই বলিলেই হয়। ধর্ম্মভাবের অত্যন্ত অভাবের ফলেই বর্ত্তমানে শোণিত-তরঙ্গিণী রণভূমিতে ইউরোপ বিপর্য্যস্ত। ইউরোপের ঐ অসদ্ভাবের অর্থাৎ ঐহিকবাদিতার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, বরং যতটা সম্ভব উহা হইতে দূরে সরিয়া যাইয়া, আমাদিগের জাতীয়তা ও চিরস্পৃহণীয় ধর্ম্মভাবকে জাগ্রৎ রাখিতে হইবে। আমাদের জাতীয় সাহিত্যের ভিত্তি ধর্ম্মভাবের উপর স্থাপিত করিয়া উহাতে পশ্চিমের গ্রহণযোগ্য বিষয়ের সমাবেশপূর্ব্বক সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি করিতে হইবে। যাহা আছে, মাত্র তাহা লইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। এ দুর্দ্দিনে যাহাতে জাতীয় সম্পদের বৃদ্ধি হয়, সর্ব্বপ্রকারে তাহা করিতে হইবে।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

মহাকাব্য

ইংরাজি এপিক্‌-শব্দের অনুবাদে মহাকাব্য-শব্দের প্রয়োগ চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু এপিকের সমস্ত লক্ষণের সহিত মহাকাব্যের সমস্ত লক্ষণ মিলে কি না, তাহা বলিতে পারি না। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে আমার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, কিন্তু শুনিয়াছি যে আলঙ্কারিকেরা মহাকাব্যের লক্ষণ যেরূপ সূক্ষ্মভাবে বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাহাতে মহাকবিগণের চিন্তার কারণ কিছুই রাখেন নাই। কালিদাস, ভারবি, মাঘ প্রভৃতি কবিগণের রচিত মহাকাব্য এ দেশে চলিত আছে, এবং ঐ সকল মহাকাব্য সম্ভবতঃ অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত মহাকাব্য। রামায়ণ ও মহাভারত, এই দুই গ্রন্থকে মহাকাব্য বলা চলে কি না, তাহা লইয়া একটা তুমুল সমস্যা গোড়াতেই দাঁড়ায়। ইংরাজি পুস্তকে রামায়ণ ও মহাভারত এপিক্‌ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, কিন্তু আমাদের পণ্ডিতেরা উহাদিগকে মহাকাব্য বলিতে সর্ব্বদা সম্মত হন না। প্রথমতঃ এ দুই গ্রন্থ অলঙ্কারশাস্ত্রের নিয়মাবলী অত্যন্ত উৎকটরূপে লঙ্ঘন করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ মহাকাব্য বলিলে উহাদের গৌরবহানির সম্ভাবনা জন্মে। ইতিহাস, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র ইত্যাদি আখ্যা দিলে, বোধ করি, এই দুই গ্রন্থের মর্য্যাদা রক্ষা হইতে পারে। কিন্তু মহাকাব্য বলিলে উহাদের মাহাত্ম্য খর্ব্ব করা হয়।

বস্তুতঃই মাহাত্ম্য খর্ব্ব করা হয়। কুমারসম্ভব ও কিরাতার্জ্জুনীয় যে অর্থে মহাকাব্য, রামায়ণ-মহাভারত কখনই সে অর্থে মহাকাব্য

নহে। কুমারসম্ভব, কিরাতার্জ্জুনীয় যে শ্রেণীর—যে পর্য্যায়ের গ্রন্থ, রামায়ণ-মহাভারত কখনই সে শ্রেণীর—সে পর্য্যায়ের গ্রন্থ নহে। একের নাম মহাকাব্য দিলে, অন্যকে মহাকাব্য বলা কিছুতেই সঙ্গত হয় না।

রামায়ণ-মহাভারতের ঐতিহাসিকত্বে ও ধর্ম্মশাস্ত্রত্বে সম্পূর্ণ আস্থাবান্ থাকিয়াও আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, উহাতে কাব্যরসও যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। মহর্ষি বাল্মীকি ও কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের মুখ্য উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, উঁহারা যাহা লিখিয়া ফেলিয়াছেন, তাহাতে প্রচুর পরিমাণে কবিত্ব রহিয়া গিয়াছে,—হয়ত উঁহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে রহিয়া গিয়াছে; কিন্তু কবিত্ব যে আছে, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ করিবার উপায় নাই।

রামায়ণ-মহাভারতে কবিত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে গেলেই, মহর্ষিদ্বয়কে মহাকবি ও তাঁহাদের কাব্যদ্বয়কে মহাকাব্য না বলিলে চলে না; কেন-না, ভাষাতে আর কোন শব্দ নাই, যদ্দ্বারা এই কাব্যদ্বয়ের সঙ্গত নামকরণ চলিতে পারে। কুমারসম্ভব-কিরাতার্জ্জুনীয়কে আপাততঃ মহাকাব্যের শ্রেণী হইতে খারিজ করিয়া দিয়া আমরা রামায়ণ-মহাভারতকেই মহাকাব্য বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

মনে হইতেছে মেকলে কোথায় বলিয়াছেন, সভ্যতার সহিত কবিত্বের কতকটা খাদ্য-খাদক বা অহি-নকুল সম্বন্ধ রহিয়াছে সভ্যতা কবিত্বকে গ্রাস করে, অথবা সভ্যতার আওতায় কবিতার লতা বাড়িতে পায় না। বলা বাহুল্য, মেকলের অনেক উক্তির মত এই উক্তিটিকেও সুধীজনে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন বিগত উনবিংশ শতাব্দীতে সভ্যতার আস্ফালন-সত্ত্বে

ইউরোপখণ্ডে কবিত্বের যেরূপ স্ফূর্তি দেখা গিয়াছে, তাহাই তাহার প্রমাণ। অন্য প্রমাণের প্রয়োজন নাই।

কিন্তু আমার বোধ হয় মেকলের ঐ উক্তির ভিতর একটু প্রচ্ছন্ন সত্য আছে। সভ্যতা কবিত্বের মস্তক চর্ব্বণ না করিতে পারে, কিন্তু মহাকাব্যকে বোধ করি সশরীরে গ্রাস করিয়া ফেলে। আবার বলা আবশ্যক, মহাকাব্য-শব্দ আমি আলঙ্কারিক-সম্মত অর্থে ব্যবহার করিতেছি না। রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও প্যারাডাইস্ লষ্টকে আমি এ স্থলে মহাকাব্যের মধ্যে ফেলিতেছি না। রামায়ণ-মহাভারত যে পর্য্যায়ের কাব্য, সেই পর্য্যায়ের কাব্যকেই আমি মহাকাব্য বলিতেছি। পৃথিবীতে কত কবি কত কাব্য লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন, কিন্তু মহাকাব্য সেই কোন্ কালে রচিত হইয়া গিয়াছে, তাহার পর আর একখানাও রচিত হইল না। পাশ্চাত্ত্য কাব্যসাহিত্যে লেখকের কিছুমাত্র ব্যুৎপত্তি নাই; কিন্তু সন্দেহ হয়, কেবল হোমারের নামে প্রচলিত গ্রন্থ-দুইখানি ব্যতীত আর কোন কাব্যকে রামায়ণ-মহাভারতের সমান পর্য্যায়ে স্থান দেওয়া যাইতে পারে না। পাশ্চাত্ত্য দেশে সভ্যতা-বৃদ্ধির সহিত কবিত্বের অবনতি হইয়াছে, এ কথা কেহই বলিতে পারিবেন না; কিন্তু শেক্স্পীয়রের নাম মনে রাখিয়াও অকুতোভয়ে বলা যাইতে পারে, ইউরোপ-মহাদেশেও এক বারের বেশী হোমারের জন্ম হয় নাই।

বস্তুতঃই পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে ও সভ্যতার ইতিহাসে কোন্ প্রাচীনকালে বাল্মীকি, ব্যাস ও হোমারের উদ্ভব হইয়াছিল। তাহার পর কত-হাজার বৎসর অতীত হইয়া গেল, কিন্তু মহা-কাব্যের আর উৎপত্তি হইল না। কেন এরূপ হইল, তাহার

কারণ চিন্তনীয়; কিন্তু সেই কারণ-আবিষ্কারে লেখকের ক্ষমতা নাই। তবে এক একবার মনে হয়, মনুষ্যসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা, বোধ করি, আর সেই শ্রেণীর মহাকাব্য-উৎপাদনের পক্ষে অনুকূল নহে।

রামায়ণ-মহাভারত ও হোমারের মহাকাব্যে আমরা মনুষ্য-সমাজের যে চিত্র অঙ্কিত দেখি, তাহাতে সেই সমাজকে আধুনিক হিসাবে সভ্য বলিতে পারা যায় না। মনুষ্যসমাজের সে অবস্থা আবার কখনও ফিরিয়া আসিবে কি না, তাহা জানি না; কিন্তু তাৎকালিক সমাজে যে সকল ঘটনা প্রতিদিন সংঘটিত হইত, সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা ঘটিতে পারে না। আমরা এমন কল্পনায় আনিতে পারি না যে, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সভাপতি কোন ইউরোপের রাজসভায় আতিথ্য-স্বীকার করিয়া অবশেষে রাজলক্ষ্মীকে ষ্টীমারে তুলিয়া প্রস্থান করিতেছেন, ও তাহার প্রতিশোধগ্রহণার্থ ইউরোপের নরপালবর্গ ওয়াশিংটন অবরুদ্ধ করিয়া দশ বৎসরকাল বসিয়া আছেন। ডিলারী বন্দীকৃত লর্ড মেথুয়েন্‌কে গাড়ীর চাকায় বাঁধিয়া দক্ষিণ-আফ্রিকার বন্ধুর উপত্যকায় ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছেন, ইহা কোন দিনের টেলিগ্রামে দেখিবার কেহ আশা করেন নাই। সিডান্-ক্ষেত্রে বিসমার্ক লুই নেপোলিয়ন্‌কে হস্তগত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার বুক চিরিয়া নেপোলিয়ন্-বংশের শোণিতের আস্বাদগ্রহণ আবশ্যক বোধ করেন নাই। ত্রেতাযুগ-অবসানের বহুদিন পরে বুয়রদেশে লঙ্কাকাণ্ডের অপেক্ষাও তুমুল ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু কোন বিজয়ী মহাবীরকে তজ্জন্য লাঙ্গুলের ব্যবহার করিতে হয় নাই।

সেকালের এই অসভ্যতা আমাদের চোখে বড়ই বীভৎস ঠেকে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেকালের সামাজিকতার আর একটা দিক্ আছে, একালে সে দিক্‌টাও তেমন দেখিতে পাই না। বার্ক এক সময়ে আপনার মহাপ্রাণতার ঝোঁকে বলিয়াছিলেন, শিভাল্‌রির দিন গত হইয়াছে। শিভাল্‌রি-নামক অনির্ব্বাচ্য বস্তু নগ্ন বর্ব্বরতার সহিত নিরাবরণ মনুষ্যত্বের অপূর্ব্ব মিশ্রণে সমুৎপন্ন। একালে মানুষ মানুষের রক্তপান করিয়া জিঘাংসার তৃপ্তি করিতে চাহে না বটে, কিন্তু আবার জ্যেষ্ঠভ্রাতার কটাক্ষ-মাত্রশাসনে, পত্নীর অপমান স্বচক্ষে দেখিয়াও, আত্মসংযমে সমর্থ হয় কি না, বলা যায় না। একালের রাজারা মালকোঁচা মারিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গদাহস্তে অবতীর্ণ হন না সত্য বটে, কিন্তু ভীমরতিগ্রস্ত পিতার একটা কথা রাখিবার জন্য ফিজিদ্বীপে নির্ব্বাসন গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকেন কি না, বলিতে পারি না। অশ্বত্থামা ঘোর নিশাকালে সুখসুপ্ত বালকবৃন্দের হত্যাসাধন করিয়া ভীষণ ক্রূরতা দেখাইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু সভা ডাকিয়া ও খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখিয়া সেই ক্রূরতার সমর্থন তাঁহার নিতান্তই আবশ্যক হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণসহায় পাণ্ডবগণ যখন জয়বিষয়ে নিতান্ত হতাশ হইয়া নিশাকালে শত্রুশিবিরে ভীষ্মের নিকট দীনভাবে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা ভীষ্মকে তাঁহার জীবনটুকু দান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের লৌহবর্ম্মের অন্তরালে কারেন্‌সি নোটের গোছা লইয়া যাওয়া আবশ্যক বোধ করেন নাই।

গত চারি হাজার বৎসরের মধ্যে মনুষ্যসমাজের বাহিরের মূর্ত্তিটা অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে সত্য কথা, কিন্তু

তাহার আভ্যন্তরিক প্রকৃতির কতটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা বলা দুষ্কর। মনুষ্যের বাহিরের পরিচ্ছদটা সম্পূর্ণ বদলাইয়াছে, কিন্তু মনুষ্যের ভিতরের গঠন অনেকটা একরূপই আছে। সেকালের রাজারাজড়াও, বোধ করি, সময়মত কৌপীনধারী হইয়া সভামধ্যে বাহির হইতে লজ্জিত হইতেন না, কিন্তু এখনকার অন্নহীন শ্রমজীবীরাও সমস্ত অঙ্গের মালিন্য ও বিরূপতা পোষাকের আচ্ছাদনে আবৃত রাখিতে বাধ্য হয়। সেকালে ক্রূরতা ছিল, বর্ব্বরতা ছিল, পাশবিকতা ছিল, এবং তাহা নিতান্ত নগ্ন, নিরাবরণ অবস্থাতেই ছিল। তাহার উপর কোন আচ্ছাদন, কোনরূপ পালিশ্, কোনরূপ রঙ্-ফলানো ছিল না। একালেও ক্রূরতা, বর্ব্বরতা ও পাশবিকতা হয়ত ঠিক তেমনি বর্ত্তমান আছে, তবে তাহার উপর একটা কৃত্রিম ভণ্ডামির আবরণ স্থাপিত হইয়া তাহার বীভৎস ভাবকে আচ্ছন্ন রাখিয়াছে। সম্প্রতি চীনদেশে সভ্য ইউরোপের সম্মিলিত সেনা যে পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে আটিলা ও জঙ্গিস্ খাঁর প্রেতাত্মার আর লজ্জিত হইবার কোন কারণই নাই।

বস্তুতঃই চারি হাজার বৎসরের ইতিহাস সূক্ষ্মভাবে তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যায়, মনুষ্যচরিত্র অধিক বদলায় নাই; তবে সমাজের মূর্ত্তিটা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, এবং মনুষ্য-সমাজের অবস্থা যে-কাব্যগ্রন্থে প্রতিফলিত হইয়া থাকে, সেই কাব্যের মূর্ত্তিও যে তদনুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। বিস্ময়ের কারণ থাক্ আর নাই থাক্, আধুনিক কালের সাহিত্যে বাল্মীকি, ব্যাস ও হোমারের আর আবির্ভাব হয় নাই, এবং আর যে কখনও হইবে তাহা

আশা করাও দুষ্কর। সাহিত্যে মহাকাব্যের যুগ বোধ হয় অতীত হইয়া গিয়াছে। কালের যখন অবধি নাই ও পৃথ্বী যখন বিপুলা, তখন বড় কবির ও কাব্যের অসদ্ভাব কখন হইবে না; কিন্তু মনুষ্যসমাজের সেই প্রাচীন অবস্থা ফিরিয়া আসিবার যদি সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে মহাকবির ও মহাকাব্যের, বোধ করি, আবির্ভাব আর হইবে না।

বস্তুতঃই আর আবির্ভাবের আশা নাই। মহাকাব্যের মধ্যে একটা উন্মুক্ত অকৃত্রিম স্বাভাবিকতা আছে, তাহা, বোধ করি, আর কখনও ফিরিয়া আসিবে না। সুনিপুণ শিল্পী একালে তাজমহল গড়িতে পারেন, কিন্তু পিরামিডের দিন বুঝি একেবারে চলিয়া গিয়াছে। মহাকাব্যগুলিকে আমরা মহাকায় অদ্ভুত পিরামিডের সঙ্গে তুলনা করিতে পারি। এক একবার মনে হয়, উহাদিগকে কোন মানবহস্তনির্ম্মিত কৃত্রিম কারুকার্য্যের সহিত তুলনা না করিয়া প্রকৃতির হস্তনির্ম্মিত নৈসর্গিক পদার্থের সহিত উপমিত করা উচিত।

আমাদের ভারতবর্ষের মহাভারতকে এক একবার ভারতবর্ষের হিমাচলের সঙ্গে তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়। হিমাচল যেমন তাহার বিপুল পাষাণকলেবরের অঙ্কদেশে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতেছে, মহাভারতের বিপুল কলেবর তেমনি ভারতীয় সাহিত্যকে কত সহস্র বৎসরকাল অঙ্কে রাখিয়া লালন-পালন ও পোষণ করিয়া আসিতেছে। হিমাচলের বিশাল বক্ষোদেশ হইতে বিনিঃসৃত সহস্র উৎস হইতে সহস্র স্রোতস্বিনী অমৃত-রসপ্রবাহে ভারতভূমিকে আর্দ্র ও সিক্ত করিয়া 'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা' পুণ্যভূমিতে পরিণত করিয়াছে, সেইরূপ মহাভারতের

মধ্য হইতে সহস্র উপাখ্যান, সহস্র কাহিনী, সহস্র কথা সমগ্র জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে সহস্র ধারা প্রবাহিত করিয়া পুণ্যতর ভাবপ্রবাহে জাতীয় সাহিত্যকে চিরহরিৎ রাখিয়া বহুকোটী লোকের জাতীয় জীবনে পুষ্টি ও কান্তি প্রদান করিয়া আসিতেছে। ভূতত্ত্ববিৎ যেমন হিমাচলের ক্রমবিন্যস্ত স্তরপরম্পরা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার মধ্য হইতে কত বিস্ময়কর জীবের অস্থিকঙ্কাল উদ্ধার করিয়া অতীতের লুপ্তস্মৃতি কালের কুক্ষি হইতে উদ্ঘাটন করেন, সেইরূপ প্রত্নতত্ত্ববিৎ এই বিশাল গ্রন্থের স্তরপরম্পরা হইতে ভারতীয় জনসমাজের অতীত ইতিহাসের বিস্মৃত নিদর্শনের চিহ্ন ধরিয়া ইতিহাসের অতীত-অধ্যায় আবিষ্কার করেন।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

সাহিত্যে ভাণ

জীবনে যেরূপ, সাহিত্যেও সেইরূপ—সরলতা ও আন্তরিকতার একান্ত প্রয়োজন। সরলতা ও আন্তরিকতা-হীন জীবন যেমন সমাজের অপকারক, সরলতা ও আন্তরিকতা-হীন সাহিত্যও তেমনই সাহিত্যের অপকারক। জীবনকে উন্নত করিতে হইলে যেমন সত্যের আশ্রয় লইতে হয়, সাহিত্যকে উন্নত করিতে হইলেও তেমনই সত্যাশ্রয় আবশ্যক। সৎ-জীবন পৃথিবীর কল্যাণকর; সৎসাহিত্যও পৃথিবীর কল্যাণকর। সাহিত্য,—জীবনের প্রতিবিম্ব। জীবন মলিন হইলে, জীবনের প্রতিবিম্ব—সাহিত্যও মলিন হইয়া থাকে।

এই মলিনতা কি? উত্তরে অনেক কথা আসে। তন্মধ্যে প্রথম কথা ও প্রধান কথা—ভাণ।

ভাণ কি? যাহা তোমার নাই বা যাহা তুমি নও, তাহা দেখাইবার চেষ্টা—ছলনা। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায়—"ভাবের ঘরে চুরি।" এই ভাবের ঘরে চুরি সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। জীবনে যেরূপ, সাহিত্যেও সেইরূপ।

ভাণে জীবনকে অধোগামী করে; ভাণে সাহিত্যেরও অধোগতি হয়। তুমি বরং সরল অকপট পাষণ্ড হও, অবস্থাবিশেষে তোমার পরিত্রাণ আছে; পরন্তু ভাণ কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করিলে কস্মিন্ কালে তুমি পরিত্রাণ পাইবে না। সাহিত্যেও তেমনই;—তুমি বরং সরলভাবে সাদামাঠা কথা লিখিয়া ভাব ও

চিন্তা প্রচার করিও, এক শ্রেণীর পাঠকের তাহাতে উপকার হইবে; পরন্তু যাহা তুমি জান না, যাহা তোমার জীবনে নাই এবং যাহা তুমি কখনও অনুভবও কর নাই, সেরূপ কথার আলোচনা করিয়া, মৌলিক-তত্ত্ব-প্রচার-ব্যপদেশে একটা উদ্ভট সাহিত্যের সৃষ্টি করিও না। তাহাতে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তোমার বিদ্যার পরিচয় পাইয়া মনে মনে হাসিবেন।

যাহা সত্য ও সুন্দর, যাহা সার ও শুভপ্রদ, তাহাই সাহিত্য। কিন্তু এরূপ গ্রন্থ কয়খানি? মনোজ্ঞ বা চিত্তাকর্ষক গ্রন্থ অনেক থাকিতে পারে; চটকপূর্ণ রোচক লেখাও অনেকে লিখিয়া থাকিবেন; 'শেষ না করিয়া থাকা যায় না'—এমন গ্রন্থও অনেক হইয়াছে এবং হইতেছে বটে; তথাপি সত্যের অনুরোধে বলিব—স্থায়ী সাহিত্যে উহাদের স্থান নাই। বালক ও স্ত্রীলোকের কাছে চটকপ্রদ "রূপকথা" বা "ডিটেক্‌টিভের গল্প" খুব রোচক, মনোজ্ঞ ও চিত্তাকর্ষক হইতে পারে; পরন্তু চিন্তাশীল জ্ঞানী ব্যক্তি কতক্ষণ তাহা ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিতে পারেন? সুতরাং বলিতে হয়, চটকপূর্ণ বা রোচক এবং মনোজ্ঞ বা চিত্তাকর্ষক হইলেই সাহিত্য ভাল হইল না,—সাহিত্যের উহা একটা মহাগুণও নয়।

এ কথায় কেহ এমন না বুঝেন, আমরা "শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে"-গোছের নীরস সাহিত্যের পোষকতা করিতেছি! সাহিত্য সরস হউক এবং সর্ব্বথা তাহা বাঞ্ছনীয়ও বটে; কিন্তু তাহা বলিয়া আলোচ্য বিষয় কেবলমাত্র ভাষার ছটায় ও বর্ণনার ঘটায় ঢাকিয়া রাখিয়া, তাহার স্বরূপ অপ্রকাশ রাখা কোনক্রমে যুক্তিযুক্ত নহে। ন্যায়, যুক্তি ও মূল কথা চাপা দিয়া, অবান্তর কথায় শাখা-প্রশাখা বাড়াইলে, তাহা আর হইল কি? ফেনাইয়া বা ফাঁপাইয়া

একটা জিনিসকে অনেক বড় করা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে যে আসল জিনিসই চাপা পড়ে! ক্ষুদ্র যূথিকার গুচ্ছের উপর যদি অঞ্জলিপূর্ণ করবীর ঢালিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে কি সেই যূথিকা আর সৌরভদানে সমর্থ হয়? রাশীকৃত করবীর দেখিয়া বালক মাতিতে পারে বটে, কিন্তু যে ফুলের আঘ্রাণ বুঝিয়াছে সে তাহাতে ভুলিবে কেন? সুতরাং বুঝা গেল, স্থায়ী সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে হইলে, আপাত-মনোহর চটকের হাত এড়াইতে হয়।

কেবল বাহবা পাইবার লোভে যে লেখে, তাহার না লেখাই ভাল; কারণ আমাদের এই বাঙ্গালাদেশে 'বাহবা' জিনিসটা এখন এত সুলভ হইয়া পড়িয়াছে যে, প্রকৃত চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি তাহা দেখিয়া বিরলে অশ্রুপাত করেন। বরং অবস্থা-বিশেষে 'বাহবা' না পাইয়া যে দুর্নাম পায়, সেও বুঝি দেশের একটা কাজ করিয়া থাকে!

আমাদের কথা এই, যদি তুমি কিছু নূতন কথা বলিতে পার, তবে লিখ। যদি কোন নূতন আলোক, নূতন জ্ঞান, নূতন চিন্তা, নূতন ভাব, নূতন তত্ত্ব তোমার আয়ত্তে থাকে, তবে তাহা লিপিবদ্ধ কর। যদি তুমি জগতে কোন সত্য-প্রচারে অভিলাষী হইয়া থাক, তবে 'লেখক'-নাম-ধারণে ধন্য ও কৃতার্থ হও। নহিলে ভাই! কেবলই সখ মিটাইবার, নাম কিনিবার ও বাহবা পাইবার লোভে, আর বোকা ভুলাইয়া দু'পয়সা উপার্জ্জনের মতলবে, সাহিত্যের পবিত্র আসন কলঙ্কিত করিও না। সাধনার যে ধন, ধর্ম্ম- ও মনুষ্যত্ব-লাভের যাহা প্রকৃষ্ট পথ, চিত্তশুদ্ধি ও আত্মোন্নতির যাহা ভিত্তি-স্বরূপ, তাহাকে বণিগ্‌বৃত্তির অঙ্গীভূত করিও না। যাহাতে একাধারে আনন্দ, শিক্ষা, জীবনের তৃপ্তি ও

আত্মার স্ফূর্তি, 'ভাবের ঘরে চুরি' করিয়া—তাহাতে গোঁজামিল দিয়া যাইও না। যাহাতে মন প্রশস্ত হয়, বুকে বল বাড়ে, পরকে আপনার করা যায়, জগতের ও জীবনের অনেক দুঃখ ভুলিয়া থাকা যায়,—দোহাই ভাই! সে জিনিসটা লইয়া আর ন-কড়া ছ-কড়া করিও না। ইহাতে যে তুমি একা মজিবে তাহা নহে—তোমার সঙ্গে সঙ্গে অনেক অভাগাও মজিবে।

শিশু যেমন পুতুলের গায়ে রাংতা পরাইয়া করতালি দিয়া নৃত্য করিতে থাকে, এই শ্রেণীর লেখকগণও ঠিক সেইভাবে সাহিত্যকে প্রাণে মারিয়া, সাহিত্যের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়া, চাকচক্যে মাতিয়া, আপনারাও প্রবঞ্চিত হয়, দেশকেও প্রবঞ্চিত করে। ইহারা আপনাদের নামের জয়ঢাক আপনি ঘাড়ে করিয়া বাজাইতে থাকে, কখন-বা সমধর্ম্মা 'সাহিত্যিক' বন্ধুদ্বারাও একচোট বাজাইয়া লয়।—এ গেল নিম্নস্তরের লেখকমণ্ডলীর কথা।

তারপর উচ্চস্তরের লেখক বলিয়া যাঁহারা পরিচিত, তাঁহাদের মধ্যেও এ গুণের বিশেষ অভাব নাই। তাঁহাদের মধ্যেও দল আছে, দলাদলি আছে। সহজে ইহারা প্রতিভাবান্ নবীন লেখককে আমল দেন না। তবে ইহারা নাকি অপেক্ষাকৃত চতুর ও বুদ্ধিমান্,—সভ্যতার আভরণে ইহারা নাকি অনেক সময়ে আবৃত থাকেন, তাই ইহাদের প্রকট মূর্ত্তি সহসা লোকে দেখিতে পায় না। বিশেষতঃ ইহারা নিজে হাতে-কলমে বড়-একটা ধরা-ছোঁয়া দেন না,—অনুগত শিষ্য-সেবক বা অনুচর-পারিষদ-দ্বারা কাজ সারিয়া লন। ইহাদের প্রশংসার দুন্দুভিনাদের জন্য সংবাদ- ও সাময়িকপত্র-বিশেষ নিযুক্ত আছে; স্থানে স্থানে বাঁধা দল আছে; সহরে-নগরে সভা-সমিতিও আছে। সুতরাং সত্যকথা বলিতে গেলে, এ

হিসাবেও নিম্নস্তর উচ্চস্তর দুই-ই সমান। অবশ্য, প্রকৃত শক্তিশালী ও সত্যনিষ্ঠ সাহিত্যসেবীর কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা সমসাময়িক পত্র-সম্পাদক ও পাঠকের মতামত বড়-একটা গ্রাহ্য করেন না; সকল সময়ে, সকল অবস্থাতেই তাঁহারা সাধারণ হইতে এক সোপান উচ্চে অবস্থিতি করেন,—নিন্দা বা প্রশংসা তাঁহাদের নিকট দুই সমান। তাঁহারা সত্যের জন্য সত্যের অনুসন্ধান করেন; সাহিত্যের জন্য সাহিত্যের সেবা করেন,—অন্যপ্রকার লাভ-লোকসানের খতিয়ান তাঁহারা করেন না। সেই জন্য সাহিত্যে গোঁজামিল বা ভাণ-ও তাঁহাদের নাই।

যিনি যে বিষয়ের অধিকারী, তিনি যদি সেই বিষয়ে লেখনী ধারণ করেন, তাহা হইলে আর কোন জঞ্জাল থাকে না। নূতন কথা, নূতন রকমে কিছু বলিতে পার,—স্বচ্ছন্দে বলিয়া যাও; লোকে কাণ পাতিয়া শুনিবে,—শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিবে। সাহিত্যের সরস উদার প্রশস্ত ক্ষেত্রে—স্বাধীনতার এ মুক্তরাজ্যে —তোমার অবাধ অধিকার। পরন্তু তোমার যদি সে শক্তি ও সৌভাগ্য না থাকে, তবে কেন তুমি বৃথা প্রবঞ্চিত হও এবং লোককে প্রবঞ্চিত কর?

আসল কথা,—যশের লোভে, মানের মোহে ও নামের লোভে কেহ কেহ লেখনী ধারণ করিয়া থাকেন। পরন্তু এই সঙ্গে একটু কর্ত্তব্য- ও দায়িত্ব-জ্ঞান যদি ইঁহাদের থাকিত, তাহা হইলে ঐ "নামের লোভ" বিশেষ নিন্দার জিনিস হইত না। দুর্ভাগ্যবশতঃ, এই শ্রেণীর লেখকদের সে কর্ত্তব্য বা দায়িত্ব-জ্ঞান এতটুকুও নাই। তারপর সুদক্ষ ও সর্ব্বজনসম্মানিত সমালোচকেরও বড়ই অভাব। সে অভাবেও ইঁহারা লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারেন না; না পারিয়া

যা-তা লিখেন,—আর পল্লীগ্রামের নিরীহ পাঠকমণ্ডলী তাহাই বিনা ওজরে পাঠ করিতে থাকেন।

এ ক্ষেত্রে পাঠকের রুচি-প্রবৃত্তির দোষ আমি দিব না। লোক-শিক্ষকের পদে যিনি আসীন, তাঁহারই ত কর্ত্তব্য—পাঠকের মনকে উন্নত করা। দোষ তাঁহাদের, যাঁহারা কেবলমাত্র নামের খাতিরে বই লেখেন; দোষ তাঁহাদের, যাঁহারা স্বার্থের খাতিরে সমালোচনা করেন; আর ঘোরতর অপরাধ তাঁহাদের, যাঁহারা প্রকৃত মানীকে উপেক্ষা করিয়া অমানীকে কোল দেন। পাঠকের দোষ কি? পাঠক-তৈয়ারী করিবার শক্তি ত লেখকেরই হাতে।

এই গেল, সাধারণ লেখক, পত্র-সম্পাদক ও সমালোচকদিগের কথা। ইহার উপর আর এক দল প্রবীণ সাহিত্যসেবী সাহিত্যের কিছু অনিষ্ট করিতেছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহাদের প্রসিদ্ধি ও প্রবীণতাই ইহাদের কালস্বরূপ হইয়াছে। ইহারা যখন-তখন বড় বেশী রকমের বিজ্ঞতার ভাণ করেন; নব্য লেখকদের প্রতি অতিমাত্রায় মুরুব্বিয়ানা করিয়া থাকেন; আর এটা-সেটা খুঁটনাটী অছিলা ধরিয়া অভ্যুত্থানশীল লেখককে সদাই চাপা দিবার চেষ্টা করেন। ইহারা কখন বৈয়াকরণ সাজেন, কখন ভাষাতত্ত্ববিদ্ হন; আর আবশ্যক বোধে কখন-বা নীতিবেত্তা, ঐতিহাসিক ও সমাজতত্ত্ববিদ্ হইয়া বিজ্ঞতার পরা কাষ্ঠা দেখাইয়া থাকেন! প্রতিবাদ করিবার উপায় নাই; তাঁহারা বয়সে প্রবীণ এবং সমাজেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মানিত; কিন্তু প্রতিবাদে তাঁহারা বড়ই চটিয়া যান। ইহাদের কয়েকটি বাঁধা গৎ ও চিরপ্রচলিত অতি পুরাতন নিয়ম-কানুন যিনি না মানিয়া চলিলেন, তাঁহার আর পরিত্রাণ নাই! সেই অতি-সতর্ক বৃদ্ধ পলোনিয়াস্‌-ও ইহাদের নিকট হার মানেন।

ইঁহারাও সাহিত্যে রাশি রাশি ভাণ চালাইয়া যাইতেছেন! বলিবার ও বুঝাইবার পদ্ধতি ইঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন,—কতকটা ঈর্ষ্যার জন্যও বটে, আর কতকটা বয়োধর্ম্মের বিচার-হীনতা-নিবন্ধনও বটে।

কিন্তু হায়! ইঁহাদের এই বিষম ভ্রান্তিতে সাহিত্যের যে কি সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা দূরদর্শী চিন্তাশীল সাহিত্য-বান্ধবগণ সম্যগ্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া, বিরলে অশ্রুপাত করিয়া থাকেন। এ অশ্রুপাতের কারণ,—সাহিত্যকে তাঁহারা প্রাণের সমান ভালবাসেন। তাঁহারা জীবনে এবং ব্যবহারে বুঝিয়াছেন, জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি বিনা জাতীয় জীবন কিছুতেই গঠিত হইতে পারে না। তাঁহারা বুঝিয়াছেন, রাজনীতি বাঙ্গালীর ধাতে সহে না; সমাজনীতি বা ধর্ম্মনীতি খুব ভাল হইলেও তাহা সাহিত্যকে অতিক্রম করিয়া চলিতে পারে না। অগ্রে সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি ও পরিপুষ্টি না হইলে, ধর্ম্ম ও সমাজ ভাঙ্গিয়া যায়। সুতরাং সাহিত্যকে কেন্দ্র করিয়া সমাজ, ধর্ম্ম, জাতীয়তা সকলই পরিচালিত করিতে হইবে। সত্য অপেক্ষা মহৎ আর কোন বস্তু নাই; সেই সত্য সাহিত্যের অন্তস্তরে নিহিত। ধর্ম্ম অপেক্ষা পরম বন্ধু আর কেহ নাই; সেই ধর্ম্ম সাহিত্যের উচ্চতর সোপান। উচ্চে উঠিবার অগ্রে আপনাকে, তথা সাহিত্যকে শক্তিশালী করিতে হইবে। কিন্তু ভাণে এ কাজ হয় না। জীবনে যেমন, সাহিত্যেও তেমনই—ভাণ সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

হারানচন্দ্র রক্ষিত

ভরত

ভরতের উল্লেখ করিয়া রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে বলিয়াছিলেন,—

"রামাদপি হি তং মন্যে ধর্ম্মতো বলবত্তরম্ ।"

ভরতের চরিত্র তিনি বিলক্ষণরূপ অবগত ছিলেন, তথাপি রাম বনগমন করিলে তাঁহাকে ত্যাজ্য পুত্র ও স্বীয় ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্যের অযোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এমন নির্দ্দোষ—শুধু নির্দ্দোষ বলিলে ঠিক হয় না, রামায়ণকাব্যের একমাত্র আদর্শ চরিত্র ভরতের ভাগ্যে কি যে বিড়ম্বনা ঘটি[illegible] তাহা আলোচনা করিলে আমরা দুঃখিত হই। পিতা তাঁহাকে [illegible]ভাবে ত্যাগ করিলেন, এমন কি তাঁহাকে আনিবার জন্য যে সকল দূত কেকয়-রাজ্যে প্রেরিত হইয়াছিল তাহারাও অযোধ্যার কুশলসম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তরে যেন ঈষৎ ক্রূর ব্যঙ্গ-সহকারে বলিয়াছিল,—"আপনি যাঁহাদের কুশল ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কুশলে আছেন।" অর্থাৎ ভরত যেন দশরথ-রাম-লক্ষ্মণ প্রভৃতির কুশল বাস্তবিক চান না—তিনি কৈকেয়ী ও মন্থরার কুশলই শুধু প্রার্থনা করেন।

এই সাধু ব্যক্তি নিতান্ত আত্মীয়গণের নিকট হইতেও অতি অন্যায় লাঞ্ছনা প্রাপ্ত হইয়াছেন। রামচন্দ্র ভরতকে এত ভাল-বাসিতেন যে, "মম প্রাণৈঃ প্রিয়তরঃ" বলিয়া তিনি বারংবার ভরতের উল্লেখ করিয়াছেন। কৌশল্যাকে রাম বলিয়াছিলেন,—"ধর্ম্ম-প্রাণ ভরতের কথা মনে করিয়া তোমাকে অযোধ্যায় রাখিয়া

যাইতে আমার কোনো চিন্তার কারণ নাই।" অথচ সেই রামচন্দ্রও ভরতের প্রতি দুই-একটি সন্দেহের বাণ যে নিক্ষেপ না করিয়াছেন, এমন নহে।

প্রকৃতিপুঞ্জের ভরতের প্রতি বিদ্বিষ্ট হওয়ার কিছু কারণ অবশ্যই বিদ্যমান ছিল। এত বড় ষড়যন্ত্রটা হইয়া গেল, ভরতের ইহাতে কি পরোক্ষে কোনরূপই অনুমোদন ছিল না? মাতুল যুধাজিতের সহিত পরামর্শ করিয়া ভরত যে দূর হইতে সূত্র-চালনা করিয়া কৈকেয়ীকে উত্তেজিত করিয়া তোলেন নাই, তাহার প্রমাণ কি? এই সন্দেহের আশঙ্কায় ভরত বিষণ্ণ হইয়া কৈকেয়ীকে বলিয়াছিলেন,—"যখন অযোধ্যার প্রকৃতিপুঞ্জ রুদ্ধকণ্ঠে সজলনেত্রে আমার দিকে তাকাইবে, আমি তাহা সহ্য করিতে পারিব না।" কৌশল্যা ভরতকে ডাকিয়া আনিয়া কটু-বাক্য বলিতে লাগিলেন, এই সকল বাক্যে, ব্রণে সূচিকা বিদ্ধ করিলে যেরূপ কষ্ট হয়, ভরতকে সেইরূপ বেদনা দিয়াছিল। দৈবচক্রে পড়িয়া এই দেবতুল্য চরিত্র বিশ্বের সকলের সন্দেহ-ভাজন হইয়া লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। তিনি রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বিপুল-বাহিনী-সঙ্গে যখন অগ্রসর হইতেছিলেন, নিষাদাধিপতি গুহক তখন তাঁহাকে রামের অনিষ্ট-কামনায় ধাবিত মনে করিয়া পথে লগুড়-ধারণ-পূর্ব্বক দাঁড়াইয়াছিলেন, এমন কি ভরদ্বাজ ঋষি পর্য্যন্ত তাঁহাকে ভয়ের চক্ষে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আপনি সেই নিষ্পাপ রাজপুত্রের প্রতি কোন পাপ অভিপ্রায় বহন করিয়া ত যাইতেছেন না?" প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে দিতে ভরতের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছিল। ভরত কৈকেয়ীকে "মাতৃরূপে মমামিত্রে" বলিয়া

সম্বোধন করিয়াছিলেন; বাস্তবিকই কৈকেয়ী মাতৃরূপে তাঁহার মহাশত্রুস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বিশ্বময় এই যে সন্দেহ-চক্ষুর বিষবাণ ভরতের উপর পতিত হইয়াছিল, তাহার মূল কৈকেয়ী। কিন্তু ঘটনাবলী যতই জটিলভাব ধারণ করুক না কেন, ভরতের অপূর্ব্ব ভ্রাতৃস্নেহ জটিলতাকে সহজ করিয়া তুলিয়াছিল। রামকে আমরা নানা অবস্থায় সুখী হইতে দেখিয়াছি। রামচন্দ্রের চিত্তাকাশ কখন মেঘাচ্ছন্ন, কখন প্রসন্ন। কিন্তু ভরতের চিরবিষণ্ণ চিত্রটি মর্ম্মান্তিক করুণার যোগ্য।

ভরতের চিত্র প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে কবিগুরু যখন সর্ব্বপ্রথম যবনিকা উত্তোলন করেন, তখনই তাঁহার মূর্ত্তি বিষণ্ণতা-পূর্ণ। এইমাত্র দুঃস্বপ্ন দেখিয়া তিনি প্রাতঃকালে উঠিয়াছেন, নর্ত্তকীগণ তাঁহার প্রমোদের জন্য সম্মুখে নৃত্য করিতেছে, সখাগণ ব্যগ্রভাবে কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কিন্তু ভরতের চিত্ত ভারাক্রান্ত, মুখখানি শ্রীহীন, অযোধ্যার বিষম বিপদের পূর্ব্বাগম যেন তাঁহার মন অধিকার করিয়া রহিয়াছে,—তিনি কোনরূপেই সুস্থ হইতে পারিতেছেন না। এই সময়ে তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য অযোধ্যা হইতে দূত আসিল।

বহু দেশ, নদনদী ও কান্তার অতিক্রম করিয়া ভরত দূর হইতে অযোধ্যার চিরশ্যামল তরুরাজি দেখিতে পাইলেন এবং আতঙ্কিত-কণ্ঠে সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ যে অযোধ্যার মত মনে হয় না। নগরীর সেই চিরশ্রুত তুমুল শব্দ শুনিতেছি না কেন? বেদ-পাঠনিরত ব্রাহ্মণগণের কণ্ঠধ্বনি ও কার্য্যস্রোতে প্রবাহিত নর-নারীর বিপুল হলহলা-শব্দ একান্তরূপে নিস্তব্ধ। যে প্রমোদোদ্যান-সমূহে রমণী ও পুরুষগণ একত্র বিচরণ করিত, তাহা আজ

পরিত্যক্ত। রাজপথ চন্দন ও জলনিষেকে পবিত্র হয় নাই। রথ, অশ্ব, হস্তী রাজপথে কিছুই নাই। অসংযত কপাট ও শ্রীহীন রাজপুরী যেন ব্যঙ্গ করিতেছে। এ ত অযোধ্যা নহে,—এ যেন অযোধ্যার অরণ্য।"

ভরত মৌন প্রতিহারীদিগের প্রণাম গ্রহণ করিয়া উৎকণ্ঠিত-চিত্তে পিতার প্রকোষ্ঠে গেলেন; সেখানে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। কৈকেয়ীর গৃহে রাজা অনেক সময়ে থাকেন,—পিতাকে খুঁজিতে ভরত মাতার গৃহে প্রবেশ করিলেন।

সদ্যোবিধবা কৈকেয়ী আনন্দে ফুল্লা; পতিঘাতিনী পুত্রের ভাবী অভিষেক-ব্যাপারের চিত্র মনে মনে অঙ্কিত করিয়া সুখী হইতেছিলেন। ভরতকে পাইয়া তিনি নিতান্ত হৃষ্টা হইলেন। ভরত পিতার কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন,—"সর্ব্বজীবের যে গতি, তোমার পিতা তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছেন।" এই সংবাদে পরশুচ্ছিন্ন বন্যবৃক্ষের ন্যায় ভরত ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। "অক্লিষ্ট-কর্ম্মা পিতার হস্তের সুখের স্পর্শ কোথায় পাইব?"—বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রাজহীন রাজশয্যা তাঁহার নিকট চন্দ্রহীন আকাশের মত বোধ হইল। তিনি কৈকেয়ীকে বলিলেন,—"রাম কোথায় আছেন? এখন পিতার অভাবে যিনি আমার পিতা, যিনি আমার বন্ধু, আমি যাঁহার দাস, সেই রামচন্দ্রকে দেখিবার জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে।" রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা নির্ব্বাসিত হইয়াছেন শুনিয়া ভরত ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। ভ্রাতার চরিত্র-সম্বন্ধে আশঙ্কা করিয়া তিনি বলিলেন,—"রাম কি কোন ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করিয়াছেন, তিনি কি দরিদ্রদিগকে পীড়ন করিয়াছেন? এই নির্ব্বাসন-দণ্ড কেন হইল?" কৈকেয়ী

বলিলেন,—"রাম এ সকল কিছুই করেন নাই।" শেষে ভরতের উন্নতি ও রাজশ্রী-কামনায় কৈকেয়ী যে সকল কাণ্ড করিয়াছেন, তাহা বলিয়া পুত্রের প্রীতি-উৎপাদনের প্রতীক্ষায় তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন।

নিবিড় মেঘমণ্ডল যেন আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ধর্ম্মপ্রাণ বিশ্বস্ত ভ্রাতা এই দুঃসহ সংবাদের মর্ম্ম ক্ষণকাল গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি মাতাকে যে ভৎসনা করিলেন, তাহা তাঁহার মহাদুর্গতি স্মরণ করিয়া আমরা সম্পূর্ণরূপে সময়োপযোগী মনে করি।—"তুমি ধার্ম্মিকবর অশ্বপতির কন্যা নহ, তাঁহার বংশে রাক্ষসী। তুমি আমার ধর্ম্মবৎসল পিতাকে বিনাশ করিয়াছ, ভ্রাতাদিগকে পথের ভিখারী করিয়াছ, তুমি নরকে গমন কর।" যখন কাতর-কণ্ঠে ভরত এই সকল কথা বলিতেছিলেন, তখন অপর গৃহ হইতে কৌশল্যা সুমিত্রাকে বলিলেন,—"ভরতের কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছে, সে আসিয়াছে, তাহাকে আমার নিকট ডাকিয়া আন।" কৃশাঙ্গী সুমিত্রা ভরতকে ডাকিয়া আনিলে কৌশল্যা বলিলেন,—"তোমার মাতা তোমাকে লইয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করুন, তুমি আমাকে রামের নিকট পাঠাইয়া দাও।" এই কটূক্তিতে মর্ম্মবিদ্ধ ভরত কৌশল্যার নিকট অনেক শপথ করিলেন; তিনি এই ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না,—বহু প্রকারে এই কথা জানাইতে চেষ্টা করিয়া নিদারুণ শোকে মুহ্যমান হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। করুণাময়ী অম্বা কৌশল্যা ধর্ম্মভীরু কুমারের মনের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন,—তাঁহাকে অঙ্কে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

ভরতের শোক এবং ঔদাসীন্য ক্রমেই যেন বাড়িয়া চলিল।

শ্মশান-ঘাটে মৃত পিতার কণ্ঠলগ্ন হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"পিতঃ, আপনি প্রিয় পুত্রদ্বয়কে বনে পাঠাইয়া নিজে কোথায় যাইতেছেন?" অশ্রুপূর্ণকাতরদৃষ্টি রাজকুমারকে বশিষ্ঠ তাড়না করিতে করিতে পিতার ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য-সম্পাদনে প্রবৃত্ত করাইলেন, শোক-বিহ্বলতায় ভরত নিজে একেবারে চেষ্টাশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন।

প্রাতে বন্দিগণ ভরতের স্তবগান আরম্ভ করিল, ভরত পাগলের ন্যায় ছুটিয়া তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া দিলেন।—"ইক্ষ্বাকুবংশের প্রথানুসারে সিংহাসন জ্যেষ্ঠ রাজকুমারের প্রাপ্য, তোমরা কাহার বন্দনাগীতি গাহিতেছ?" রাজমৃত্যুর চতুর্দ্দশ দিবসে বশিষ্ঠ-প্রমুখ সচিববৃন্দ ভরতকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। ভরত বলিলেন,—"রামচন্দ্র রাজা হইবেন, অযোধ্যার সমস্ত প্রজামণ্ডলী লইয়া আমি তাঁহার পা ধরিয়া সাধিয়া আনিব, নতুবা চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য আমিও বনবাসী হইব।" শত্রুঘ্ন মন্থরাকে মারিতে গেলেন এবং কৈকেয়ীকে তর্জ্জন করিয়া অনুসরণ করিলে, ক্ষমার অবতার ভরত তাঁহাকে নিষেধ করিলেন।

সমস্ত অযোধ্যাবাসী রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিতে ছুটিল। শৃঙ্গবেরপুরীতে গুহকের সঙ্গে ভরতের সাক্ষাৎকার হইলে, ভরতকে গুহক প্রথমে সন্দেহ করিয়াছিল, কিন্তু ভরতের মুখ দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ের ভাব বুঝিতে বিলম্ব হইল না। এবার জটাবল্কল-পরিহিত শোকবিমূঢ় রাজকুমার ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে যাইয়া রামচন্দ্রের অনুসন্ধান করিলেন; এই সর্ব্বজ্ঞ ঋষিও প্রথমতঃ সন্দেহ করিয়া ভরতের মনঃপীড়া দিয়াছিলেন। চিত্রকূটের সন্নিহিত হইয়া ভরত

দাসীবৃন্দ ও সচিবসমূহে পরিবৃত্ত হইয়া রথ ত্যাগ করিয়া পদব্রজে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

ভরত আসিয়া রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। অনশনকৃশ ও শোকের জীবন্তমূর্ত্তি দেবোপম ভরত রামকে তৃণের উপর উপবিষ্ট দেখিয়া বালকের ন্যায় উচ্চকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন। "হেমচ্ছত্র যাঁহার মস্তকের উপর শোভা পাইত, সেই রাজশ্রী-উজ্জ্বল শিরোদেশে আজ জটাভার কেন? আমার অগ্রজের দেহ চন্দন- ও অগুরু-দ্বারা মার্জ্জিত হইত, আজ সেই অঙ্গরাগবিরহিত কান্তি ধূলিধূসর। যিনি সমস্ত বিশ্বের প্রকৃতিপুঞ্জের আরাধনার বস্তু, তিনি বনে-বনে ভিখারীর বেশে বেড়াইতেছেন,—আমার জন্যই তুমি এই সকল কষ্ট বহন করিতেছ, এই লোকগর্হিত নৃশংস জীবনে ধিক্!"—বলিতে বলিতে উচ্চস্বরে কাঁদিয়া ভরত রামচন্দ্রের পাদমূলে নিপতিত হইলেন। এই দুই ত্যাগী মহাপুরুষের মিলন-দৃশ্য বড় করুণ। ভরতের মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল, তাঁহারও মাথায় জটাজুট, দেহে চীরবাস। তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া অগ্রজের পাদমূলে লুণ্ঠিত। রামচন্দ্র বিবর্ণ ও কৃশ ভরতকে কষ্টে চিনিতে পারিলেন, অতি আদরে হাত ধরিয়া উঠাইয়া মস্তকাঘ্রাণ-পূর্ব্বক অঙ্কে টানিয়া লইলেন; বলিলেন,—"বৎস তোমার এ বেশ কেন? তোমার এ বেশে বনে আসা যোগ্য নহে।"

ভরত জ্যেষ্ঠের পাদতলে লুটাইয়া বলিলেন,—"আমার জননী মহাঘোর নরকে পতিত হইয়াছেন, আপনি তাঁহাকে রক্ষা করুন, আমি আপনার ভাই,—আপনার শিষ্য,—দাসানুদাস, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আপনি রাজ্যে আসিয়া অভিষিক্ত হউন।" বহু কথা, বহু বিতণ্ডা চলিল; ভরত বলিলেন,—"আমি চতুর্দ্দশ বৎসর

বনবাসী হইব, প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্ত্তব্য।” কোনরূপে রামকে আনিতে না পারিয়া ভরত অনশন-ব্রত ধারণ করিয়া কুটীর-দ্বারে ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া রহিলেন। রামচন্দ্র তাঁহাকে সাদরে উঠাইয়া নিজের পাদুকা তাঁহাকে প্রদান করিলেন। জটাভার শোভান্বিত করিয়া ভ্রাতৃপদরজে বিভূষিত পাদুকা তাঁহার মুকুটের স্থানীয় হইল। সহস্র ভূষণে যে শোভা দিতে অসমর্থ, এই পাদুকা সেই অপূর্ব্ব রাজশ্রী ভরতকে প্রদান করিল। ভরত বিদায়কালে বলিলেন,—“রাজ্যভার এই পাদুকায় নিবেদন করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর তোমার প্রতীক্ষায় থাকিব, সেই সময়ান্তে তুমি না আসিলে অগ্নিতে জীবন বিসর্জ্জন করিব।” অযোধ্যার সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া ভরত বলিলেন,—“অযোধ্যা আর অযোধ্যা নাই, আমি এই সিংহহীন গুহায় প্রবেশ করিতে পারিব না।” নন্দীগ্রামে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইল,- উহা রাজধানী নহে—ঋষির আশ্রম। সচিববৃন্দ জটাবল্কল-পরিহিত ফলমূলাহারী—রাজার পার্শ্বে কি বলিয়া মহার্ঘ পরিচ্ছদ পরিয়া বসিবেন?—তাঁহারা সকলে কষায়-বস্ত্র পরিতে আরম্ভ করিলেন। সেই কষায়-বস্ত্র-পরিহিত সচিববৃন্দ-পরিবৃত, ব্রত ও অনশনে কৃশাঙ্গ, ত্যাগী রাজকুমার পাদুকার উপর ছত্র ধরিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর রাজ্য পালন করিয়াছিলেন।

ভরতের এই বিষন্ন মূর্ত্তিখানি রামের চিত্তে শেলের মত বিদ্ধ হইয়াছিল। যখন সীতাকে হারাইয়া তিনি উন্মত্তবেশে পম্পাতীরে ঘুরিতেছিলেন, তখন বলিয়াছিলেন,—“এই পম্পাতীরের রমণীয় দৃশ্যাবলী সীতার বিরহে ও ভরতের দুঃখ স্মরণ করিয়া আমার রমণীয় বোধ হইতেছে না।” আর একদিন লঙ্কায় রামচন্দ্র সুগ্রীবকে বলিয়াছিলেন,—“বন্ধু, ভরতের মত ভ্রাতা জগতে কোথায় পাইব?”

রামচন্দ্র গৃহে প্রত্যাগত হইলে ভরত স্বয়ং তাঁহার পদে সেই পাদুকাদ্বয় পরাইয়া কৃতার্থ হইলেন এবং রামের পদে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"দেব, তুমি এই অযোগ্য করে যে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়াছিলে, তাহা গ্রহণ কর। চতুর্দ্দশ বৎসরে রাজকোষে সঞ্চিত অর্থ দশগুণ বেশী হইয়াছে।"

রামায়ণে যদি কোন চরিত্র ঠিক আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে তাহা একমাত্র ভরতের চরিত্র। সীতা লক্ষ্মণকে যে কটূক্তি করিয়াছিলেন, তাহা ক্ষমার্হ নহে। রামচন্দ্রের বালিবধ ইত্যাদি অনেক কার্য্যই সমর্থন করা যায় না। লক্ষ্মণের কথা অনেক সময়ে অতি রুক্ষ ও দুর্বিনীত হইয়াছে। কৌশল্যা দশরথকে বলিয়াছিলেন,—"কোন কোন জলজন্তু যেরূপ স্বীয় সন্তানকে ভক্ষণ করে, তুমিও সেইরূপ করিয়াছ।" কিন্তু ভরতের চরিত্রে কোন খুঁত নাই। পাদুকার উপর হেমচ্ছত্রধর জটাবল্কল-ধারী এই রাজর্ষির চিত্র রামায়ণে এক অদ্বিতীয় সৌন্দর্য্যপাত করিতেছে। কৈকেয়ীর সহস্রদোষ আমরা ক্ষমার্হ মনে করি যখন মনে হয়, তিনি এরূপ সুপুত্রের গর্ভধারিণী। আমরা নিষাদাধিপতি গুহকের সঙ্গে একবাক্যে ভরতের উদ্দেশে বলিতে পারি,—

"অযত্নাগত রাজ্য তুমি প্রত্যাখ্যান করিতে ইচ্ছা করিতেছ, তুমি ধন্য! জগতে তোমার তুল্য কাহাকেও দেখা যায় না।"

দীনেশচন্দ্র সেন

তাজমহল

সম্রাটের নিবাস-দুর্গের অভ্যন্তরস্থ দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিতে দেখিতে যখন আমার গাইড মীর খাঁর সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম, তখন এক সময়ে সে আমাকে এক আলোকহীন নির্ব্বাত সুরঙ্গের মধ্যে অনেকদূর পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছিল; কিছুদূর পর্য্যন্ত সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যাইতে হয়, তাহার পর পথ ক্রমে অপ্রশস্ত হইয়া আসিয়াছে এবং উহা এমন সূচিভেদ্য অন্ধকারে আবৃত যে, সে অন্ধকারে অল্পক্ষণ থাকিলেই সূর্য্যচন্দ্রালোকিত ধরণীর বক্ষোবিহারী জীবের শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিবার উপক্রম হয়। বৃহৎ একটি মশাল জ্বালাইয়া আমাদের সঙ্গে এক ব্যক্তি সেই সুরঙ্গপথে পথ দেখাইয়া যাইতেছিল, আমার এবং মীর খাঁর তৎকালীন মনোভাব কি ছিল জানি না; আমি স্বীকার করিতেছি যে, যতদূর আমি সেই সুরঙ্গপথে নামিয়া গিয়াছিলাম, ভয়লেশশূন্য দ্বিধাহীন চিত্তে যাই নাই। কিছুদূর গিয়া যখন অন্ধকার ক্রমে গাঢ় হইয়া আসিতে লাগিল এবং বায়ুহীন সুরঙ্গের আর্দ্রমৃত্তিকা আমার পায়ে ঠেকিতে লাগিল, আমি আর অগ্রসর না হইয়া মীর খাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—বাতালোকবর্জ্জিত এই পাতালপুরীর সুরঙ্গপথ মোগল বাদশাহগণের কি প্রয়োজনে লাগিত, জান? সে আমার প্রশ্নের রকম শুনিয়া হাসিয়া যাহা বলিল তাহার মর্ম্মার্থ এই:

মুসলমান বাদশাহগণের একাধিক বেগম থাকিতই। যদি কখনও কোন বেগমের স্নেহ, মমতা ও প্রেমের প্রতি

বাদশাহের সন্দেহ জন্মিত, তাহার প্রাণদণ্ডের বিধান হইত। কিন্তু বধদণ্ডার্হ সাধারণ জনগণের মৃত্যু-ব্যবস্থার সহিত বেগমগণের মৃত্যু-ব্যবস্থা এক হইতে পারে না এবং প্রকাশ্য স্থানেও তাহাদের বধকার্য্য সমাধা হইতে পারে না, সেই জন্য রঙমহলের মধ্যে এই অন্ধকার মৃত্যুপুরী নির্ম্মিত হইয়াছিল। যাহাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইত, তাহাকে এই আলোকহীন বায়ুশূন্য পাতালপুরীতে রাখিয়া তাহার প্রত্যাবর্ত্তনের পথ রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইত। অল্পকাল-মধ্যেই সে হতভাগিনী এই অন্ধকার হইতে আর কোন গাঢ়তর অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত হইত কি না কে জানে? এইরূপে নিরুদ্বেগে বেগমের জীবনলীলা সাঙ্গ হইয়া যাইত, বাহিরের কাক-প্রাণীতেও জানিতে পারিত না।

সূচিভেদ্য অন্ধকারাবৃত বাতবিবর্জ্জিত মৃত্যুপুরীর সুরঙ্গপথে দাঁড়াইয়া মীর খাঁর মুখে এই কথা শুনিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। আমি আর অগ্রসর হইলাম না। তাহাকে কহিলাম, "ফিরিয়া চল।" এই বলিয়া আমি সর্ব্বাগ্রে ফিরিয়া দাঁড়াইলাম। দ্রুতপদে, যে পথে সুরঙ্গে প্রবেশ করিয়াছিলাম সেই পথে, ফিরিয়া আসিতে লাগিলাম। অগত্যা মীর খাঁ এবং মশালচীও আমার সঙ্গে ফিরিল। সেই যমপুরীর অন্ধকার দ্বারদেশ হইতে উদ্ধারলাভ করিয়া আর বিলম্ব করি নাই এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাজগঞ্জে পৌঁছিতে হইবে বলিয়া সেই সময়েই তদভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলাম।

আগ্রাদুর্গের ফটক হইতে তাজের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত পথ নিতান্ত কম নহে। এই দীর্ঘপথ একাকী গাড়ীতে বসিয়া অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল এবং তখন মনের মধ্যে কত-কি যে উদয়

হইতেছিল তাহা আজ বিশ্লেষণ করিয়া বলিবার উপায় নাই। কেবলই আমার মনে হইতেছিল যে, ঐ অন্ধকার বায়ুবিহীন মৃত্যুপুরী শাজাহানের পূর্ব্বগত বা পরবর্ত্তী কোন সম্রাটের কীর্ত্তি; শাজাহানের আজ্ঞায় উহা কখনই নির্ম্মিত হয় নাই। প্রিয়-বিয়োগের দিন হইতে মৃত্যু-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যাঁহার অশ্রুজলের বিরাম ছিল না, যে বাদশাহের মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন, নিষ্প্রভ, উর্দ্ধতার লোচন প্রিয়দয়িতার সমাধি-মন্দিরের স্বর্ণশীর্ষ নিরীক্ষণ করিতে করিতে চিরদিনের জন্য নিমীলিত হইয়া গিয়াছে, চির-বিরহের দুঃসহ দুঃখে উচ্ছ্বসিত যাঁহার দীর্ঘশ্বাস আজও বুঝি তাজের মধ্যে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, একটি নারীর শেষশয়ন রচনা করিতে রাজকোষ শূন্য করিয়া যে প্রেমিক সপ্তসাগরের মণিমাণিক্য পরম যত্নে আহরণ করিয়াছেন, নারীবধের অমানুষিক নির্ম্মম অনুষ্ঠান তাঁহার অনুজ্ঞায় অনুষ্ঠিত হইতে পারে, ইহা আমার অন্তরাত্মা কিছুতেই মানিতে চাহিল না।

নিজ মনে এইরূপ কত-কি চিন্তা কতক্ষণ ধরিয়া করিতেছিলাম, তাহা ঠিক মনে নাই। এক সময়ে দেখিলাম আমাদের গাড়ী কতকগুলি পাথরের দোকানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কোচ্‌বক্স হইতে মীর খাঁ নামিয়া আসিয়া সেলাম করিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া দাঁড়াইল, এবং আমাকে উদ্দেশ করিয়া সসম্ভ্রমে কহিল, "হুজুর, গাড়ী তাজগঞ্জ পঁহুছ গেয়ী।" আমি সুপ্তোত্থিতের মত চমকিয়া উঠিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম।

এ যে দিনের কথা বলিতেছি, সে দিনে ম্যাক্‌ডোনাল্ড পার্ক রচিত হয় নাই, পত্র-পুষ্প-পল্লব-সমাকুলিত বৃক্ষবল্লরী-সমাকীর্ণ উদ্যানের মধ্য দিয়া নতোন্নত প্রশস্ত রাজপথ তাজ-তোরণের সম্মুখে

গিয়া শেষ হয় নাই। সে দিনে আগ্রা সহর হইতে যে পথে তাজের দ্বারদেশে পঁহুছিতে হইত সে পথ ধূলিমলিন, অমেধ্য-সমাকীর্ণ, সংস্কারবিহীন একপ্রকার দুর্গম পথই ছিল। তাজ-দর্শনার্থিগণ নানাবিধ যান-বাহনের সহায়তায় কোনমতে তাজের দ্বারদেশে গিয়া পঁহুছিত। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ তাজ-তোরণের সম্মুখে কতকগুলি প্রস্তর-বিক্রেতার দোকান থাকায় ক্রেতা ও বিক্রেতার সমবেত সোর-হাঙ্গামায় সমাধি-মন্দিরের শব্দবিহীন স্তব্ধ মহিমা এবং শান্তির সম্যক্ ব্যাঘাত জন্মাইত। গাড়ী হইতে যেমন নামিয়াছি, মুহূর্ত্তের মধ্যে দেখিলাম প্রায় ত্রিশজন পাথরওয়ালা তাহাদের নানাবিধ কারুখচিত পাথরের থালা, রেকাবী, গেলাস, বাটি লইয়া আমার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে এবং কে কত সস্তায় সে সকল দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিবে, তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিবার প্রাণপাত চেষ্টায় লাগিয়া গিয়াছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সম্রাটের প্রাণপ্রিয়তমা মহিষীর শ্মশানশয্যার দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া ক্রয়-বিক্রয়ের এই কর্ণভেদী শব্দ আমার সমস্ত হৃদয়-মনকে যেন বেত্রাঘাত করিতে লাগিল। আমি সে স্থান ত্যাগ করিয়া যথাসম্ভব সত্বরতার সহিত তাজসুন্দরীর তোরণদ্বার পার হইয়া গিয়া সেই অমল ধবল পাষাণনির্ম্মিত শোকমূর্ত্তির সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইলাম। পৃথিবীর সেই শ্রেষ্ঠতম বিস্ময়ের সম্মুখে বিস্মিত ও নিমেষহত হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম এবং কেবলই মনে হইয়াছিল যে, ইহাকে না দেখিলে এ বারের মানবজন্মটা নিতান্তই নিষ্ফল হইত।

গতপ্রায় বসন্ত-দিবসের অস্তগামী সূর্য্যালোকে তাজের অভ্যন্তরের কারুশোভা যেখানে যাহা দেখিবার ছিল, তাহা দেখিয়া

বেড়াইতে লাগিলাম। গাইড মীর খাঁ কোন্ মূল্যবান্ প্রস্তর কোথা হইতে কত মূল্যে আসিয়াছে এবং কোন্ শিল্পী কোথা হইতে আসিয়া কত দিনে কতটুকু শিল্পচাতুর্য্য দেখাইয়া গিয়াছে, তাহার বিস্তৃত তালিকা আমাকে শুনাইতে লাগিল সত্য, কিন্তু সে দিকে আমার কিছুমাত্র মনোযোগ ছিল না। আমি আমার সকল মন এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম দিয়া এই স্মৃতিমন্দিরের দেহহীন সৌন্দর্য্যটুকু ধরিবার প্রাণপাত চেষ্টা করিতেছিলাম। ইহার প্রতি-প্রস্তর-সন্নিবেশের মধ্যে বিবিধ-বর্ণানুরঞ্জিত-প্রস্তরখচিত ভিত্তিগাত্রের এবং শবাধারের আচ্ছাদন-শিলার শিল্পকৌশলের মধ্যে বাদশাহের বিপুল প্রেম এবং বিরহীর বিরাট বেদনা কেমন করিয়া বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহাই বুঝিবার চেষ্টায় আমার সকল মনঃপ্রাণের শক্তি প্রয়োগ করিতেছিলাম। সেই দিন্ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত জীবনে আমি শতাধিকবার তাজ দেখিয়াছি। প্রথম দর্শন-মুহূর্ত্তে মনে হইয়াছিল ইহা অপূর্ব্বদর্শন, ইহাকে না দেখিলে দর্শনেন্দ্রিয় সার্থক হয় না—এই মাত্র। তাই ইহাকে বারবার করিয়া দেখিয়াছি এবং বারংবার দেখিতে দেখিতে আজ বুঝিয়াছি যে, পরিণত জীবনে বিশ্ব-ভুবনের সকল-বাড়া জীবনসর্ব্বস্ব ধনটিকে চক্ষুর সম্মুখ হইতে বিদায় দিয়া সেই অসহ্য বিরহের বিপুল দুঃখে উচ্ছলিত অশ্রুসমাকুল নয়নে তাজসুন্দরীর দিকে না চাহিলে শাজাহানের সুনিবিড় প্রেম ও সুদুঃসহ বেদনার কোন পরিমাপই পাওয়া যায় না!

তাজের অভ্যন্তরভাগ দেখিয়া যখন পুনরায় বাহিরে আসিলাম তখন গোধূলিলগ্ন প্রায় সমাগত। দিনশেষের ম্লানায়মান রবি-রশ্মিকয়টি যাই-যাই করিয়াও যেন যাইতে পারিতেছে না।

শাজাহানের অফুরন্ত প্রেমের পরম ধনটি যেখানে তাহার শেষশয়ন বিছাইয়া চিরদিনের জন্য চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছে, সেই প্রেমমন্দিরের শুভ্রশীর্ষে এবং তাহার স্বর্ণচূড়ায় পরম স্নেহভরে কিয়ৎকাল অপেক্ষা না করিয়া তাহাদের যেন যাইবার উপায় নাই। নীল নির্ম্মল বসন্তাকাশের নিবিড় নীলিমার নিম্নে, পদতলবাহিনী নৃত্যপরা নীল যমুনার উর্দ্ধে, কালিন্দীর তটসংলগ্ন নিকুঞ্জের শ্যাম মহোৎসবের মধ্যে, শুভ্রমর্ম্মরবিনির্ম্মিত গম্বুজের শ্বেতাম্বুজের উপরে রবিকিরণ-সম্পাতের শোভা যে স্বচক্ষে না দেখিয়াছে, কোন বর্ণনা-দ্বারাই তাহাকে সে সৌন্দর্য্যের স্বরূপ বুঝান যায় কি না জানি না—বোধ হয়, যায় না।

সে দিন পূর্ণিমা ছিল, কি প্রতিপদ ছিল, তাহা আজ ঠিক মনে নাই—ফলতঃ সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই সম্পূর্ণ গৌরবে পূর্ণপ্রায় চন্দ্রমার বিকাশের দিন, তাহা মনে আছে। চন্দ্রকরস্নাতা তাজ-সুন্দরীর অপরূপ লাবণ্য দেখিবার জন্য উদ্যানমধ্যস্থ শ্বেতমর্ম্মরের 'চবুতরা'র উপরে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। হঠাৎ মনে হইল, অপূর্ব্ব আলোকে তাজের মর্ম্মর-গম্বুজ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। সম্মুখের দিকে চাহিয়া দেখি, কোমল জ্যোৎস্নাধারা পাষাণসুন্দরীর অঙ্গ হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া চতুর্দ্দিকের কালো আকাশ আলো করিয়া দিয়াছে। মনে হইল যেন বিচ্ছুরিত চন্দ্ররশ্মিগুলি কোমল আলোকের রজ্জুরূপে চাঁদ এবং তাজকে একগ্রন্থিবন্ধনে বাঁধিয়া দিয়াছে। প্রাণহীন কঠিন পাষাণের উপরে সূর্য্যচন্দ্রের কিরণসম্পাতে তাহাকে এমন কোমল করিয়া তুলিতে পারে, এত সৌন্দর্য্য তাহাকে দান করিতে পারে, ইহা আমি জীবনে এই প্রথম দেখিলাম; এবং ইহাই শেষ, কারণ

তাজ ব্যতীত অন্য কোন মন্দির, মীনার, মস্‌জিদ, কবর, পুরী, প্রাসাদের কথা শুনি নাই বা পুস্তকে পড়ি নাই, যাহাকে অন্তরীক্ষ-চারী রবি-চন্দ্র-তারকা প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহের রশ্মিরেখা প্রতিদিন নব নব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া মানবের নয়ন-মনের সম্মুখে আনিয়া দাঁড় করাইতে পারে।

অস্তগমনোন্মুখ রক্তরবির রক্তিম রশ্মিরেখায় মণ্ডিত তাজের সম্মুখে যখন দাঁড়াইলাম, তখন সেই দিনের কথা মনে আসিল, যে দিন সেলিম-নন্দন শাজাহান 'খুস্‌রোজের মীনাবাজারে' আসফ্‌-নন্দিনী অনূঢ়া বানুর বিপণির সম্মুখে মুগ্ধনেত্রে দাঁড়াইয়া ছিলেন। পরিপূর্ণপ্রায় চন্দ্রালোকে পরিস্নাত তাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যখন তাহাকে অনিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করিয়াছি, তখন এই মর্ম্মর-মন্দিরকে স্মৃতিসৌধ বলিয়া মনে হয় নাই। মনে হইয়াছে, রাজাধিরাজের পরিপূর্ণ প্রেমে পরম পরিতৃপ্তা প্রিয়রাণী তাঁহার অনিন্দ্য প্রৌঢ় সৌন্দর্য্যে রাজপুরী আলো করিয়া যেন অধিষ্ঠিতা রহিয়াছেন। যে দিন বালসূর্য্যের অরুণিমায় পরি-ভূষিতাঙ্গী পাষাণসুন্দরীকে দেখিয়াছি, সে দিন মনে হইয়াছে, যেন প্রাতঃস্নাতা পূজার্থিনী দেবমন্দিরে আত্মনিবেদনার্থ প্রস্তুত হইয়া মন্দিরপথ আলো করিয়া যাত্রা করিয়াছেন। দিবা-দ্বিপ্রহরের খর-রৌদ্রতাপ-স্তব্ধ বিমল যমুনার নীরব পুলিনে তাজসুন্দরীকে যে দিন বাক্যহীন মহামৌনতার মধ্যে সমাহিত দেখিয়াছি, সে দিন এই পাষাণসুন্দরী আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে প্রিয়-প্রেম-প্রার্থিনী পঞ্চতপা পার্ব্বতীর পরিপূর্ণ গৌরবে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন!

দুঃখ-শোক-বন্ধন-বেদনায় জর্জ্জরিত মানবজীবনে প্রেমের মত একান্ত প্রার্থনার সামগ্রী হয়ত দ্বিতীয় আর নাই। শাজাহান

যাহা পাইয়াছিলেন, তাহা মানবজীবনে দুষ্প্রাপ্য এবং রাজজীবনে অপ্রাপ্য বলিলেও বোধ করি অত্যুক্তি হয় না। কিশোরী বানুর সৌন্দর্য্যমুগ্ধ শাহজাদা শাজাহান যে দিন এই নারীরত্নকে জীবন-সঙ্গিনীরূপে অন্তঃপুরের একান্তে বরণ করিয়া লন, সেই দিন হৃদয়ের নিভৃত-নন্দনজাত প্রেমমন্দারদামে যে অমূল্য অর্ঘ্য তাঁহার জন্য রচিত হইয়াছিল, তাহার একটিমাত্র পরাগকেশরও জীবনে পরিম্লান বা ধূলিমলিন হইতে পারে নাই। নারীজীবনে ইহার অধিক সৌভাগ্য আর কি আছে? প্রথম দর্শনের মাহেন্দ্র মুহূর্ত্ত হইতে যে প্রেম ইহাদিগকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল, কোনও প্রতিকূল ঘটনাতেই সে প্রেমের সার্থকতা হইতে ইহাদিগকে বঞ্চিত হইতে হয় নাই। সৌভাগ্য বা সঙ্কটে, যখন যে অবস্থায় পড়িয়াছেন, এই রাজদম্পতীকে এক দিনের জন্যও পরস্পরের বাহুবন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে কেহই পারে নাই। যখন সর্ব্বগ্রাসী কাল আসিয়া সেই অখণ্ড মিলনের মধ্যে বিয়োগের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর রচনা করিয়া দিল, শাজাহানের সে দিনের বেদনা কেবল তিনিই জানিয়াছিলেন! তাঁহার সে দিনের সেই উচ্ছ্বসিত শোকের হাহাকার-ধ্বনিতে আকাশতল নিত্যকাল ধ্বনিত করিয়া রাখিবার নিমিত্ত এই মৌন মর্ম্মর-মন্দিরের প্রতি-প্রস্তর-সন্নিবেশের মধ্যে তিনি যে নিদারুণ দীর্ঘশ্বাস রাখিয়া গিয়াছেন, প্রিয়-বিরহী আসিয়া এইখানে দাঁড়াইলে সে বক্ষোবিদারী দীর্ঘশ্বাস আজও শুনিতে পায়! তাই তাজকে সে আর কেবল প্রাণহীন স্মৃতিসৌধ বলিয়া মনেই করিতে পারে না!

জগদিন্দ্রনাথ রায়

আমরা ও তোমরা

তোমরা ও আমরা বিভিন্ন; কারণ তোমরা তোমরা, এবং আমরা আমরা! তা যদি না হ'ত, তা হ'লে ইউরোপ ও এশিয়া এ দুই, দুই হ'ত না,—এক হ'ত। 'আমি' ও 'তুমি'র প্রভেদ থাক্‌ত না। আমরা ও তোমরা উভয়ে মিলে, হয় শুধু আমরা হতুম, না হয় শুধু তোমরা হ'তে।

আমরা পূর্ব্ব, তোমরা পশ্চিম। আমরা আরম্ভ, তোমরা শেষ। আমাদের দেশ মানব-সভ্যতার সূতিকাগৃহ, তোমাদের দেশ মানব-সভ্যতার শ্মশান। আমরা ঊষা, তোমরা গোধূলি। আমাদের অন্ধকার হ'তে উদয়, তোমাদের অন্ধকারের ভিতর বিলয়।

আমাদের রং কালো, তোমাদের রং সাদা। আমাদের বসন সাদা, তোমাদের বসন কালো। তোমরা শ্বেতাঙ্গ ঢেকে রাখো, আমরা কৃষ্ণদেহ খুলে রাখি। আমাদের আকাশ আগুন, তোমাদের আকাশ ধোঁয়া। নীল তোমাদের স্ত্রীলোকের চোখে, সোণা তোমাদের স্ত্রীলোকের মাথায়; নীল আমাদের শূন্যে, সোণা আমাদের মাটির নীচে। তোমাদের ও আমাদের অনেক বর্ণভেদ। ভুলে যেন না যাই যে, তোমাদের দেশ ও আমাদের দেশের মধ্যে কালাপানির ব্যবধান। কালাপানি পার হ'লে আমাদের জাত যায়, না হ'লে তোমাদের জাত থাকে না।

তোমরা দৈর্ঘ্য, আমরা প্রস্থ। আমরা নিশ্চল, তোমরা চঞ্চল। আমরা ওজনে ভারি, তোমরা দামে চড়া। অপরকে বশীভূত করবার তোমাদের মতে একমাত্র উপায়—গায়ের জোর, আমাদের

মতে একমাত্র উপায়—মনের নরম ভাব। তোমাদের পুরুষের হাতে ইস্পাত্, আমাদের মেয়েদের হাতে লোহা। আমরা বাচাল, তোমরা বধির। আমাদের বুদ্ধি সূক্ষ্ম—এত সূক্ষ্ম যে আছে কি না বোঝা কঠিন, তোমাদের বুদ্ধি স্থূল—এত স্থূল যে কতখানি আছে তা বোঝা কঠিন। আমাদের কাছে যা সত্য, তোমাদের কাছে তা কল্পনা,—আর তোমাদের কাছে যা সত্য, আমাদের কাছে তা স্বপ্ন।

তোমরা বিদেশে ছুটে বেড়াও, আমরা ঘরে শুয়ে থাকি। আমাদের সমাজ স্থাবর, তোমাদের সমাজ জঙ্গম। তোমাদের আদর্শ জানোয়ার, আমাদের আদর্শ উদ্ভিদ্। তোমাদের সুখ ছট্‌ফটানিতে, আমাদের সুখ ঝিমুনিতে। সুখ তোমাদের ideal, দুঃখ আমাদের real. তোমরা চাও দুনিয়াকে জয় করবার বল, আমরা চাই দুনিয়াকে ফাঁকি দেবার ছল। তোমাদের লক্ষ্য আরাম, আমাদের লক্ষ্য বিরাম। তোমাদের নীতির শেষ কথা শ্রম, আমাদের আশ্রম।

তোমাদের মেয়ে প্রায় পুরুষ, আমাদের পুরুষ প্রায় মেয়ে। বুড়ো হ'লেও তোমাদের ছেলেমি যায় না, ছেলেবেলায়ও আমরা বুড়োমিতে পরিপূর্ণ। আমরা বিয়ে করি যৌবন না আসতে, তোমরা বিয়ে কর যৌবন গত হ'লে। তোমরা যখন সবে গৃহপ্রবেশ কর, আমরা তখন বনে যাই।

তোমাদের আগে ভালবাসা—পরে বিবাহ, আমাদের আগে বিবাহ—পরে ভালবাসা। আমাদের বিবাহ 'হয়', তোমরা বিবাহ 'কর'। আমাদের ভাষায় মুখ্য ধাতু 'ভূ', তোমাদের ভাষায় 'কৃ'। তোমাদের রমণীদের রূপের আদর আছে, আমাদের রমণীদের

গুণের কদর নেই। তোমাদের স্বামীদের পাণ্ডিত্য চাই অর্থশাস্ত্রে, আমাদের স্বামীদের পাণ্ডিত্য চাই অলঙ্কারশাস্ত্রে।

এক কথায়, তোমরা যা চাও, আমরা তা চাইনে; আমরা যা চাই, তোমরা তা চাও না;—তোমরা যা পাও, আমরা তা পাইনে; আমরা যা পাই, তোমরা তা পাও না। আমরা চাই এক, তোমরা চাও অনেক। আমরা একের বদলে পাই শূন্য, তোমরা অনেকের বদলে পাও একের পিঠে অনেক শূন্য। তোমাদের দার্শনিক চায় যুক্তি, আমাদের দার্শনিক চায় মুক্তি। তোমরা চাও বাহির, আমরা চাই ভিতর। তোমাদের পুরুষের জীবন বাড়ীর বাহিরে, আমাদের পুরুষের মরণ বাড়ীর ভিতরে। আমাদের গান, আমাদের বাজনা তোমাদের মতে শুধু বিলাপ; তোমাদের গান, তোমাদের বাজনা আমাদের মতে শুধু প্রলাপ। তোমাদের বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য—সব জেনে কিছু না জানা, আমাদের জ্ঞানের উদ্দেশ্য—কিছু না জেনে সব জানা। তোমাদের পরলোক স্বর্গ, আমাদের ইহলোক নরক; কাজেই পরলোক তোমাদের গম্য, ইহলোক আমাদের ত্যাজ্য। তোমাদের ধর্ম্মমতে আত্মা অনাদি নয় কিন্তু অনন্ত, আমাদের ধর্ম্মমতে আত্মা অনাদি কিন্তু অনন্ত নয়,—তার শেষ নির্ব্বাণ।

পূর্ব্বেই বলেছি প্রাচী ও প্রতীচী পৃথক্। আমরাও ভাল, তোমরাও ভাল,—শুধু তোমাদের ভাল আমাদের মন্দ, ও আমাদের ভাল তোমাদের মন্দ। সুতরাং অতীতের আমরা ও বর্ত্তমানের তোমরা, এই দু'য়ে মিলে যে ভবিষ্যতের তা'রা হ'বে—তাও অসম্ভব।

প্রমথ চৌধুরী

শুভ উৎসব

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংঘর্ষে আর যাহাই হউক, আমাদের পুরাতন বিচিত্র উৎসবকলা যে ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। এখনকার উৎসবগুলি ক্রমশঃই যেন আপিসী ছাঁচে গঠিত হইয়া উঠিতেছে—তাহার মধ্যে দেনাপাওনা হিসাবপত্রের হাঙ্গামা যত অধিক, আনন্দ আর সে পরিমাণে নাই। পূর্ব্বে যে দেনাপাওনার সম্বন্ধ আদৌ ছিল না তাহা নহে, এবং হয়ত সূক্ষ্মরূপে বিচার করিয়া দেখিলে আর্থিক সম্বন্ধ তখনও এখনকার মত প্রবল ছিল, কিন্তু অন্যপ্রকার সম্বন্ধের আবরণে এই হিসাবী সম্বন্ধটা তখন কোথাও বড় প্রবল হইয়া আত্মপ্রকাশ করিবার অবসর পাইয়া উঠে নাই। ব্রাহ্মণ ফলাহারের পর দক্ষিণা না লইয়া বাড়ী ফিরিতেন না, কিন্তু দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে এমন একটি মধুর সম্বন্ধ ছিল যে, দক্ষিণা আর্থিকতা তাহার মধ্যে স্থান পাইত না। মন্ত্রপাঠের ব্রাহ্মণ হইতে সুরু করিয়া কামার কুমোর ধোপা নাপিত হাড়ি ডোম পর্য্যন্ত সকলেরই নিজ নিজ মর্য্যাদানুসারে উৎসবাঙ্গে স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল—কাহাকেও বাদ দিলে চলিত না।

কিন্তু এখন ইংরাজী পণ্যশালার অনুগ্রহে যান্ত্রিক ভাবেই অনেক কার্য্য নিঃশব্দে সমাধা হইয়া উঠে। এক কলমের আঁচড়ে হ্যারিসন হ্যাথাওয়ে, হোয়াইট্যাওয়ে লেড্‌ল, অস্‌লর, ল্যাজরাসের ভবন হইতে যাহা কিছু আবশ্যক আনাইয়া লওয়া যায়; এমন

কি, নাপিত, পাচক, পরিবেষকাদিও সংগ্রহ করিতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু আমাদের পণ্যক্রিয়ার মধ্যে সজীব সহৃদয় মনুষ্যত্বের মধুর সংস্পর্শে যে একটি নিগূঢ় আনন্দ ছিল, ইহাতে সেটুকু দিতে পারে না স্বীকার করিতে হয়।—তখনকার দিনে বড়লোকের বাটীতে কোন ক্রিয়াকর্ম্মোপলক্ষে মাসেক কাল পূর্ব্ব হইতে নানাবিধ পণ্যভার লইয়া দোকানী-পসারীরা গতিবিধি সুরু করিত। শালওয়ালা ভাল ভাল কাশ্মীরী শাল ও রুমাল লইয়া আসিত, মুর্শিদাবাদ ও ঘাটাল-অঞ্চলের বণিকেরা নানাবিধ গরদ, তসর ও রেশমী বস্ত্র আমদানি করিত, ঢাকা শান্তিপুর ফরাসডাঙ্গা সিমলার বেপারীরা কত প্রকারের সূক্ষ্ম ও বিচিত্রপাড় কার্পাসবস্ত্র এবং পশ্চিমী ক্ষেত্রীরা বেনারসী ও চেলির জোড় লইয়া উপস্থিত হইত। এতদ্ভিন্ন, স্বর্ণকার কর্ম্মকার মালাকার ময়রা গোয়ালা পাথরওয়ালা কাংস্য-পিত্তল-বিক্রেতা—নানান্ জনে নানাবিধ ফরমাসে নিত্য গতায়াত করিত। এমন কি, বেদানার বস্তা লইয়া বিদেশী কাবুলীওয়ালা পর্য্যন্ত বাদ যাইত না। কিন্তু এ গতিবিধি নিতান্তই বাহিরের লোকের মত ছিল না, এবং এই খরিদ-বিক্রয়টুকুর মধ্যেই তাহাদের সমস্ত সম্বন্ধ শেষ হইয়া যাইত না। সকলেই উৎসাহসহকারে উৎসবের নানাবিধ অনুষ্ঠান-বিষয়ে পাঁচটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিত, মন্তব্য দিত, প্রশ্ন করিত, কোথায় কি হইবে না-হইবে দেখিয়া-শুনিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, কাজের দিনে বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেপুলেগুলিকে লইয়া উৎসব দেখিতে আসিত, এবং পুরাতন কাবুলীওয়ালা তাহার সখের জরীর কোর্ত্তা গায়ে দিয়া প্রসন্নমুখে দ্বারদেশে আসিয়া প্রহরী হইয়া দাঁড়াইত। নিতান্ত জড়-বিনিময় মাত্র

না হইয়া আমরা তাহাদের পণ্যসামগ্রীর সহিত অন্তরের শুভ-প্রীতিও অনেকখানি করিয়া লাভ করিতাম, এবং মুদ্রাখণ্ডের সহিত উৎসবের ভাগও কতক পরিমাণে দিতাম। এই যে অন্তরে-অন্তরে "ফাউ" আদান-প্রদানটুকু, ইহাতেই বিশেষ আনন্দ এবং এইটুকুর জন্যই আমাদের মধ্যে আর্থিক সম্বন্ধে হীনতা সহজে দেখা ।

কেবলি যে বাহিরে বাহিরে এইরূপ গতিবিধি ও আদানপ্রদান ছিল তাহাও নহে। অন্তঃপুরে কুম্ভকারপত্নী নূতন বরণডালা সাজাইয়া আনিয়া দিত, মালিনী নিত্য নব নব ফুলভার যোগাইত এবং ফুলসজ্জার জন্য নূতন নূতন ফুলের গহনা প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিত, নাপিতানী দিদিঠাকুরাণী ও বধূঠাকুরাণীদিগের কোমল পদপল্লবে ঝামা ঘষিয়া আল্‌তা পরাইয়া দিয়া যাইত, তাঁতিনী নূতন নূতন পাড়ের মনোহারিণী নীলাম্বরী ও বিচিত্র বর্ণের শাটিকা লইয়া আসিত। গোয়ালিনী মধ্যাহ্নভোজনান্তে, আর কিছু না হউক, গোয়ালাপাড়ার দুইটা মন্তব্য শুনাইয়া যাইত, এবং পাড়ার বৃদ্ধা ব্রাহ্মণঠাকুরাণী স্বহস্তকর্ত্তিত কয়গাছি পৈতার সূতা আনিয়া দিয়া পা ছড়াইয়া গল্প করিতে বসিতেন। এই এতগুলি বর্ষীয়সী- ও যুবতী-সমাগম যে নিতান্ত যান্ত্রিকভাবে সাধিত হইত না, সে কথা বলাই বাহুল্য। হাস্যপরিহাস গল্পগুজন সমালোচনা বিধিব্যবস্থা-নির্দ্ধারণ ও নানা অনাবশ্যক উপদেশ পরামর্শ ও বিচার-প্রসঙ্গে বয়স্‌ ও অবস্থার তারতম্য ঘুচিয়া গিয়া সকলের মধ্যে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ও সরস হইয়া উঠিত—দেনাপাওনার সম্বন্ধটুকু আদৌ প্রকাশ পাইত না। সকলেই যেন আত্মীয়-পরিজনবর্গের মধ্যে—যেন একটি বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারের নানা অঙ্গ।

এইরূপে আমাদের প্রত্যেকের কোন শুভানুষ্ঠানের মধ্যে অলক্ষিতে এই এতগুলি লোকের শুভকামনা কার্য্য করিত, এবং ইহাতেই আমাদের সামান্য ক্রিয়াকর্ম্মও বৃহৎ উৎসবে পরিণত হইত। নব্যতন্ত্র রজতচক্রকে যেরূপ সকল সম্বন্ধের মধ্য-বিন্দু করিয়া তুলিতে চাহে, তখন তাহা ছিল না। ধনের প্রদমর্য্যাদা যথেষ্ট থাকিলেও কুলের গৌরবকে, প্রীতির সম্বন্ধকে সে লঙ্ঘন করিতে পারিত না। এমন কি, বেতনভুক্ সামান্য দাসদাসীদিগকেও সংসারের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে দেখা হইত, এবং সুগৃহিণী ইহাদের কেহ ক্ষুধিত থাকিতে নিজের মুখে অন্ন তুলিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইতেন। এই যে হৃদ্যতাটুকু—এই যে ব্যথার ব্যথী ভাব—ইহা আর কিছুতেই থাকে না। পূর্ব্বে যেখানে প্রীতিসূচক আত্মীয়তাই স্বাভাবিক ছিল, এক্ষণে সেখানে নিকট-সম্বন্ধস্থাপনই অনেক সময় অত্যন্ত অশোভন ও অসঙ্গত বলিয়া ঠেকে। আশ্রিতজন এক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায় হৃদয়ের আশ্রয় আর বড় পায় না, এবং আশ্রয়দাতাও তাহাদের হৃদয়ের অধীশ্বরত্ব হইতে বঞ্চিত হয়েন। অন্তরে-অন্তরে কাহারও সহিত কাহারও কোনরূপ অনিবার্য্য যোগ নাই।

আমাদের উৎসবে এই অন্তরেরই প্রথম প্রতিষ্ঠা। সমারোহ-সহকারে আমোদ-প্রমোদ করায় আমাদের উৎসবকলা কিছুমাত্র চরিতার্থ হয় না, কিন্তু তাহার মধ্যে সর্ব্বজনের আন্তরিক প্রসন্নতা ও শুভ ইচ্ছাটুকু না থাকিলে নয়। উৎসব-প্রাঙ্গণ হইতে সামান্য ভিক্ষুকও যদি ম্লানমুখে ফিরিয়া যায়, শুভ উৎসব যেন একান্ত ক্ষুণ্ণ হয়। যাত্রা হউক, কথা হউক, রামায়ণগান হউক বা চণ্ডীপাঠ হউক,—যখন যাহা হয় উন্মুক্ত গৃহ-প্রাঙ্গণে আসিয়া

সর্ব্বসাধারণে তাহাতে অকাতরে যোগদান করে, এবং সকলের সহিত একত্র হইয়া গৃহকর্ত্তা তাহা উপভোগ করেন।

যাহাতে আমার নিজের কিছুমাত্র আনন্দ আছে, সেই আনন্দটুকু যখন দশজনের মধ্যে বিতরণ করিতে চাহি, তখন উপলক্ষের অভাব ঘটিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। আমার আনন্দে সকলের আনন্দ হউক, আমার শুভে সকলের শুভ হউক, আমি যাহা পাই তাহা পাঁচজনের সহিত মিলিত হইয়া উপভোগ করি—এই কল্যাণী ইচ্ছাই উৎসবের প্রাণ। অনেক ছোটখাট বিষয়েও আমি হয়ত এতটুকু আনন্দ পাই,—নিজের বাড়ীখানি হইলে সুখী হই, পুষ্করিণীটি থাকিলে লাগে ভাল, গোরুগুলির কল্যাণকামনা করি—গৃহপ্রবেশ, জলাশয়-প্রতিষ্ঠা, গোষ্ঠাষ্টমী—এইরূপ এক একটি উৎসব-উপলক্ষে পাঁচজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী, পোষ্যপরিজন, দীনদুঃখীকে আহ্বান করিয়া যথাসাধ্য সৎকারে আমার সুখের ভাগী করিতে চাহি। আমি যে আজ একজন গৃহহীনকে আশ্রয় দিতে পারি, তৃষ্ণার্ত্তের পিপাসা নিবারণ করিতে পারি, অবোলা জীবের কিছুমাত্র সুখবিধান করিতে সমর্থ হই, আমার এ সৌভাগ্য যেন সকলের অন্তরে সঞ্চারিত করিয়া দিতে চাহে। সাবিত্রীব্রত, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, জামাতৃষষ্ঠী-উপলক্ষে আপন প্রিয়জন ও স্নেহাস্পদগণকে যথাযোগ্য সৎকার করিয়া নিজেকে ধন্য মনে হয়; বিধাতা আমাকে যে এত সৌভাগ্যসুখ দিয়াছেন, ইহা সকলের সহিত বণ্টন করিয়া না লইলে ইহার সফলতা কোথায়? উৎসব ইহারই উপলক্ষ। সেই জন্য আমাদের উৎসবে ভাবেরই প্রাধান্য—বাহিরের সমারোহ তাহার প্রধান অঙ্গ নহে। পতিব্রতা স্ত্রীর হাতের সামান্য লোহা

ও মাথার সিন্দুর যেমন আমাদের মনে একটি অনির্ব্বচনীয় লক্ষ্মীশ্রী সূচিত করিয়া দেয়, নেত্রঝলসী অলঙ্কাররাজি তাহা পারে না,—প্রীতি-বিকশিত উৎসবের সামান্য মঙ্গলঘট ও চূতপল্লবগুচ্ছ সেইরূপ আমাদের অন্তরে একটি শিবসুন্দর ভাব সঞ্চারিত করিয়া তুলে, সহস্র তাড়িতালোক ও বিলাস-উৎসে সে শুভ কমনীয়তা সঞ্চার করিতে পারে না। বিলাসের মণিমুক্তা আমাদের বাহিরের ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক মাত্র, কিন্তু উৎসবের ধান্যদূর্ব্বামুষ্টি অন্তরের অকৃত্রিম শুভকামনার বাহ্য চিহ্ন। ইহার সহিত ধনীর রত্নভাণ্ডারেরও তুলনা সম্ভব নহে। ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীতের মত ইহার মধ্যে যেন কেমন একটি অক্ষুণ্ন শুচিতা আছে—বাহ্যাড়ম্বর-বাহুল্যের সহিত তাহার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ক্ষমার আদর্শ

চন্দ্র ধীর গতিতে মেঘের কোলের ভিতর দিয়া বহিয়া যাইতে-ছিল। নীচে নদী কুলকুল শব্দে বায়ুর সঙ্গে সুর মিশাইয়া নাচিতে নাচিতে বহিয়া যাইতেছিল। আধ জোছনা আধ অন্ধকারে মিশিয়া পৃথিবীর সৌন্দর্য্য অপূর্ব্ব দেখাইতেছিল। চারি দিকে ঋষির আশ্রম। এক একটি আশ্রম নন্দনবনকে ধিক্কার প্রদান করিতেছিল। এক একখানি ঋষির কুটির তরু, পুষ্প ও বৃক্ষলতা-শোভিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল।

একদিন এইরূপ জ্যোৎস্নাপুলকিত রাত্রে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেব সহধর্ম্মিণী অরুন্ধতী দেবীকে বলিতেছিলেন, "দেবি, ঋষি বিশ্বামিত্রের নিকট হইতে একটু লবণ ভিক্ষা করিয়া আন।" এই প্রশ্নে অরুন্ধতী দেবী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, এ কি আজ্ঞা করিতেছেন, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যে আমায় শত পুত্র হইতে বঞ্চিত করিয়াছে—" এই কথা বলিতে বলিতে দেবীর স্বর অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, সমস্ত পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগিয়া উঠিল, সে অপূর্ব্ব শান্তির আলয়—গভীর হৃদয় ব্যথিত হইল; তিনি বলিতে লাগিলেন, "আমার শত পুত্র এই জোছনা-শোভিত রাত্রে বেদ গান করিয়া বেড়াইত, শত পুত্রই আমার বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ, আমার এইরূপ শত পুত্রই সে বিনষ্ট করিয়াছে; তাহার আশ্রম হইতে লবণ ভিক্ষা করিয়া আনিতে বলিতেছেন? আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছি।"

ধীরে ধীরে ঋষির মুখ জ্যোতিঃপূর্ণ হইয়া উঠিল, ধীরে ধীরে সাগরোপম হৃদয় হইতে এই কয়টি বাক্য নিঃসৃত হইল, "দেবি, আমি তাহাকে যে ভালবাসি।" অরুন্ধতীর বিস্ময় আরও বর্দ্ধিত হইল; তিনি বলিলেন, "আপনি যদি তাহাকে ভালবাসেন ত তাহাকে 'ব্রহ্মর্ষি' বলিয়া সম্বোধন করিলেই ত জঞ্জাল মিটিয়া যাইত, আমাকেও শত পুত্র হইতে বঞ্চিত হইতে হইত না।" ঋষির মুখ অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল; তিনি বলিলেন, "তাহাকে ভালবাসি বলিয়াই ত তাহাকে ব্রহ্মর্ষি বলি নাই; আমি তাহাকে ব্রহ্মর্ষি বলি নাই বলিয়াই তাহার ব্রহ্মর্ষি হইবার আশা আছে।"

আজ বিশ্বামিত্র ক্রোধে জ্ঞানশূন্য। আজ আর তাঁহার তপস্যায় মনোনিবেশ হইতেছে না। তিনি সঙ্কল্প করিয়াছেন, আজ যদি বশিষ্ঠ তাঁহাকে ব্রহ্মর্ষি না বলেন তাহা হইলে তাঁহার প্রাণসংহার করিবেন। সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি তরবারি-হস্তে কুটির হইতে বহির্গত হইলেন। ধীরে ধীরে বশিষ্ঠদেবের কুটির-পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বশিষ্ঠদেবের সমস্ত কথা শুনিলেন। মুষ্টিবদ্ধ তরবারি হস্তে শিথিল হইয়া পড়িল; ভাবিলেন, 'কি করিয়াছি, না জানিয়া কি অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, না জানিয়া কাহার নির্ব্বিকার চিত্তে ব্যথা দিতে চেষ্টা করিয়াছি!' হৃদয়ে শত-বৃশ্চিক-দংশন-যন্ত্রণা অনুভূত হইল। অনুতাপে হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। দৌড়িয়া গিয়া বশিষ্ঠের পদপ্রান্তে পতিত হইলেন। কিছুক্ষণ বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, ক্ষণপরে বলিলেন, "ক্ষমা করুন, কিন্তু আমি ক্ষমাভিক্ষারও অযোগ্য।" গর্ব্বিত হৃদয় অন্য কিছু বলিতে পারিল না। কিন্তু বশিষ্ঠ কি করিলেন? বশিষ্ঠ দুই হাত দিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বলিলেন, "উঠ, ব্রহ্মর্ষি, উঠ।"

দ্বিগুণ লজ্জায় বিশ্বামিত্র বলিলেন, "প্রভু, কেন লজ্জা দেন!" বশিষ্ঠদেব উত্তর করিলেন, "আমি কখনও মিথ্যা বলি না—আজ তুমি ব্রহ্মর্ষি হইয়াছ, আজ তুমি অভিমান ত্যাগ করিয়াছ। আজ তুমি ব্রহ্মর্ষিপদ লাভ করিয়াছ।" বিশ্বামিত্র বলিলেন, "আমাকে আপনি ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিন।" বশিষ্ঠ উত্তর করিলেন, "অনন্তদেবের নিকট যাও, তিনিই তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিবেন।"

অনন্তদেব যেখানে পৃথিবী মস্তকে ধরিয়া আছেন, বিশ্বামিত্র সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তদেব বলিলেন, "আমি তোমায় ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিতে পারি, যদি তুমি এই পৃথিবী মস্তকে ধারণ করিতে পার।" তপোবলে গর্ব্বিত বিশ্বামিত্র বলিলেন, "আপনি পৃথিবী ত্যাগ করুন, আমি মস্তকে ধারণ করিতেছি।" অনন্তদেব বলিলেন, "ধারণ কর, আমি ত্যাগ করিলাম।" শূন্যে পৃথিবী ঘুরিতে ঘুরিতে পড়িতে লাগিল!

বিশ্বামিত্র ডাকিয়া বলিতেছেন, "আমি সমস্ত তপস্যার ফল অর্পণ করিতেছি, পৃথিবী ধৃত হউক।" তথাপি পৃথিবী স্থির হইল না। উচ্চৈঃস্বরে অনন্তদেব বলিলেন, "বিশ্বামিত্র, এত তপস্যা কর নাই যে পৃথিবী ধারণ করিবে। কখনও কি সাধুসঙ্গ করিয়াছ? তাহার ফল অর্পণ কর।" বিশ্বামিত্র বলিলেন, "এক মুহূর্ত্ত বশিষ্ঠের সঙ্গ করিয়াছি।" অনন্তদেব বলিলেন, "তবে সেই ফল অর্পণ কর।" বিশ্বামিত্র বলিলেন, "আমি সেই ফল অর্পণ করিতেছি।" ধীরে ধীরে পৃথিবী স্থির হইল! তখন বিশ্বামিত্র বলিলেন, "এখন আমায় ব্রহ্মজ্ঞান দিন।" অনন্তদেব বলিলেন, "মূর্খ বিশ্বামিত্র, যাহার এক মুহূর্ত্ত সঙ্গফলে পৃথিবী ধৃত হইল তাঁহাকে ছাড়িয়া আমার নিকট ব্রহ্মজ্ঞান চাহিতেছ?" বিশ্বামিত্রের ক্রোধ হইল;

ভাবিলেন, বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে তবে প্রতারণা করিয়াছেন। দ্রুত তাঁহার নিকট গমন করিয়া বলিলেন, "আপনি আমায় কেন প্রতারণা করিলেন?" বশিষ্ঠদেব অতি ধীর-গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "আমি যদি তখন তোমায় ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিতাম, তোমার তাহাতে বিশ্বাস হইত না, এখন তোমার বিশ্বাস হইবে।" বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের নিকট ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা করিলেন।

ভারতে এমন ঋষি ছিলেন, এমন সাধু ছিলেন, এমন ক্ষমার আদর্শ ছিল। এমন তপস্যার বল ছিল, যাহার দ্বারা পৃথিবী ধারণ করা যায়। ভারতে আবার সেইরূপ ঋষি জন্মগ্রহণ করিতেছেন, যাঁহাদের প্রভায় পূর্ব্বতন ঋষিদিগের জ্যোতি হীনপ্রভ হইয়া যাইবে, যাঁহারা আবার ভারতকে পূর্ব্বগৌরব হইতে অধিকতর গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

অরবিন্দ ঘোষ

আকবর ও আলিবর্দ্দী

মোগলকেশরী ভারত-সম্রাট্ আকবর বাদশাহের উদারনীতি জাতিনির্ব্বিশেষে ভারতবাসীর হৃদয়ে শান্তি-সুখের সঞ্চার করিয়াছিল। বিশেষতঃ, হিন্দুগণকে তিনি নানাপ্রকার অধিকার প্রদান করিয়া যেরূপ মহত্ত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা ভারত-ইতিহাসে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 'জিজিয়া' কর রহিত করিয়া তিনি হিন্দুদিগের নিকট হইতে অক্ষয় আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলেন এবং যাত্রিকরের অপ্রচলন করায় হিন্দুগণ প্রতিনিয়ত তাঁহার মহত্ত্ব কীর্ত্তন করিত। তদ্ব্যতীত যাহাতে হিন্দুসন্তানগণ যুদ্ধকালে দাসরূপে ব্যবহৃত হইতে না পারে, তদ্বিষয়েও তিনি নিষেধাজ্ঞার প্রচার করিয়া মহীয়সী কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার কোনরূপ বিদ্বেষ ছিল না। বিশেষতঃ, তিনি হিন্দুদিগের অনেক প্রকার আচার-ব্যবহারের প্রশংসা করিতেন এবং নিজেও তাহাদের মধ্যে কোন কোনটি অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই জন্য এরূপ প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছিল যে, তিনি পূর্ব্বজন্মে ব্রাহ্মণ-সন্তান ছিলেন। হিন্দুদিগের প্রতি তাঁহার উদার-ভাব-প্রদর্শনের জন্যই হিন্দুরা যে তাঁহাকে আপনাদের বলিয়া ঘোষণা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, পূর্ব্বোক্ত প্রবাদ তাহারই সমর্থন করিতেছে। ব্রাহ্মণদিগকে নিষ্করে বা অল্প করে ভূমিপ্রদানের ব্যবস্থা করিয়া ও স্থল-বিশেষে গোহত্যা ও ব্রহ্মহত্যার নিষেধাজ্ঞা দিয়া তিনি হিন্দুদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি কেবল হিন্দুদিগের প্রতি উদারভাব প্রদর্শন

করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহাদিগের সহিত সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ করিবার জন্য অশেষবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি আপনাকে ও স্বীয় পুত্রদিগকে রাজপুতগণের সহিত বৈবাহিক-সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বংশীয়গণও তাঁহার আদর্শের অনুগামী হইয়াছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা, হিন্দুদিগের উচ্চরাজপদে নিয়োগ তাঁহার ঔদার্য্য ও মহত্ত্বের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। কি সৈনিকবিভাগ, কি শাসনবিভাগ, কি রাজস্ববিভাগ, কি মন্ত্রণাবিভাগ সর্ব্বত্রই তিনি মুসলমানদিগের সহিত সমভাবে হিন্দুদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মানসিংহ, বীরবল, তোড়রমল্লের নাম কে না অবগত আছেন? ইঁহারা যে আকবরের দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ ছিলেন, তাহাও ইতিহাস-পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। হিন্দুদিগের প্রতি এইরূপ উদার-ভাব-প্রদর্শনের ফলে তাঁহার রাজ্যে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহাদের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতিবশতঃ তিনি বলপূর্ব্বক সতীদাহাদি-নিবারণেরও চেষ্টা করিয়াছিলেন। ফলতঃ, আকবর বাদশাহ উদারনীতি অবলম্বন করিয়া হিন্দুদিগকে যেরূপ কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, ভারতে কোন মুসলমান সম্রাট্ সেরূপ করেন নাই।

যে নীতি অবলম্বন করিয়া আকবর বাদশাহ ভারতে মোগল-সাম্রাজ্য সুদৃঢ় করিয়াছিলেন, সেই নীতি অবলম্বন করিয়াই বাঙ্গালার একজন নবাব হিন্দুজাতির, বিশেষতঃ বাঙ্গালীগণের, আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম প্রাতঃস্মরণীয় আলিবর্দ্দী খাঁ মহবৎজঙ্গ। আলিবর্দ্দী খাঁর নিকট বাঙ্গালা যেরূপ ঋণী, আকবরের নিকট সমগ্র হিন্দুজাতি সেরূপ ঋণী কি না সন্দেহ। যদিও আকবরের প্রবর্ত্তিত উদারনীতি আলিবর্দ্দীর সময় পর্য্যন্তও

মোগল-সাম্রাজ্যে প্রচলিত ছিল বলিয়া তাঁহার সে বিষয়ে বিশেষ কোন মৌলিকতা নাই, তথাপি তিনি বাঙ্গালীকে যে সমস্ত অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা আর বাঙ্গালার ইতিহাসের কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না। আকবরের ন্যায় তাঁহার রাজত্বে হিন্দুজাতি বা হিন্দুধর্ম্মের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এমন কি, দেখিতে পাওয়া যায় যে, সে সময়ে মুসলমানগণ হিন্দুদিগের সহিত হোলি-উৎসবে যোগদান করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন। আলিবর্দ্দীর এইরূপ উদারভাব তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী নবাব সুজাউদ্দীনের নিকট হইতে গৃহীত হইলেও তিনি স্বীয় মহত্ত্ব-প্রভাবে তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে সময়ে হিন্দুপর্ব্বোপলক্ষে মুর্শিদাবাদের নবাব-দরবার বন্ধ থাকিত; হিন্দুজমিদারগণ ব্রাহ্মণ ও দেবতাদিগের জন্য যাহা উৎসর্গ করিতেন, তাহা অক্ষুণ্ণ থাকিত। আলিবর্দ্দীর পূর্ব্ব হইতে এই নিয়ম থাকিলেও তাঁহার সময়ে যে ইহা বহুল পরিমাণে প্রচলিত হয়, রাণীভবানী ও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মুক্তহস্ততা তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। সে সময়ে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা সরকার হইতে যে বৃত্তি পাইতেন, তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্ব পর্য্যন্তও প্রচলিত ছিল। হিন্দুদিগের কঠোর আচার-ব্যবহারেও তাঁহার দৃষ্টি ছিল; সরকারের আদেশ ব্যতীত সতীদাহাদি সম্পাদিত হইতে পারিত না। মিষ্টার হল্‌ওয়েল আলিবর্দ্দীর সময়ের একটি সতী-দাহ-সম্বন্ধে ঐরূপ লিখিয়াছিলেন। রাজপদে মুসলমানের সহিত হিন্দুরা সমভাবে নিযুক্ত হইতেন। এ বিষয়ে তিনি আকবর বাদশাহের ন্যায় অসীম উদারতাই দেখাইয়াছেন। রাজস্ববিভাগে ও মন্ত্রণাবিভাগে পূর্ব্ব হইতে হিন্দুগণ নিযুক্ত হইলেও শাসন- ও

যুদ্ধ-বিভাগে হিন্দুগণ, বিশেষতঃ বাঙ্গালীগণ, বঙ্গদেশে সম্পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ বাঙ্গালীদিগকে শাসন- ও সৈনিক-বিভাগে নিযুক্ত করিয়া আপনার অপরিসীম ঔদার্য্য ও মহত্ত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময়ে চায়েন রায় প্রভৃতি রাজস্ববিভাগে, জগৎশেঠ মন্ত্রণাবিভাগে, জানকীরাম, দুর্লভরাম প্রভৃতি শাসন- ও যুদ্ধ-বিভাগে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্য ও সীতারাম যাঁহাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আলিবর্দ্দী তাঁহাদিগকে একেবারে সৈনিকবিভাগের পক্ষে অনুপযুক্ত মনে করেন নাই। তাঁহার সময়েও বঙ্গদেশ বারংবার মহারাষ্ট্রীয়গণ-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। সেই আক্রমণে বঙ্গদেশের জমিদার ও প্রজাগণ অত্যন্ত উত্যক্ত হইয়াছিলেন। যদিও শান্তি-সংস্থাপনের জন্য আলিবর্দ্দী কিছু কিছু করভার বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, তথাপি জমিদার ও প্রজাদিগের প্রতি তাঁহার স্নেহ-দৃষ্টি থাকায় এবং বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের আশায় তাঁহারা সে করভারকে গুরুতর মনে না করিয়া, অম্লানবদনে তাহা বহন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ইউরোপীয় বণিকৃগণের প্রতি তাঁহার তীক্ষ্নদৃষ্টি থাকিলেও তিনি তাঁহাদিগের অধিকারলোপের জন্য চেষ্টা করেন নাই। তিনি এইরূপ উদারভাবে রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হওয়ায়, প্রজাগণ শান্তিসুখ অনুভব করিয়াছিল এবং সেই শান্তি অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য তিনি অবশেষে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে উড়িষ্যার কতক অংশ প্রদান করিয়াছিলেন।

ঔদার্য্য ও মহত্ত্বে আলিবর্দ্দী যে আকবরের সমকক্ষ ছিলেন, তাহা সকলে অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

নিখিলনাথ রায়

লাঠিয়াল আকবর

বেণীর চণ্ডীমণ্ডপ হইতে অনেকগুলি লোকের চাপা-গলায় আওয়াজ আসিতেছিল। আকাশে মেঘ কতকটা কাটিয়া গিয়া ত্রয়োদশীর অস্বচ্ছ জ্যোৎস্না বারান্দার উপরে আসিয়া পড়িয়াছিল। সেইখানে খুঁটিতে ঠেস্ দিয়া একজন ভীষণাকৃতি প্রৌঢ় মুসলমান চোখ বুজিয়া বসিয়া ছিল। তাহার সমস্ত মুখের উপর কাঁচা রক্ত জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে—পরনের বস্ত্র রক্তে রাঙা; কিন্তু সে চুপ করিয়া আছে। বেণী চাপা-গলায় অনুনয় করিতেছে,—"কথা শোন্ আকবর, থানায় চল্। সাত বচ্ছর যদি না তাকে দিতে পারি ত ঘোষালবংশের ছেলে নই আমি।" পিছনে চাহিয়া কহিল,—"রমা, তুমি একবার বল না, চুপ ক'রে রইলে কেন?" কিন্তু রমা তেমনি কাঠের মত বসিয়া রহিল। আকবর আলি এবার চোখ খুলিয়া সোজা হইয়া বসিয়া বলিল,—"সাবাস্! হাঁ, —মায়ের দুধ খেয়েছিলে বটে ছোটবাবু! লাঠি ধর্‌লে বটে!" বেণী ব্যস্ত এবং ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল,—"সেই কথা বল্‌তেই ত বল্‌চি আকবর, কার লাঠিতে তুই জখম হলি।—সেই ছোঁড়ার, না তার সেই হিন্দুস্থানী চাকরটার?" আকবরের ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ হাসি প্রকাশ পাইল; কহিল,—"সেই বেঁটে হিন্দুস্থানীটার? সে ব্যাটা লাঠির জানে কি বড়বাবু? কি বলিস্ রে গহর, তোর পয়লা চোটেই সে বসেছিল না রে?" আকবরের দুই ছেলেই অদূরে জড়সড় হইয়া বসিয়া ছিল। তাহারাও অনাহত ছিল না। গহর

মাথা নাড়িয়া সায় দিল, কথা কহিল না। আকবর কহিতে লাগিল,—"আমার হাতের চোট পেলে সে ব্যাটা বাঁচত না। গহরের লাঠিতেই 'বাপ' ক'রে ব'সে পড়্‌ল, বড়বাবু!"

রমা উঠিয়া আসিয়া অনতিদূরে দাঁড়াইল। আকবর তাহাদের পিরপুরের প্রজা। সাবেক দিনে লাঠির জোরে অনেক বিষয় হস্তগত করিয়া দিয়াছে। তাই আজ সন্ধ্যার পরে ক্রোধে ও অভিমানে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া রমা তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া বাঁধ পাহারা দিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিল, এবং ভাল করিয়া একবার দেখিতে চাহিয়াছিল, রমেশ শুধু সেই হিন্দুস্থানীটার গায়ের জোরে কেমন করিয়া কি করে! সে নিজেই যে কত বড় লাঠিয়াল, এ কথা রমা স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই।

আকবর রমার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল,—"তখন ছোটবাবু সেই ব্যাটার লাঠি তুলে নিয়ে বাঁধ আটক ক'রে দাঁড়াল দিদি-ঠাক্‌রাণ, তিন বাপ-ব্যাটায় মোরা হটাতে নার্‌লাম। আঁধারে বাঘের মত তেনার চোখ জল্‌তি লাগ্‌ল। কইলেন, 'আকবর, বুড়োমানুষ তুই, সরে যা। বাঁধ কেটে না দিলে সারা গাঁয়ের লোক মারা পড়্‌বে, তাই কাট্‌তেই হবে। তোর আপনার গাঁয়েও ত জমিজমা আছে, সম্‌ঝে দেখ্ রে, সব বরবাদ হ'য়ে গেলে তোর ক্যামন লাগে?' মুই সেলাম ক'রে কইলাম, 'আল্লার কিরে ছোটবাবু, তুমি একটিবার পথ ছাড়। তোমার আড়ালে দেঁড়িয়ে ঐ যে ক' সম্মুন্দি মুয়ে কাপড় জড়ায়ে ঝপাঝপ্ কোদাল মার্‌চে, ওদের মুণ্ডু ক'টা ফাঁক ক'রে দিয়ে যাই!'" বেণী রাগ সাম্‌লাইতে না পারিয়া কথার মাঝখানেই চেঁচাইয়া কহিল,—"বেইমান ব্যাটারা—তাকে সেলাম বাজিয়ে এসে এখানে চালাকি মারা হচ্ছে!"

তাহারা তিন বাপবেটাই একেবারে একসঙ্গে হাত তুলিয়া উঠিল। আকবর কর্কশকণ্ঠে কহিল,—"খবরদার বড়বাবু, বেইমান কোয়ো না; মোরা মোছলমানের ছ্যালে, সব সইতে পারি,—ও পারি না।" কপালে হাত দিয়া খানিকটা রক্ত মুছিয়া ফেলিয়া রমাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল,—"কারে বেইমান কয়, দিদি? ঘরের মধ্যি ব'সে বেইমান কইচ, বড়বাবু, চোখে দেখ্‌লি জান্‌তি পার্‌তে ছোটবাবু কি!" বেণী মুখ বিকৃত করিয়া কহিল,—"ছোট-বাবু কি! তাই থানায় গিয়ে জানিয়ে আয় না! বল্‌বি, তুই বাঁধ পাহারা দিচ্ছিলি, ছোটবাবু চড়াও হ'য়ে তোরে মেরেচে!" আকবর জিভ কাটিয়া বলিল,—"তোবা তোবা! দিনকে রাত কর্‌তি বল, বড়বাবু?" বেণী কহিল,—"না হয় আর কিছু বল্‌বি। আজ গিয়ে জখম দেখিয়ে আয় না—কাল ওয়ারেণ্ট বার ক'রে একেবারে হাজতে পুর্‌ব। রমা, তুমি ভাল ক'রে আর একবার বুঝিয়ে বল না।—এমন সুবিধে যে আর কখনো পাওয়া যাবে না।" রমা কথা কহিল না, শুধু আকবরের মুখের প্রতি একবার চাহিল। আকবর ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"না দিদিঠাকরাণ, ও পার্‌ব না।" বেণী ধমক্ দিয়া কহিল,—"পার্‌বিনে কেন?" এবার আকবরও চেঁচাইয়া কহিল,—"কি কও বড়বাবু, সরম নেই মোর? পাঁচখানা গাঁয়ের লোকে মোরে সর্দ্দার কয় না? দিদিঠাকরাণ, তুমি হুকুম কর্‌লে আসামী হ'য়ে জ্যাল খাট্‌তি পারি, ফৈরিদি হব কোন্ কালামুয়ে?" রমা মৃদুকণ্ঠে একবার মাত্র কহিল,—"পার্‌বে না, আকবর?" আকবর সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল,— "না দিদিঠাকরাণ, আর সব পারি, সদরে গিয়ে গায়ের চোট দেখাতে না পারি।—ওঠ্‌রে গহর, এইবার ঘরকে যাই। মোরা

নালিশ কর্‌তি পার্‌ব না।”—বলিয়া তাহারা উঠিবার উপক্রম করিল।

বেণী ক্রুদ্ধ নিরাশায় তাহাদের দিকে চাহিয়া দুই চোখে অগ্নি-বর্ষণ করিয়া মনে মনে অকথ্য গালিগালাজ করিতে লাগিল এবং রমার একান্ত নিরুদ্যম স্তব্ধতার কোন অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তুষের আগুনে পুড়িতে লাগিল।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আঁধারের রূপ

সুমুখে চাহিতেই খানিকটা দূরে অনেকখানি জল একসঙ্গে চোখের উপর ঝক্‌-ঝক করিয়া উঠিল। সে কোন একটা বিস্মৃত জমিদারের মস্ত কীর্ত্তি! দীঘিটা প্রায় আধক্রোশ দীর্ঘ। উত্তর দিক্‌টা মজিয়া বুজিয়া গিয়াছে, এবং তাহা ঘন জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন। গ্রামের বাহিরে বলিয়া গ্রামের মেয়েরা ইহার জল ব্যবহার করিতে পারিত না। কথায়-কথায় শুনিয়াছিলাম, এই দীঘিটি যে কত দিনের এবং কে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল, তাহা কেহ জানে না। একটা পুরানো ভাঙা ঘাট ছিল; তাহারই একান্তে গিয়া বসিয়া পড়িলাম। এক সময়ে ইহারই চতুর্দ্দিক্‌ ঘিরিয়া বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল; কবে নাকি ওলাউঠায় ও মহামারীতে উজাড় হইয়া গিয়া বর্ত্তমান স্থানে সরিয়া গিয়াছে। পরিত্যক্ত গৃহের বহু চিহ্ন চারি দিকে বিদ্যমান। অস্তগামী সূর্য্যের তির্য্যক্‌ রশ্মিচ্ছটা ধীরে-ধীরে নামিয়া আসিয়া দীঘির কালো জলে সোণা মাখাইয়া দিল, আমি চাহিয়া বসিয়া রহিলাম।

তার পরে ক্রমশঃ সূর্য্য ডুবিয়া, দীঘির কালো জল আরো কালো হইয়া উঠিল; অদূরে বন হইতে বাহির হইয়া দুই-একটা পিপাসার্ত্ত শৃগাল ভয়ে-ভয়ে জল পান করিয়া সরিয়া গেল। আমার যে উঠিবার সময় হইয়াছে, তাহা অনুভব করিয়াও উঠিতে পারিলাম না,—এই ভাঙা ঘাট যেন আমাকে জোর করিয়া বসাইয়া রাখিল।

মনে হইল, এই যেখানে পা রাখিয়া বসিয়া আছি, সেইখানে পা দিয়া কত লোক কতবার আসিয়াছে, গিয়াছে। এই ঘাটেই

তাহারা স্নান করিত, গা ধুইত, কাপড় কাচিত, জল তুলিত। এখন তাহারা কোথাকার কোন্ জলাশয়ে এই সমস্ত নিত্যকর্ম্ম সমাধা করে? এ গ্রাম যখন জীবিত ছিল, তখন নিশ্চয়ই তাহারা এম্‌নি সময়ে এখানে আসিয়া বসিত; কত গান, কত গল্প করিয়া সারাদিনের শ্রান্তি দূর করিত। তার পরে অকস্মাৎ একদিন যখন মহাকাল মহামারীরূপে দেখা দিয়া সমস্ত গ্রাম ছিঁড়িয়া লইয়া গেলেন, তখন কত মুমূর্ষু হয়ত তৃষ্ণায় ছুটিয়া আসিয়া এই ঘাটের উপরেই শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে। হয়ত তাহাদের তৃষ্ণার্ত্ত আত্মা আজিও এইখানে ঘুরিয়া বেড়ায়। যাহা চোখে দেখি না, তাহাই যে নাই, এমন কথাই বা কে জোর করিয়া বলিবে? মনে হইতে লাগিল, জগতে প্রত্যক্ষ সত্য যদি কিছু থাকে, ত সে মরণ। এই জীবনব্যাপী ভাল-মন্দ সুখ-দুঃখের অবস্থাগুলা যেন আতসবাজী, বিচিত্র সাজসরঞ্জামের মত শুধু একটা কোন্ বিশেষ দিনে পুড়িয়া ছাই হইবার জন্যই এত যত্নে এত কৌশলে গড়িয়া উঠিতেছে। তবে, মৃত্যুর পরপারের ইতিহাসটা যদি কোন উপায়ে শুনিয়া লইতে পারা যায়, তবে তার চেয়ে লাভ আর কি আছে? তা সে যেই বলুক এবং যেমন করিয়াই বলুক না! হঠাৎ কাহার পায়ের শব্দে ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। ফিরিয়া দেখিলাম, শুধু অন্ধকার—কেহ কোথাও নাই। একটা গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

কতক্ষণ যে বসিয়া কাটাইয়াছি, এখন রাত্রি কত, ঠিক ঠাহর করিতে পারিলাম না; বোধ হয় যেন দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি। কিন্তু এ কি! চলিয়াছি ত চলিয়াছি—সেই সঙ্কীর্ণ পায়ে-চলা পথ যে আর শেষ হয় না! এতগুলা তাঁবুর একটা আলোও যে চোখে

পড়ে না। অনেকক্ষণ হইতে সম্মুখে একটা বাঁশঝাড় দৃষ্টিরোধ করিয়া বিরাজ করিতেছিল; হঠাৎ মনে হইল, কৈ, এটা ত আসিবার সময়ে লক্ষ্য করি নাই। দিক্-ভুল করিয়া ত আর একদিকে চলি নাই? আরো খানিকটা অগ্রসর হইতেই টের পাইলাম, সেটা বাঁশঝাড় নয়, গোটাকয়েক তেঁতুলগাছ জড়াজড়ি করিয়া, দিগন্ত আবৃত করিয়া, অন্ধকার জমাট বাঁধাইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তারই নীচে দিয়া পথটা আঁকিয়া-বাঁকিয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। জায়গাটা এম্‌নি অন্ধকার যে, নিজের হাতটা পর্য্যন্ত দেখা যায় না। বুকের ভিতরটা কেমন যেন গুর্‌গুর্ করিয়া উঠিল —এ যাইতেছি কোথায়? চোখ-কাণ বুজিয়া কোনমতে সেই তেঁতুল-তলাটা পার হইয়া দেখি, সম্মুখে অনন্ত কালো আকাশ যতদূর দেখা যায়, ততদূর বিস্তৃত হইয়া আছে। কিন্তু সুমুখে ওই উঁচু জায়গাটা কি? নদীর ধারে সরকারী বাঁধ নয় ত? বাঁধই ত বটে! পা দুটা যেন ভাঙিয়া আসিতে লাগিল, তবুও টানিয়া-টানিয়া কোনমতে তাহার উপর উঠিয়া দাঁড়াইলাম। যা ভাবিয়াছিলাম, ঠিক তাই। ঠিক নীচেই সেই মহাশ্মশান! আবার কাহার পদশব্দ সুমুখ দিয়াই নীচে শ্মশানে গিয়া মিলাইয়া গেল। এইবার টলিয়া-টলিয়া সেই ধূলা-বালুর উপরেই মূর্চ্ছিতের মত ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলাম। আর আমার লেশমাত্র সংশয় রহিল না যে, কে আমাকে এক মহাশ্মশান হইতে আর এক মহাশ্মশানের পথ দেখাইয়া পৌঁছাইয়া দিয়া গেল। সেই যাহার পদশব্দ শুনিয়া ভাঙা ঘাটের উপর গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহার পদশব্দ এতক্ষণ পরে ওই সম্মুখে মিলাইল।

সমস্ত ঘটনারই হেতু দেখাইবার জিদ্‌টা মানুষের যে বয়সে

থাকে, সেই বয়স্ আমার পার হইয়া গেছে। সুতরাং কেমন করিয়া যে এই সূচিভেদ্য অন্ধকার নিশীথে একাকী পথ চিনিয়া দীঘির ভাঙা ঘাট হইতে এই শ্মশানের উপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, এবং কাহারই বা সে পদধ্বনি সেখানে আহ্বান-ইঙ্গিত করিয়া এইমাত্র সুমুখে মিলাইয়া গেল, এ সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিবার মত বুদ্ধি আমার নাই—পাঠকের কাছে আমার এ দৈন্য স্বীকার করিতে এখন আর আমি কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিতেছি না। এ রহস্য আজও আমার কাছে তেম্নি আঁধারে আবৃত রহিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া প্রেতযোনি স্বীকার করাও এ স্বীকারোক্তির প্রচ্ছন্ন তাৎপর্য্য নয়। কিন্তু যাক্ গে।

বলিতেছিলাম যে, সেই ধূলা-বালি-ভরা বাঁধের উপর যখন হতজ্ঞানের মত বসিয়া পড়িলাম, তখনই শুধু দু'টি লঘু পদধ্বনি শ্মশানের অভ্যন্তরে গিয়া ধীরে-ধীরে মিলাইল। মনে হইল, সে যেন স্পষ্ট করিয়া জানাইল—'ছি ছি! ও তুই কি করিলি? তোকে এতটা পথ যে, পথ দেখাইয়া আনিলাম, সে কি ওইখানে বসিয়া পড়িবার জন্য? আয়, আয়! একেবারে আমাদের ভিতরে চলিয়া আয়। এমন অশুচি, অস্পৃশ্যের মত প্রাঙ্গণের একান্তে বসিস্ না,—আমাদের সকলের মাঝখানে আসিয়া বোস্।' কথাগুলা কাণে শুনিয়াছিলাম কিংবা হৃদয় হইতে অনুভব করিয়াছিলাম—এ কথা আজ আর স্মরণ করিতে পারি না। কিন্তু তবুও যে চেতনা রহিল, তাহার কারণ, চৈতন্যকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলে, সে এম্নি এক রকম করিয়া বজায় থাকে—একেবারে যায় না, এ আমি বেশ দেখিয়াছি। তাই দু'চোখ মেলিয়া চাহিয়া রহিলাম বটে, কিন্তু সে যেন এক তন্দ্রার চাহনি। সে ঘুমানও

নয়, জাগাও নয়। তাহাতে নিদ্রিতের বিশ্রামও থাকে না, সজাগের উদ্যমও আসে না। ঐ এক রকম!

তথাপি এ কথাটা ভুলি নাই যে, অনেক রাত্রি হইয়াছে—আমাকে তাঁবুতে ফিরিতে হইবে, এবং সে জন্য একবার অন্ততঃ চেষ্টা করিতাম, কিন্তু মনে হইল সব বৃথা। এখানে আমি ইচ্ছা করিয়া আসি নাই—আসিবার কল্পনাও করি নাই। সুতরাং যে আমাকে এই দুর্গম পথে পথ দেখাইয়া আনিয়াছে, তাহার বিশেষ কোন কাজ আছে। সে আমাকে শুধু শুধু ফিরিতে দিবে না। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, নিজের ইচ্ছায় ইহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। যে পথে যেমন করিয়াই জোর করিয়া বাহির হও না কেন, সব পথই গোলক-ধাঁধার মত ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া সাবেক জায়গায় আনিয়া হাজির করে। সুতরাং চঞ্চল হইয়া ছট্‌ফট করা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক মনে করিয়া কোন প্রকার গতির চেষ্টামাত্র না করিয়া যখন স্থির হইয়া রহিলাম, তখন অকস্মাৎ যে জিনিসটি চোখে পড়িয়া গেল, তাহার কথা আমি কোন দিনই বিস্মৃত হই নাই।

রাত্রির যে একটা রূপ আছে, তাহাকে পৃথিবীর গাছ-পালা, পাহাড়-পর্ব্বত, জল-মাটী, বন-জঙ্গল প্রভৃতি যাবতীয় দৃশ্যমান বস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া, একান্ত করিয়া দেখা যায়, ইহা যেন এই আজ প্রথম চোখে পড়িল। চাহিয়া দেখি, অন্তহীন কালো আকাশতলে পৃথিবী-জোড়া আসন করিয়া গভীর রাত্রি নিমীলিত-চক্ষে ধ্যানে বসিয়াছে, আর সমস্ত বিশ্ব-চরাচর মুখ বুজিয়া, নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া, অত্যন্ত সাবধানে স্তব্ধ হইয়া সেই অটল শান্তি রক্ষা করিতেছে! হঠাৎ চোখের উপর যেন সৌন্দর্য্য-তরঙ্গ খেলিয়া গেল। মনে হইল, কোন্ মিথ্যাবাদী প্রচার করিয়াছে—আলোরই রূপ,

আঁধারের রূপ নাই? এত বড় ফাঁকি মানুষে কেমন করিয়া নীরবে মানিয়া লইয়াছে! এই যে আকাশ-বাতাস—স্বর্গ-মর্ত্ত্য পরিব্যাপ্ত করিয়া দৃষ্টির অন্তরে-বাহিরে আঁধারের প্লাবন বহিয়া যাইতেছে, মরি! মরি! এমন অপরূপ রূপের প্রস্রবণ আর কবে দেখিয়াছি! এ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা যত গভীর, যত সীমাহীন—তাহা ততই অন্ধকার। অগাধ বারিধি মসীকৃষ্ণ; অগম্য গহন অরণ্যানী আঁধার; সর্ব্বলোকাশ্রয়, আলোর আলো, গতির গতি, জীবনের জীবন, সকল সৌন্দর্য্যের প্রাণপুরুষও মানুষের চোখে নিবিড় আঁধার! কিন্তু সে কি রূপের অভাবে? যাহাকে বুঝি না, জানি না,—যাহার অন্তরে প্রবেশের পথ দেখি না, তাহাই তত অন্ধকার! মৃত্যু তাই মানুষের চোখে এত কালো, তাই তার পরলোকের পথ এমন দুস্তর আঁধারে মগ্ন; কখনও এ সকল কথা ভাবি নাই, কোন দিন এ পথে চলি নাই। তবুও কেমন করিয়া জানি না, এই ভয়াকীর্ণ মহাশ্মশানপ্রান্তে বসিয়া নিজের এই নিরুপায় নিঃসঙ্গ একাকিত্বকে অতিক্রম করিয়া আজ হৃদয় ভরিয়া একটা অকারণ রূপের আনন্দ খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল; এবং অকস্মাৎ মনে হইল, কালোর যে এত রূপ ছিল, সে ত কোন দিন জানি নাই। তবে হয়ত মৃত্যুও কালো বলিয়া কুৎসিত নয়; একদিন যখন সে আমাকে দেখা দিতে আসিবে, তখন হয়ত তার এম্‌নি অফুরন্ত সুন্দর রূপে আমার দু'চক্ষু জুড়াইয়া যাইবে। আর সে দেখার দিন যদি আজই আসিয়া থাকে, তবে—হে আমার কালো! হে আমার অভ্যগ্র পদধ্বনি! হে আমার সর্ব্ব-দুঃখ-ভয়-ব্যথাহারী অনন্ত সুন্দর! তুমি তোমার অনাদি আঁধারে সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া আমার এই দু'টি চোখের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ হও, আমি

তোমার এই অন্ধতমসাবৃত-নির্জ্জন মৃত্যুমন্দিরের দ্বারে তোমাকে নির্ভয়ে বরণ করিয়া মহানন্দে তোমার অনুসরণ করি। সহসা মনে হইল, তাই ত! তাঁহার এই নির্ব্বাক্ আহ্বান উপেক্ষা করিয়া অত্যন্ত হীন অন্তেবাসীর মত এই বাহিরে বসিয়া আছি কি জন্য? একেবারে ভিতরে—মাঝখানে গিয়া বসি না কেন?

নামিয়া গিয়া ঠিক মধ্যস্থলে একেবারে চাপিয়া বসিয়া পড়িলাম। কতক্ষণ যে এখানে এই ভাবে স্থির হইয়া ছিলাম, তখন হুঁস ছিল না। হুঁস হইলে দেখিলাম, তেমন অন্ধকার আর নাই—আকাশের একপ্রান্ত যেন স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছে; এবং তাহারই অদূরে শুকতারা দপ্-দপ করিয়া জ্বলিতেছে। এক চাপা কথাবার্ত্তার কোলাহল কাণে গেল। ঠাহর করিয়া দেখিলাম, দূরে শিমুলগাছের আড়ালে বাঁধের উপর দিয়া কাহারা যেন চলিয়া আসিতেছে; এবং তাহাদের দুই-চারিটা লণ্ঠনের আলোকও আশে-পাশে ইতস্ততঃ দুলিতেছে। পুনর্ব্বার বাঁধের উপর উঠিয়া সেই আলোকেই দেখিলাম, দু'খানা গরুর গাড়ীর অগ্র-পশ্চাৎ জনকয়েক লোক এই দিকেই অগ্রসর হইতেছে। বুঝিলাম, কাহারা এই পথে ষ্টেশনে যাইতেছে।

মাথায় সুবুদ্ধি আসিল যে, পথ ছাড়িয়া আমার দূরে সরিয়া যাওয়া আবশ্যক; কারণ, আগন্তুকের দল যত বুদ্ধিমান্ এবং সাহসীই হোক, হঠাৎ এই অন্ধকার রাত্রিতে এরূপ স্থানে আমাকে একাকী ভূতের মত দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলে, আর কিছু না করুক, একটা যে বিষম হৈ-হৈ রৈ-রৈ চীৎকার তুলিয়া দিবে, তাহাতে আর সংশয় নাই।—ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব্বস্থানে দাঁড়াইলাম।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর

রামেন্দ্রসুন্দরের মৃত্যুতে বঙ্গজননী অকালে একজন মনস্বী, কৃতী ও প্রতিভাবান্ সন্তান হারাইয়াছেন। তিনি আপনাকে দেশের কল্যাণে নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত চিন্তা ও সাধনার মধ্যে শুধু একটি সুর বাজিয়া উঠিয়াছিল—জন্মভূমি ও মাতৃভাষার কল্যাণ। তিনি যে সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে আত্মপ্রসাদ ও জননীর আশীর্ব্বাদ ব্যতীত আর কোনই পুরস্কার ছিল না। তিনি যে আত্মত্যাগ-রূপ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা সেই প্রাচীন কালের নিষ্ঠাসম্পন্ন, বেদবিত্থাভূয়িষ্ঠ, যজ্ঞপরায়ণ ব্রাহ্মণগণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

দেশবিশ্রুতকীর্ত্তি রামেন্দ্রসুন্দর আমাদের চিন্তা-জগতের প্রায় সর্ব্ববিভাগেই তাঁহার মুদ্রাঙ্ক রাখিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যে তাঁহার স্থান কত উচ্চে, তাহা বলিবার সময় আসে নাই। তাঁহার 'কর্ম্মকথা', 'চরিতকথা', 'প্রকৃতি' ও 'জিজ্ঞাসা' কাল-সমুদ্রের কতগুলি লহরী-লীলায় কমলেকামিনীর ন্যায় রূপ বিকাশ করিবে, তাহা গণনা করা অসাধ্য। তবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, রামেন্দ্রবাবুর মনীষা ইহাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। তিনি যে মহতী প্রতিভার প্রেরণা জীবনে অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা তিনি জ্ঞান ও কর্ম্মের নানা বিভাগে সংক্রামিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। এক দিকে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, বঙ্গীয় সাহিত্য-

সম্মিলন ও রমেশচন্দ্র-সারস্বত ভবনের পরিকল্পনা যেমন তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে, তেমনই বঙ্গসাহিত্যের আধুনিক উন্নতির ধারা তাঁহারই গৌরব-বাণী প্রচার করিতেছে।

মহাপুরুষেরা সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী কালের উপর যে প্রভাব রাখিয়া যান, তাহার দ্বারাই তাঁহাদের মহত্ত্ব পরিমিত হইয়া থাকে। সে প্রভাব আমাদের সাধারণ দৃষ্টির মাপকাঠিতে পরিমিত হইতে পারে না; কারণ, এরূপ আধ্যাত্মিক প্রভাবের অন্তঃপ্রবাহ লোক-চক্ষুর অন্তরালে অলক্ষ্যে অজ্ঞাতসারে ক্রিয়া করিতে থাকে এবং তাহার ফলে সমগ্র দেশ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে ক্রমশঃ বাহিত হয়। রাশীকৃত গ্রন্থ-প্রণয়ন অপেক্ষাও এইরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারা মহত্তর কার্য্য এবং এইরূপ মহত্তর কার্য্যই রামেন্দ্রবাবুর প্রতিভার দ্যোতক। সাহিত্য-পরিষৎ ও -সম্মিলনের মধ্য দিয়া সাহিত্যের যে একটা বিরাট্ জাগরণের সূত্রপাত বাঙ্গালীর জীবনে অধুনা দেখা যাইতেছে, তাহার প্রযোজকদিগের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অন্যতম। এই যে মাতৃভাষার মরা গাঙ্গে বান আসিয়াছে, ইহার গতি রোধ করা আর কাহারও সাধ্য নহে। বিস্মৃত, অনাদৃত মাতৃভাষার স্থির সলিলে তরঙ্গ তুলিয়া দিয়া জাতীয় জীবনকে প্রবুদ্ধ, সমৃদ্ধ ও সমুন্নত করিবার যে চেষ্টা, তাহাই রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। ভবিষ্যতে বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে বর্ত্তমান যুগের যে অধ্যায়টি লিখিত হইবে, তাহাতে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নাম উজ্জ্বল অক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে।

বঙ্গবাসীর অন্তর-রাজ্যের উপর রামেন্দ্রবাবুর যে প্রভাব, সে প্রভাব বড়ই পবিত্র ও শুভপ্রদ। প্রতিভা অনেক প্রকারের থাকে; দুরতিক্রমণীয় বাধাসমূহ অতিক্রম করিয়া কার্য্যকরী হওয়াই

প্রতিভার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কিন্তু সেই প্রতিভার সঙ্গে যদি বিশ্বজনীন প্রেম, নিরভিমান নিঃস্বার্থতা ও পূত চরিত্রের মহিমা বর্ত্তমান থাকে, তবে তাহা পুষ্পবৃষ্টিরই মত বিধাতার শুভাশীর্ব্বাদ বহন করিয়া আবির্ভূত হয়। এটিলা বা তৈমুরলঙ্গেরও যে প্রতিভা ছিল, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু সে লোক-ক্ষয়করী এবং দেশধ্বংসকরী প্রতিভা দেবতার অভিসম্পাত-স্বরূপ দেখা দিয়াছিল; তাহা কোনও স্থায়ী প্রভাবই রাখিয়া যাইতে পারে নাই। আর যাঁহারা নিভৃত নিরালা প্রদেশে বসিয়া অন্যের অজ্ঞাতে লোকের হিত-চিন্তা করিয়াছেন, জীবন-মৃত্যুর রহস্য ভেদ করিয়া মানবের কল্যাণ-সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রভাব কালের অগণিত সোপান-রাজি বাহিয়া অবিনশ্বরতার দিকে চলিয়াছে। রামেন্দ্রসুন্দরের প্রভাব সেই শ্রেণীর প্রভাব ছিল। তাহার মধ্যে কুটিলতার সংস্পর্শ ছিল না, ছলকলার লেশমাত্র ছিল না এবং স্বার্থের প্রচ্ছন্ন লীলামাত্র ছিল না, এই জন্যই তাঁহার মহত্ত্ব আমাদের অন্তর-রাজ্য জুড়িয়া বসিয়াছে।

মহত্ত্ব যেখানে থাকে, সেখানে তাহার অভিমানও বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ষণের অপেক্ষা বিদ্যুদ্বিকাশই অনেক স্থলে বেশী। মহত্ত্বের এই ভেরী-নিনাদের কোলাহলে অনেক সময়ে প্রকৃত মহত্ত্ব চাপা পড়িয়া যায়। রামেন্দ্রবাবুর মহত্ত্ব এ প্রকৃতির ছিল না। এখানে ভেরী-নিনাদ ত ছিলই না, বরং অপরের ভেরী-নাদও তাঁহার নিকট লজ্জা পাইয়া স্তব্ধ হইয়া যাইত। শিশুর ন্যায় সরল, শিশুর ন্যায় পবিত্র, সদাশুভ্র হাস্যমণ্ডিত মুখমণ্ডল—এ সকলই তাঁহার শিরে দেবত্বের মুকুট পরাইয়া দিত। তাঁহার হাসিতে সমস্ত

হৃদয় উন্মুক্ত হইয়া পড়িত, কোথাও এতটুকু মলিনতা বা প্রচ্ছন্নতা থাকিতে পারিত না। তাঁহাকে শুধু হাসিতেই দেখিয়াছি। এই সদা-হাস্যময় ভাবটিই ছিল তাঁহার আধ্যাত্মিক পবিত্রতার বহির্লক্ষণ।

প্রতিভার সহিত পূত চরিত্রের, কর্ম্মনিষ্ঠার সহিত অবারিত আনন্দের অবাধ শুভ সম্মিলনে রামেন্দ্রসুন্দরের জীবন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। ইহাই আমাদের সর্ব্বকালের আদর্শ। আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও দেবত্বে ভেদবুদ্ধি রাখি না। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥

সেই বিভূতি—শ্রীভগবানের বিভূতি—রামেন্দ্রসুন্দরের লোক-বিলক্ষণ চরিত্রে আমরা দেখিতে পাইয়াছি।

রামেন্দ্রবাবুর স্বদেশভক্তির কথা উল্লেখ করিয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তিনি শিক্ষা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়াই দেশের উন্নতি কামনা করিতেন। রাজনীতিক আন্দোলনের দ্বারা দেশের উন্নতি হইতে পারে, ব্যবসায়-বাণিজ্যের দ্বারা দেশের আর্থিক স্বচ্ছলতা হইতে পারে—কিন্তু সমস্ত উন্নতির সারভূত, দেশের মেরুদণ্ডস্বরূপ জ্ঞান ও চরিত্র সমস্ত মঙ্গলের আকর, ইহাই তিনি বুঝিয়াছিলেন এবং ঐকান্তিক যত্ন ও সাধনার দ্বারা তিনি সেই দিকে উন্নতি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কলেজের অগণিত ছাত্র ও অধ্যাপকের নেতৃ-স্বরূপে, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সেবক-রূপে তিনি দেশের শিক্ষা-দীক্ষার উন্নতি করিতেই আজীবন প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

তাহা হইলেও তিনি দেশের অকল্যাণে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিতেন না। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদকল্পে তিনি যে 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা অপূর্ব্ব স্বদেশপ্রীতির পরিচায়ক। আমি কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"বাংলা নামে দেশ, তার উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সাগর। মা গঙ্গা মর্ত্ত্যে নেমে নিজের মাটিতে সেই দেশ গড়লেন। প্রয়াগ, কাশী পার হয়ে, মা পূর্ব্ববাহিনী হয়ে সেই দেশে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করে মা সেখানে শতমুখী হ'লেন, শতমুখী হয়ে মা সাগরে মিশলেন, তখন লক্ষ্মী এসে সেই শতমুখে অধিষ্ঠান করলেন; বাংলার লক্ষ্মী বাংলা দেশ জুড়ে বসলেন। মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে লক্ষ্মী বিরাজ করতে লাগলেন। ফলে-ফুলে দেশ আলো হ'ল। সরোবরে শতদল ফুটে উঠল। তাতে রাজহংস খেলা করতে লাগল। লোকের গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, গালভরা হাসি। লোকে পরম সুখে বাস করতে লাগল।"

তাহার পরেই দুর্দ্দিন আসিল; সেই দুর্দ্দিনের মধ্যে বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হইল। তাই রামেন্দ্রবাবু আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের জন্য 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' রচনা করিলেন, এবং তাঁহাদের মুখ দিয়া বলাইলেন,—

"মা লক্ষ্মী, কৃপা কর, কাঞ্চন দিয়ে কাচ নেবো না। ঘরের থাকতে পরের নেবো না। শাঁখা থাকতে চুড়ি পরবো না। পরের দুয়ারে ভিক্ষা করবো না। মোটা অন্ন ভোজন করবো। মোটা বসন অঙ্গে নেবো। মোটা ভূষণ আভরণ করবো। পড়শীকে খাইয়ে নিজে খাব। মোটা অন্ন অক্ষয় হোক, মোটা বস্ত্র

অক্ষয় হোক। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকুক; বাংলার লক্ষ্মী বাংলায় থাকুন।"

'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' স্বদেশপ্রেম ও ভাষার সরল মিষ্টতা-হিসাবে বঙ্গসাহিত্যে অতুলনীয়! রামেন্দ্রবাবুর অনুকরণ করিয়া আমরাও বলি—বঙ্গলক্ষ্মীর প্রিয় সন্তানের স্মৃতির উপর ফুলচন্দন বর্ষিত হউক।

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

মানুষের সংহারকার্য্য

পরিবর্ত্তন লইয়াই প্রকৃতি। এই প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের বিরাম নাই। ধরাবক্ষে যখন মানুষ স্থান পায় নাই, তখন ইহা চলিত এবং এখনও ইহা চলিতেছে। এ সবই সত্য! সমুদ্র-কূলবর্ত্তী স্থান আপনা হইতেই উঁচুনীচু হইয়া দেশের ঋতুর পরিবর্ত্তন করিতেছে। পশুপক্ষী পরিবর্ত্তিত অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যরক্ষা করিয়া টিঁকিয়া থাকিতে গিয়া নিজেদের দেহের কতই পরিবর্ত্তন করিতেছে, হয়ত তাহাদিগকে দেশত্যাগ করিয়া অপর কোনও সুবিধাজনক স্থান খুঁজিয়া লইতে হইতেছে। এ সবগুলিও সত্য! কিন্তু প্রকৃতির স্বেচ্ছাকৃত এই শ্রেণীর পরিবর্ত্তনে কোন অমঙ্গল-লক্ষণ দেখা যায় না। মানুষ নিজের জ্ঞান-গরিমায় মুগ্ধ হইয়া প্রকৃতির পটে যে তূলিকাপাত করে তাহাই প্রকৃতির সেই শান্ত ছবিকে ক্রমে কর্কশ করিয়া তোলে। ইহাতে পৃথিবীর যে অমঙ্গল হয়, তাহার ফল অতি ভয়ানক।

প্রকৃতির রাজ্যে অকল্যাণ-আনয়ন-ব্যাপারে, একমাত্র আধুনিক সভ্য জাতিই দায়ী নয়। মানুষ যখন অসভ্য ছিল, তখন হইতেই নিরীহ প্রাণীদিগকে বধ করিতে আরম্ভ করিয়া ইহারা প্রাণিজগতের এত ক্ষতি করিয়া আসিতেছে যে, তাহার আর পূরণ হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। এই পাপের ফলেই এখন ধরাপৃষ্ঠে সুস্থকায় স্বচ্ছন্দচর প্রাণী দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে এবং অনেক প্রাণিজাতির বংশলোপ পর্য্যন্ত ঘটিয়াছে। এখন মৃৎপ্রোথিত

কঙ্কালে তাহাদের পরিচয় গ্রহণ করিতে হয়। অনেক বন্য পশুকে বুদ্ধিবলে পোষ মানাইয়া আমরা এখন তাহাদিগকে গার্হস্থ্যসম্পদ্ করিয়া তুলিয়াছি সত্য, কিন্তু এই ব্যবস্থায় তাহারা এত হীনবীর্য্য এবং দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে যে, নিজের কীর্ত্তির জন্য নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়। মানুষের এই যথেচ্ছাচার দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, সম্ভবতঃ কয়েকটি খাদ্যপ্রদ উদ্ভিদ্ এবং আর কয়েকটি অত্যাবশ্যক প্রাণী ছাড়া ক্রমে অন্য সকলেই ধরাপৃষ্ঠ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে, এবং শেষে সেগুলিরও পর্য্যন্ত বংশলোপের সম্ভাবনা দেখা দিবে। যে আধিপত্য-বিস্তারের জন্য মানুষ আসৃষ্টি এত লালায়িত, উদ্ভিদ্‌হীন এবং প্রাণিবিরল অবস্থায় তাহার পূর্ণতা হইবে বটে, কিন্তু সে অবস্থা কখনই মানুষের জীবন-রক্ষার অনুকূল হইবে না।

কয়েকটা উদাহরণ দিলে বক্তব্য বিষয়টি স্ফুটতর হইবে। অসভ্য মানুষ অনৈতিহাসিক যুগে আধুনিক যুগের মানুষদিগের ন্যায় বন্দুক-কামান ব্যবহার করিতে পারিত না সত্য, তথাপি তাহারা শিলাময় অস্ত্রশস্ত্রাদির আঘাতে ম্যামথ নামক হস্তিজাতীয় জীবের বংশনাশের যে সহায়তা করে নাই, এ কথা কোন ক্রমেই বলা যায় না। ম্যামথ আর ধরাপৃষ্ঠে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। গভীর ভূস্তরে প্রোথিত কঙ্কাল-দ্বারাই এখন তাহাদের পূর্ব্ব অস্তিত্বের পরিচয় গ্রহণ করিতে হয়। অতি প্রাচীন কালে আমেরিকার সর্ব্বাংশে নানা জাতীয় বন্য অশ্ব দলে দলে বিচরণ করিত। আজকাল তাহাদের একটিও ভূপৃষ্ঠে নাই। জীব-তত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাদের তিরোভাবকেও মানুষের কীর্ত্তি বলিতে চাহেন। মানুষ গোলাগুলি চালাইয়া এই জীব-বংশ লোপ করে নাই

সত্য, কিন্তু যে-সকল সংক্রামক ও সাংঘাতিক ব্যাধি-দ্বারা তাহারা নির্ব্বংশ হইয়াছে, তাহার জন্য মানুষই দায়ী। যখন আমেরিকার বনভূমিতে উপনিবেশ-স্থাপন আরম্ভ হইয়াছিল, তখন য়ুরোপ হইতে দলে-দলে লোক আসিয়া দেশটিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করিতেছেন, সম্ভবতঃ এই সময়ে বৈদেশিকগণ পীড়ার বীজ অজ্ঞাতসারে সঙ্গে আনিয়া বন্য অশ্বগুলিকে ব্যাধিগ্রস্ত করিয়াছিল।

আমরা যে দুইটি প্রাণিজাতির উচ্ছেদের কথা বলিলাম, তাহাকে কেবল মানুষের কীর্ত্তি বলিয়া সকলে স্বীকার করেন না। প্রাকৃতিক অবস্থায় যে-সকল পরিবর্ত্তন আপনা হইতেই চলিতেছে, তাহার ফলে অনেক জীবের বংশলোপ ঘটিয়াছে, এবং অনেক নূতন জীব জন্মগ্রহণ করিয়া পরিত্যক্ত স্থান অধিকার করিয়াছে। জীববিজ্ঞানে এই প্রকার ঘটনার শত শত উদাহরণ পাওয়া যায়। ম্যামথ এবং বন্য অশ্বের বংশলোপকে কেহ কেহ ঐ প্রকার প্রাকৃতিক উৎপাতেরই ফল বলিতে চাহিতেছেন। কিন্তু য়ুরোপ ও আমেরিকা হইতে বাইসন নামক মহিষ-জাতীয় জন্তুর যে তিরোভাব ঘটিয়াছে, তাহার জন্য প্রকৃতিকে দায়ী করা চলে না। বাইসন এবং য়ুরোপের বন্য গোজাতির উচ্ছেদের জন্য এক মানুষই দায়ী। নেকড়ে বাঘ এবং বিফার্-জাতীয় প্রাণীগুলিও ঐ প্রকার অত্যাচারে ইংলণ্ড ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। সুইডেন, নরওয়ে, রুশিয়া এবং ফ্রান্স হইতেও ইহারা ক্রমে তাড়িত হইতেছে। আর শত বৎসর পরে পৃথিবীর কোন অংশেই ঐ দুই প্রাণীর সন্ধান পাওয়া যাইবে না।

অতি প্রাচীন কালে ভল্লুক পৃথিবীর সর্ব্বাংশেই দেখা যাইত।

মানুষের অত্যাচারেই তাহাদিগকে ইংলণ্ড ছাড়িতে হইয়াছে। সিংহ য়ুরোপের আর কোন অংশেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ম্যাসিডোনিয়া এবং এশিয়া মাইনরে যে প্রচুর সিংহ ছিল, তাহা প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস হইতে সুস্পষ্ট জানা যায়। জিরাফ এবং হস্তীও ক্রমে দুর্লভ হইয়া আসিতেছে। এই সকল প্রাণীর উচ্ছেদ-কার্য্যের জন্য এক মানুষই দায়ী। গরিলা এবং শিম্পাঞ্জী নামক দুই জাতীয় বনমানুষের নাম পাঠক অবশ্যই শুনিয়াছেন। অভিব্যক্তিবাদের প্রবর্ত্তক ডারুইন সাহেব মানুষকে ইহাদেরই বংশধর বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। আজকাল এগুলিকেও আর অধিক দেখা যায় না।

পক্ষী এবং পতঙ্গজাতীয় ক্ষুদ্র প্রাণীগুলি মানুষের নৃশংসতা হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। বিখ্যাত ডোডো (Dodo) পক্ষী এখন একপ্রকার পুঁথিগত জিনিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তা'ছাড়া আধুনিক সুসভ্য মানুষের বিলাসের উপকরণ জোগাইবার জন্য যে কত পক্ষীর বংশলোপ হইতে বসিয়াছে, তাহার ইয়ত্তাই হয় না। অষ্ট্রিচ এবং ময়ূরের সুদৃশ্য পক্ষই তাহাদের বিনাশের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হয়ত দুই-তিন শত বৎসর পরে পৃথিবীতে উহাদের কোন চিহ্নই পাওয়া যাইবে না। প্রজাপতি বা অপর পতঙ্গগুলি দীর্ঘজীবী নয়; দুই-তিন দিন মাত্র পক্ষ বিস্তার করিয়া ইহারা আনন্দে বিচরণ করে, এবং তাহার পরেই জরাগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সংসারে কাহারও সহিত তাহাদের শত্রুতা নাই, এবং তাহারা কাহারও অনিষ্ট করে না। সুসভ্য মানুষের খরদৃষ্টি ইহাদের উপরেও পড়িয়াছে। সুন্দর পক্ষ দুইটিকে কাটিয়া রাখিবার

জন্য সভ্য মানুষ জাল হাতে করিয়া দলে দলে প্রজাপতির পশ্চাতে ছুটিতেছে। এই অত্যাচারে কয়েক জাতীয় সুদৃশ্য প্রজাপতির বংশলোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে।

বড় বড় নদনদী এবং জলাশয়গুলির জল দূষিত করিয়া মানুষ নানা জলচর প্রাণীর যে সংহার-কার্য্য নীরবে চালাইতেছে, তাহা আরও ভয়ানক। জলাশয়ের জলকে নির্ম্মল রাখার কার্য্যে জলচর প্রাণী কম সহায় নয়। আমাদের কলকারখানার আবর্জ্জনা ও ড্রেনের দূষিতপদার্থযোগে নদীজল এত কলুষিত হইয়া পড়িতেছে যে, পরম হিতকর জলচর প্রাণিগণও আর জলে থাকিতে পারিতেছে না, ক্রমেই তাহারা নির্ব্বংশ হইতে বসিয়াছে। নদীগুলি এখন অনিষ্টকর জীবাণুতে পূর্ণ। টেম্‌স নদীতে আর স্যামন (Salmon) মৎস্য পাওয়া যায় না, এবং আমাদের ভাগীরথী ও পদ্মা মৎস্যহীন হইয়া আসিতেছে। খুব সম্ভবতঃ আর কয়েক শত বৎসর পরে সভ্য দেশে শ্যামলতটশালিনী স্বচ্ছতোয়া নদী দুর্লভ হইবে; কৃমি- ও জীবাণুপূর্ণ কলুষবাহিনী নদী নগরবক্ষ দিয়া বহিয়া যাইবে। ভবিষ্যৎ মানবজাতিকে এই বীভৎস দৃশ্য দেখিতেই হইবে। আধুনিক বিজ্ঞানকে ইহার জন্য দায়ী করিলে চলিবে না। মানুষের অর্থপিপাসা এবং বিলাসপরায়ণতাকেই তখন ধিক্কার দিতে হইবে।

প্রাণিজগৎ ছাড়িয়া দিয়া উদ্ভিদ্‌দিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, মানুষের সংহারকার্য্যের ধারাবাহিকতা সেখানেও দেখা যায়। গাছ কাটিয়া, বন পোড়াইয়া মানুষ জগতের এবং নিজের যে অনিষ্ট করিতেছে তাহা উপেক্ষা করিবার নয়। ভূপৃষ্ঠ নিজেই সচ্ছিদ্র। উদ্ভিদ্‌দিগের গভীর এবং সুদূরবিস্তৃত মূল মৃত্তিকাকে

জমাট বাঁধিতে না দিয়া উহার সচ্ছিদ্রতা আরও বাড়াইয়া তোলে। বর্ষার জল ভূগর্ভে প্রবেশ করিলে শিকড়সংলগ্ন মৃত্তিকা স্পঞ্জের ন্যায় সেই জল ধরিয়া রাখে। তারপর যখন গ্রীষ্মের প্রচণ্ড সূর্য্যতাপে ভূপৃষ্ঠ ও জলাশয়গুলি শুষ্ক হইতে আরম্ভ করে, তখন সেই অরণ্যতলে সঞ্চিত জলরাশি মাটির ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করিয়া জলাশয়গুলিকে পূর্ণ করিতে থাকে। অরণ্যের এই জলসঞ্চয়-কাজটি বড় কম ব্যাপার নয়। বড় বড় জঙ্গলগুলি কাটিয়া ফেলিলেই যে দেশে জলকষ্ট ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসে তাহার অনেক প্রমাণ আছে। ডার্টমুর হইতে খাল কাটিয়া ইংলণ্ডের প্লিমাথ (Plymouth) সহরে জল জোগাইবার ব্যবস্থা বহু দিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছিল। ঐ অঞ্চলে যে দুই-একটা বড় জঙ্গল ছিল তাহা কাটিয়া ফেলায় এখন খাল প্রায় শুষ্ক হইয়া আসিয়াছে। সকল দেশেই অরণ্যধ্বংসের এই প্রকার প্রত্যক্ষ কুফল হাতে হাতে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। বৃক্ষ-সকল তাহাদের মূল-দ্বারা কেবল জল আটকাইয়াই যে দেশের হিতসাধন করে তাহা নয়; স্থানীয় স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারেও ইহাদের অনেক কাজ আছে। খুব শুষ্ক এবং ভিজা বায়ুর মধ্যে কোনটিই স্বাস্থ্যের অনুকূল নয়। নির্দ্দিষ্টপরিমাণ জলীয় বাষ্প বায়ুতে মিশ্রিত থাকিলে, কেবল তাহাই আমাদের হিতকর হয়। উদ্ভিদ্দেহ হইতে অবিরাম যে জলীয় বাষ্প বহির্গত হয়, তাহাই শুষ্কতা নিবারণ করিয়া বায়ুকে প্রাণীর পক্ষে স্বাস্থ্যপ্রদ করিয়া তোলে। অরণ্যের ধ্বংসসাধন করিয়া স্পেন যে কুকার্য্য করিয়াছিল, এখন দুর্ভিক্ষ ও জলকষ্টের বেদনায় তাহার প্রায়শ্চিত্ত চলিতেছে। মার্কিনেরাও ধীরে ধীরে অরণ্য-উচ্ছেদের কুফল বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

চীন এবং তিব্বতের সীমান্তপ্রদেশ কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে উর্ব্বরতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, দেশ অরণ্যহীন করায় এখন তাহা প্রাণি-চিহ্নবর্জ্জিত মহাপ্রান্তরে পরিণত হইয়াছে।

পৃথিবীর নানা অংশে যে বৃহৎ মরুভূমিগুলি আছে, তাহাদের উৎপত্তির জন্য মানুষকে অবশ্যই সম্পূর্ণ দায়ী করা যায় না। কিন্তু কতকগুলি স্থানে যে সকল ক্ষুদ্র মরুভূমি ধীরে-ধীরে বিস্তার লাভ করিয়া শ্যামল, উর্ব্বর ভূখণ্ডকে গ্রাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার জন্য মানুষই দায়ী। প্রাণিদেহের আহত অংশে ক্ষত দেখা দিলে, তাহা যেমন ক্রমেই বিস্তার লাভ করিয়া সুস্থ অংশে জুড়িয়া বসে, ক্ষুদ্র মরুভূমিগুলি সেই প্রকার ক্ষতের ন্যায়ই বিস্তার লাভ করিয়া পার্শ্বস্থ উর্ব্বর ভূভাগকে কুক্ষিগত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মরুভূমির এই প্রকার ক্রমবিস্তার ভূপৃষ্ঠের ব্যাধিবিশেষ, সুতরাং ইহার নিবারণ মানুষের সাধ্যাতীত। কিন্তু মানুষই যে বন কাটিয়া নানা স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মরুভূমির উৎপাদন করিতেছে তাহা সুনিশ্চিত। এইগুলি যখন কালক্রমে বিস্তার লাভ করিয়া সমগ্র ভূভাগকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে, তখন মানুষ নিজের কুকার্য্যের ফল আরও দেখিতে পাইবে।

জগদানন্দ রায়

কবি হাফেজ

এই ব্রহ্মাণ্ড এক বিশাল 'হরণ-পূরণের' মেলা। এক দিকে ভাঙ্গা, অন্য দিকে গড়া। এই দুই চিত্রের ভিতর এক মহাশক্তি দোলা দিতেছে। আজ যাহা সৃষ্টির গৌরবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে, কালই তাহা আবার ধ্বংসের বিরাট্ আঁধারে ঢাকিয়া যাইতেছে। কিন্তু প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া, এই ভাঙ্গা-গড়ার অন্তরাল দিয়া, ছন্দে-ছন্দে পলকে-পলকে এক নিত্য সনাতন শক্তির অনন্ত নর্ত্তন ধ্বনিয়া উঠিতেছে।

বিশাল সমুদ্রে আমরা কি দেখিতে পাই? বিপুল তরঙ্গরাশি অবিরাম ভাঙ্গিতেছে—গড়িতেছে—সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিতেছে—আবার চূরমার হইয়া ধসিয়া পড়িতেছে। ধ্বংস আর গঠনের বিরাট্ অভিনয়! কিন্তু এই ধ্বংসের ভিতর দিয়া সমুদ্র ত যেমন তেমনি রহিয়া যাইতেছে। তেমনি বসন্ত আপনার ফুল-কোকিল লইয়া জগৎ হইতে চলিয়া গেল; গ্রীষ্ম আসিল, বর্ষা আসিল; শরৎ ও শীতের অন্তে আবার বসন্তের আবির্ভাব হইল। কি আসিল?—যাহাকে বসন্ত বলিয়া বরিয়া লইলাম, সে কি? কি তাহা কে বলিবে! শুধু দেখা গেল,—ফুল ফুটিল, আকাশ হাসিল, তরুলতা মুঞ্জরিল, দোয়েল-শ্যামা-কোকিলের স্বরে আকাশ ভরিয়া গেল। এ অভিনব আয়োজনে কাহার আবির্ভাব হইল? যে ঐশী শক্তি ধরাকে নিত্য নব সাজ পরাইতেছে, যাহা দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ রূপে ফুটিয়া উঠিতেছে, বসন্তে তাহারই এক অভিনব বিকাশ হয় না কি?

নবোদ্ভিন্ন লতিকার নর্ত্তনশীল শ্যামল পত্রাভরণে যে সুষমা,—বিকশিত কুসুমের সুরভিত হাসিতে যে মাধুর্য্য,—শুষ্ক ভূতল-লুণ্ঠিত মুকুলের ম্লান দৈন্যে যে নীরব গাম্ভীর্য্য,—সে সকলি সেই মহাশক্তির বিরাট্ মহিমার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছে। সূর্য্যের বিশ্বদ্রোহী রশ্মিতে, চন্দ্রের স্নিগ্ধ কৌমুদীতে, নক্ষত্রের গূঢ় অব্যক্ত কিরণে তাঁহারই উদারতা ও তাঁহারই অনধিগম্যতা পরিব্যক্ত হইতেছে।

হাফেজ এই মহাসত্য স্পষ্ট বুঝিযাছিলেন। হাফেজের সমগ্র কাব্যের ভিতর দিয়া এই একই সুর ধ্বনিত হইয়াছে।

যিনি তোমার আমার নয়ন হইতে প্রচ্ছন্ন, অথচ কখনও কখনও অজানা মুহূর্ত্তের ফাঁক দিয়া আমাদের সকলেরই অন্তরে হঠাৎ সাড়া দিয়া উঠেন,—ব্যথিতের শান্তি-রূপে, হতাশের আশা-রূপে, নিরবলম্বনের আশ্রয়-রূপে যিনি মাঠে-মাঠে দেখা দেন, ফাঁকে-ফাঁকে থাকিয়া সেই "কাছে পেয়ে কাছে না-পাই"-ভাবে আমাদের সঙ্গে লীলাখেলার অভিনয় করেন—ভ্রমণে, বিহারে, হঠাৎ স্বপ্নের মত চিন্তার কোলে ভাসিয়া উঠিয়া, আঁধার প্রাণে একটু অস্ফুটস্ত কিরণ ঢালিয়া অন্তর্দ্ধান করেন—সেই লীলাময় গোপন পুরুষ প্রকৃতির ভিতর দিয়া হাফেজের নিকট ধরা দিয়াছিলেন। একদিন ইনিই ওমর খাইয়ামের অমর বীণায় সুরের আলাপ করিয়াছিলেন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভিতর দিয়া প্রকৃতির সজ্ঞানতা নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, আবার ইনিই আজ রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিতেছেন,

"অশ্রুত কোন্ গানের ছন্দে অদ্ভুত এ দোল!"

এই যে কবি-প্রতিভা যুগযুগান্তরের ভিতর দিয়া কালের বক্ষে

পুনঃ পুনঃ প্রস্ফুটিত হইয়া বিশ্বমানবকে হাসাইতেছে, কাঁদাইতেছে, মরমে পশিয়া অন্তরের অন্তস্তলকে আকুল করিতেছে, পারস্য-প্রসূন হাফেজে তাহারই এক অভিনব বিকাশ। মানব চিরকালই ভাবের উপাসক। কবি সেই ভাবরাজ্যের শিল্পী; ভাব লইয়াই তাঁহার লীলাখেলা। তাই কবিতা কখনও পুরাতন হয় না। চিরন্তন আত্মার ন্যায় উহা অনন্ত কাল ধরিয়া মানুষের প্রাণের সহিত আত্মীয়তা করিয়া আসিতেছে। তাই "কবিতা কালের সাক্ষী,—কবিতা অমর।" আর এই বিশাল ভাবরাজ্যের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠতম, হাফেজ সেই ভগবৎপ্রেমের কবি। হাফেজের সমগ্র কাব্যের পত্রে-পত্রে, ছত্রে-ছত্রে, এই একই সুর ঝঙ্কার দিতেছে।

হাফেজ যখন আপনার অপার্থিব সঙ্গীতে পারস্যের সাহিত্য-কানন মুখরিত করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে বঙ্গের এই শ্যামল কুঞ্জ মধুময় করিয়া একজন বঙ্গকবি আপনার বীণায় সুরের আলাপ করিতেছিলেন। ইনিই বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস। মহা এশিয়ার দুই বিভিন্ন কোণে, দুই সাধক একই সময়ে একই সুরের আলাপ করিতেছিলেন।

আবার বহু কাল পরে আজ রবীন্দ্রনাথেও ঐ সুর নবপ্রাণ লাভ করিয়াছে। এ সুর যে নিত্য, চিরস্থায়ী। উহা 'নবরসের' প্রবাহে রসময় নহে, ষড়্‌রিপুর লীলাবৈচিত্র্যেও উহা অপ-রঞ্জিত নহে। উহা ক্রোধরূপে হৃদয়কে দগ্ধীভূত করিয়া অঙ্গাররূপে নিঃশেষ রাখিয়া যায় না; লালসা-জড়িত-প্রবৃত্তির ন্যায় হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া আবার উহাকে মূর্চ্ছিত ও অবসন্ন অবস্থায় ফেলিয়া যায় না; পরন্তু যাহা অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় মৃদু-কলনাদে ভক্তের প্রাণের

গোপন প্রদেশে অবিরাম প্রবাহিত হইতেছে, নিত্য সনাতন মহামিলনের পানে অনাহত-ভাবে ছুটিয়া চলিয়াছে—তরঙ্গে-তরঙ্গে অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনার উদ্বোধন করিয়া ভক্তের প্রাণ বিভোর করিতেছে—হাফেজ সেই পারমার্থিক প্রেমের উপাসক ছিলেন।

আজ সাত শত বৎসর হইল, সিরাজের কোকিল অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছেন। রোক্‌নাবাদের তট-মূর্চ্ছিত প্রদোষ-সমীরে আর তাঁহার কণ্ঠ ধ্বনিত হইয়া উঠে না। তথাপি সেই নির্ঝরের তীরে, উদ্যানের মাঝে, মর্ম্মর-খচিত সমাধির দিকে নিরীক্ষণ কর, দেখিবে অনিল-নিস্বনে গীত হইতেছে—হাফেজ মরেন নাই! তাঁহার অপার্থিব সঙ্গীত তাঁহার জৈব-কণ্ঠ পরিহার করিয়া আজ সহস্র নরনারীর কণ্ঠে বিরাজ করিতেছে। হাফেজের ভগবৎপ্রেম, হাফেজের দার্শনিক চিন্তা, হাফেজের ভাবুকতা বিশ্বসাহিত্যে অমূল্যরত্ন প্রদান করিয়াছে। হাফেজ কোন্ কালে জন্মিয়াছিলেন—কিন্তু এই সুদীর্ঘ সাত শত বৎসরে, এই নব সভ্যতার আলোক-উদ্ভাসিত যুগে, তেমন গভীর ভাবপূর্ণ উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য-গ্রন্থ দুই-চারিখানির অধিক রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে হাফেজের এই স্বাতন্ত্র্য, এই অসাধারণত্ব তাঁহার ধর্ম্মজগতে সিদ্ধিলাভের ফল। সাধকের প্রাণের কথা বলিয়াই, দেখ রামপ্রসাদের সঙ্গীত আজিও বাঁচিয়া আছে এবং বঙ্গের গৃহে-গৃহে আদৃত ও গীত হইতেছে। কত গানই ত বাঙ্গালায় রচিত হইয়াছে, কিন্তু গভীর নিশীথে যখন গিরিশচন্দ্রের

"কুহু কেমন মা তা কে জানে!"

শুনি, তখন সেই সাদা সুরে প্রাণটা যেমন আকুল হইয়া উঠে, তেমন

আর কোন্‌টিতে হয়? তাই বলিতে হয়, হাফেজে যে কবি-প্রতিভা ফুটিয়াছিল উহা দৈবশক্তির এক অভিনব বিকাশ। সিদ্ধ তাপস রুমীর ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়,

"দো দহান্ দারীম গূয়া হম্ চুন্ নায়।"

অর্থাৎ কবির প্রাণ বাঁশীমাত্র; উহার এক প্রান্ত সেই সনাতন মহাগায়কের অধরে, এবং অন্য প্রান্ত এই বিশ্বমানবের নিকট স্বর্গীয় সুরে অপূর্ব্ব অশ্রুত সঙ্গীতের আলাপ করে। আর পাপ-তাপ-দগ্ধ-মানব এই সংসার-মরুতে সেই অমৃত পান করিয়া বাঁচিয়া থাকে।

মোহম্মদ বর্‌কতুল্লাহ্

স্বাধীনতা ও সাম্প্রদায়িকতা

বিশ্বের ভাষায় যে-কয়েকটি পরস্পর-বিরুদ্ধ শব্দ আছে, 'স্বাধীনতা' ও 'সাম্প্রদায়িকতা' শব্দদ্বয় তাহারই পর্য্যায়ভুক্ত হইবার মত শব্দ। প্রকৃত স্বাধীনতা ও সাম্প্রদায়িকতা কখনই একই স্থানে থাকিতে পারে না। দুধে-জলে সংমিশ্রণের ন্যায় স্বাধীনতার সহিত সাম্প্রদায়িকতা প্রশ্রয় পাইলে, তাহা আর স্বাধীনতা থাকে না, তাহা সেই দুধ-দেওয়া জল অথবা জল-দেওয়া দুধের মতই এক অন্তঃসারশূন্য বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। পৃথিবীর ইতিহাসে যতগুলি স্বাধীনতা বা মুক্তির আন্দোলন পণ্ড হইয়াছে তাহার অধিকাংশই যে সাম্প্রদায়িকতা বা এইরূপ কোন ভেদ-নীতির জন্যই হইয়াছে, তাহা প্রত্যেক ইতিহাসবিদ্‌কেই স্বীকার করিতে হইবে। পৃথিবীর ইতিহাস-পাঠে আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই যে, যখন কোন নিপীড়িত জাতি স্বাধীনতা-লাভের সঙ্কল্প করে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সাম্প্রদায়িকতা বা ঐ শ্রেণীর কোন ভেদ-নীতি সেই জাতির মধ্যে গৃহকলহ এরূপ মারাত্মকভাবে জাগাইয়া তুলে যে, তখন সেই মুক্তিকামী জাতির সে উৎসাহ, সে তেজ আর থাকে না,—জাতি তখন গৃহবিবাদে ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। কোথায় থাকে তাহার স্বাধীনতার দাবী, আর কোথায় থাকে তাহার মুক্তি-আন্দোলন? সমগ্র জাতি সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জ্জরিত হইতে থাকে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, সাম্প্রদায়িকতার সহিত স্বাধীনতার

এত বিরোধ কেন, এবং কেনই-বা সাম্প্রদায়িকতা সকল প্রকার মুক্তির আন্দোলনকে পঙ্গু করিয়া থাকে। ইহার উত্তর দিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে সাম্প্রদায়িকতার একটা সংজ্ঞা দেওয়া দরকার। সাম্প্রদায়িকতা বস্তুটি কি, তাহার প্রকৃত অর্থ না জানিলে উহার সহিত স্বাধীনতার অহি-নকুল সম্বন্ধ কেন, তাহা বুঝা যাইবে না। ইহা সব সময়ে সম্ভব নয় যে, বিশেষ কোন দেশে একই শ্রেণীর, একই সম্প্রদায়ের, একই ধর্ম্মের, একই স্বার্থবিশিষ্ট লোককে বাস করিতে হইবে। যদি কোথাও এরূপ দেশ থাকে, তবে হয়ত সেখানে কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা উঠে না। অনেক সময়ে দেখা যায় যে, বিশেষ বিশেষ দেশে নানা সম্প্রদায়ের নানা স্বার্থবিশিষ্ট লোক বহু যুগ হইতে একই পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে কখনও কলহে, কখনও শান্তিতে বাস করিয়া আসিতেছে। তাহাদের ধর্ম্ম, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, সভ্যতা, কাল্‌চার পরস্পর হইতে এত বিভিন্ন যে, এক দেশের অধিবাসী হইলেও তাহাদিগকে আপাততঃ এক জাতি (Nation) বলিয়া মনে হয় না। সচরাচর এই সমুদয় দেশে সাম্প্রদায়িক সমস্যা উঠে এবং সময়ে সময়ে মারাত্মক আকার ধারণ করিয়া থাকে। এই সকল দেশের প্রধান সমস্যা এই দাঁড়ায় যে, দেশের সাধারণ হিতের জন্য যাবতীয় সম্প্রদায় কিংবা সম্প্রদায়-বিশেষ নিজেদের আচার, সভ্যতা, কাল্‌চার ইত্যাদি বিসর্জ্জন দিয়া সমগ্র দেশকে লইয়া একটা বিরাট্ অখণ্ড জাতি গঠন করিতে নিজেদের বিলাইয়া দিবে, অথবা নিজেদের আচার, সভ্যতা ইত্যাদি অব্যাহত রাখিবার জন্য দেশের বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি সম্পূর্ণরূপে অমনোযোগী হইবে ;—নিজেদের স্বাতন্ত্র্য, নিজেদের বৈশিষ্ট্যের প্রতি

দৃক্‌পাত না করিয়া কেবল সমগ্র দেশের কথাই ভাবিবে, অথবা দেশের ও সমগ্র জাতির কথা অগ্রাহ্য করিয়া কেবল নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক স্বার্থের জন্যই ব্যস্ত থাকিবে।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা মতের যদি কোনও মূল্য থাকে, তাহা হইলে আমরা ইহা কোন দিনও চাহিব না যে, সেই স্বাধীনতা বা স্বাধীন মতকে বিসর্জ্জন দিয়া মানুষ কেবলি ভাবুক অপরের কথা। যে শাসনতন্ত্রে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার স্থান নাই, আমরা তাহাকে পূর্ণ স্বাধীনতা বলি না। সেকালে স্পার্টা-দেশের মূলমন্ত্র ছিল—রাষ্ট্রের হিতের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির অস্তিত্ব-রক্ষা। কিন্তু এ যুগের রাষ্ট্রীয় আদর্শ ঠিক তাহার বিপরীত। এখন দেশের অধিবাসীর জন্যই রাষ্ট্রের প্রয়োজন। এ যুগের প্রত্যেক রাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্য জনগণকে রক্ষা করা, তাহাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় অপরকে হস্তক্ষেপ করিতে না দেওয়া, তাহাদিগকে নীতিসম্মত সমস্ত কার্য্যে পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করা। ব্যক্তির ব্যষ্টি লইয়া সমষ্টি, আবার এই সমষ্টি লইয়া দেশ। সুতরাং যে দেশে ব্যক্তির সকল প্রকার স্বার্থ সর্ব্ব বিষয়ে সংরক্ষিত হয় না, সে দেশে পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিতেই পারে না। যে দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায় বাস করে, সে দেশের প্রত্যেক ব্যক্তিকে অ-রাজনৈতিক প্রত্যেক বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম্ম, আচার প্রভৃতি পালন, প্রচার ও বিস্তার করিবার অধিকার এবং শিক্ষা, সভ্যতা, কাল্‌চার ইত্যাদি সংরক্ষণ করিবার ক্ষমতা থাকা চাই। এই সকল অধিকার স্বাধীনতার লক্ষণ। বৈদেশিক কর্ত্তৃত্ব হইতে যতই মুক্ত হউক না কেন, কোনও দেশের প্রত্যেক সম্প্রদায় যদি এই সব অধিকার না পায়, তাহা হইলে

আমরা সে দেশকে পূর্ণরূপে স্বাধীন বলিব না। ঐ অধিকারগুলি স্বাধীনতার অপরিহার্য্য অঙ্গ। যে দেশে নানা সম্প্রদায়ের লোক বাস করে, সে দেশের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট স্বার্থ ব্যতীত এমন অনেকগুলি স্বার্থ আছে, যাহা যাবতীয় সম্প্রদায়ের অতি-প্রয়োজনীয় সাধারণ স্বার্থ,—যাহা না হইলে সম্প্রদায়-বিশেষের বিশিষ্ট স্বার্থের কোন মূল্যই থাকে না এবং যাহার অভাবে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রকার নির্ব্বিঘ্নতা পদে পদে খণ্ডিত হইয়া থাকে—যেমন দেশের স্বাধীনতা বা আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা। দেশের শাসনকার্য্যে যদি দেশ-প্রতিনিধিদের পূর্ণ ক্ষমতা না থাকে, তাহা হইলে "সাম্প্রদায়িক স্বার্থ-সংরক্ষণ" কথাটা অর্থহীন শব্দ মাত্র।

রেজাউল করীম

পঞ্চাংশ

পূর্ব্বরাগ

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।

বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা॥

সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়ান-তারা।

বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে
যেমতি যোগিনী পারা॥

এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি
দেখয়ে খসায়ে চুলি [১]।

হসিত বয়ানে চাহে মেঘ পানে
কি কহে দুহাত তুলি॥

একদিঠে করি ময়ুর-ময়ুরী-
কণ্ঠ [২] করে নিরীক্ষণে।

চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া-বঁধুর সনে॥

চণ্ডীদাস

১। চুল

২। শ্রীকৃষ্ণের সহিত বর্ণসাদৃশ্য-হেতু।

আত্ম-সমর্পণ

মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।

দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পলুঁ

দয়া জনু [১] ছোড়বি মোয়॥

গণইতে দোষ গুণলেশ ন পাওবি

যব তুহুঁ করবি বিচার [২]।

তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি [৩]

জগ বাহির নহোঁ মুঞি ছার [৪]॥

কিয়ে মানুষ পশু পাখী কিয়ে জনমিয়ে

অথবা কীট পতঙ্গ।

করম-বিপাকে গতাগতি পুন পুন

মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ [৫]॥

১। যেন না।

২। দোষ বিচার করিতে গিয়া লেশমাত্র গুণ আমার মধ্যে পাইবে না।

৩। বলাইতেছ, প্রচার করিতেছ।

৪। আমি যতই অপরাধী ও তুচ্ছ হই না কেন, তোমার জগতের বাহিরে ত নহি। (অর্থাৎ তুমি যখন জগতের নাথ তখন একদিন আমাকে উদ্ধার করিতেই হইবে।)

৫। প্রসঙ্গ, বিষয়—তোমার কথায় যেন আমার মতি বা আগ্রহ থাকে।

ভণয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু ।
তুয়া পদপল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু ॥

বিদ্যাপতি

গৌরচন্দ্রিকা[1]

বিমল হেম জিনি　　　　তনু অনুপাম[2] রে
　　তাহে শোভে নানা ফুলদাম।
কদম্ব-কেশর জিনি　　　　একটি পুলক[3] রে
　　তার মাঝে বিন্দু বিন্দু ঘাম॥
চলিতে না পারে গোরা　　　　চাঁদ গোসাঞি রে
　　বলিতে না পারে আধ বোল।
ভাবে অবশ হৈয়া　　　　হরি হরি বোলাইয়া
　　আচণ্ডালে ধরি দেই কোল॥
গমন মন্থর-গতি　　　　জিনি মদমত্ত হাতী
　　ভাবাবেশে ঢুলি ঢুলি যায়।
অরুণ-বসন-ছবি　　　　জিনি প্রভাতের রবি
　　গোরা-অঙ্গে লহরী খেলায়॥
এ হেন সম্পদ্ কালে　　　　গোরা না ভজিনু হেলে
　　তছু[4] পদে না করিনু আশ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য　　　　ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ
　　গুণ গায় বৃন্দাবনদাস॥

বৃন্দাবনদাস

১। গৌরাঙ্গ-সম্বন্ধীয় গীতি　　২। অনুপম
৩। রোমাঞ্চ　　৪। তাঁহার

শিবের দক্ষালয়ে যাত্রা

মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটাপট জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল্ টলট্টল্ কলক্কল্ তরঙ্গা॥
ফণাফন্ ফণাফন্ ফণীফন্ন গাজে।
দিনেশ-প্রতাপে নিশানাথ সাজে॥
ধকধ্বক্ ধকধ্বক্ জ্বলে বহ্নি ভালে।
ববম্বম্ ববম্বম্ মহাশব্দ গালে॥
দলম্মল্ দলম্মল্ গলে মুণ্ডমালা।
কটি কট্ট সদ্যঃ মরা হস্তি-ছালা॥
পচা চর্ম্ম ঝুলী করে লোল ঝুলে।
মহাঘোর আভা পিনাকে ত্রিশূলে॥

ধিয়া তা ধিয়া তা ধিয়া ভূত নাচে।
উলঙ্গী উলঙ্গে পিশাচী পিশাচে॥
চলে ভৈরবা ভৈরবী নন্দী ভৃঙ্গী।
মহাকাল বেতাল তাল ত্রিশৃঙ্গী॥
চলে ডাকিনী যোগিনী ঘোর বেশে।
চলে শাঁখিনী প্রেতিনী মুক্তকেশে॥

৮ শিবের দক্ষালয়ে যাত্রা

গিয়া দক্ষযজ্ঞে সবে যজ্ঞ নাশে।
কথা না সরে দক্ষরাজে তরাসে॥
অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে॥

ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে।
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে॥

ভারতচন্দ্র রায়

সমুদ্রমন্থনে শিব

পার্ব্বতীর কটুভাষ শুনি ক্রোধে দিগ্‌বাস
টানিয়া আনিল বাঘবাস।
বাসুকি নাগের দড়ি কাঁকালি বাঁধিল বেড়ি
তুলিয়া লৈল যুগপাশ॥
কপালে কলঙ্কি-কলা কণ্ঠেতে হাড়ের মালা
করযুগে কঞ্চুকি কঙ্কণ।
ভানু বৃহদ্ভানু শশী ত্রিবিধ প্রকার ভূষি
ক্রোধে যেন প্রলয়-কিরণ॥
যেন গিরি হেমকূটে আকাশে লহরী উঠে
উথে মধ্যে গঙ্গা জটাজূটে।
রজত-পর্ব্বত-আভা কোটি চন্দ্র-মুখ-শোভা
ফণি-মণি বিরাজে মুকুটে॥
গলে দিল হার সাপ টঙ্কারি ফেলিল চাপ
ত্রিশূল ভ্রূকুটি লইলা করে।
পদভরে ক্ষিতি টলে চীৎকার ছাড়িয়া চলে
অতিশয় বেগে ভয়ঙ্করে॥
ডম্বুরের ডিমি ডিমি আকাশ পাতাল ভূমি
কম্প হইল ত্রৈলোক্য-মণ্ডলে।
অমর ঈশ্বর ভীত আর সবে সচিন্তিত
এ কোন্ প্রলয় হৈল বলে॥

বৃষভ সাজায়ে বেগে নন্দী আনি দিল আগে
নানা রত্ন করিয়া ভূষণ।
ক্রোধে কাঁপে ভূতনাথ যেন কদলীর পাত
অতি শীঘ্র কৈলা আরোহণ॥
আগু-দলে সেনাপতি ময়ুর-বাহনে গতি
শক্তি করে করি ষড়ানন।
গণেশ চড়িয়া মূষ করে ধরি পাশাঙ্কুশ
দক্ষিণ ভাগেতে ক্রোধ-মন॥
বামে নন্দী মহাকাল করে শূল গলে মাল
পাছে জরাসুর ষট্‌পদে।
চলিলা দেবের রাজ দেখিয়া শিবের কাজ
তিন লোকে গণেন প্রমাদে॥
ক্ষণেকে ক্ষীরোদ-কূলে উত্তরিলা সহ দলে
যথায় মথনে সুরাসুর।
কাশীরাম দাস কয় শীঘ্রগতি প্রণময়
সর্ব্ব দেবে দেখিয়া ঠাকুর॥

করযোড়ে দাণ্ডাইলা সর্ব্ব দেবগণ।
শিব বলে মথ সিন্ধু রহাইলে কেন॥
ইন্দ্র বলে মথন হৈল দেব শেষ।
নিবারিয়া আপনে গেলেন হৃষীকেশ॥
একে ক্রোধে আছিলেন দেব মহেশ্বর।
দ্বিতীয় ইন্দ্রের বাক্যে কম্পে কলেবর॥

শিব বলে এত গর্ব্ব তোমা সবাকার।
আমারে হেলন কর এত অহঙ্কার॥
রত্নাকর মথি সভে রত্ন লৈলে বাঁটি।
হেন চিত্তে না করিলে আছয়ে ধূর্জ্জটি॥
যে করিলে তাহা কিছু না করিয়ে মনে।
আমি মথিবারে কৈনু—করহ হেলনে॥
এতেক বলিলা যদি দেব মহেশ্বর।
ভয়েতে দেবতা সব না করে উত্তর॥
নিঃশব্দে রহিলা সব দেবের সমাজ।
করযোড়ে বলয়ে কশ্যপ মুনিরাজ॥
অবধান কর দেব পার্ব্বতীর কান্ত।
কহিব ক্ষীরোদ-সিন্ধু-মথন বৃত্তান্ত॥
পারিজাত-মালা দুর্ব্বাসার গলে ছিল।
স্নেহেতে সেই পুষ্পমালা ইন্দ্র গলে দিল॥
গজরাজ-আরোহণে ছিলা পুরন্দর।
সেই মাল্য দিল তার দন্তের উপর॥
সহজে মাতঙ্গ অনুক্ষণ মদে মত্ত।
পশুজাতি না জানিল মালার মহত্ত্ব॥
শুণ্ডে জড়াইয়া মালা ফেলিলা ভূতলে।
দেখিয়া দুর্ব্বাসা ক্রোধে অগ্নি হেন জ্বলে॥
অহঙ্কারে ইন্দ্র মোরে অবজ্ঞা করিল।
মোর দত্ত মাল্য ইন্দ্র ছিঁড়িয়া ফেলিল॥
সম্পদে হইয়া মত্ত খর্ব্ব কৈল মোরে।
দিল শাপ হতলক্ষ্মী হও পুরন্দরে॥

ব্রহ্মশাপে লোকমাতা প্রবেশিল জলে।
লক্ষ্মী বিনা কষ্ট হৈল ত্রৈলোক্য-মণ্ডলে॥
লোকের কারণ ব্রহ্মা কৃষ্ণে নিবেদিল।
সমুদ্র মথিতে আজ্ঞা নারায়ণ কৈল॥
এই হেতু ক্ষীরোদ মথিল মহেশ্বর।
শেষ—মথনের দড়ি, মন্থন—মন্দর॥
অনেক উৎপাত হৈল বরুণের পুরে।
লক্ষ্মী দিয়া স্তুতি কৈল দেব বিশ্বেশ্বরে॥
নিবারি মথন তেঁই গেলা নারায়ণ।
পুনঃ তুমি আজ্ঞা কর মথন-কারণ॥
বিষ্ণু-বলে বলবান্ আছিল অমর।
ইবে বিষ্ণু বিনা শ্রমযুক্ত কলেবর॥
দ্বিতীয় মথন দড়ি নাগরাজ-শেষ।
সাক্ষাতে আপনে প্রভু দেখ তার ক্লেশ॥
অঙ্গের যতেক হাড় সব হৈল চূর।
সহস্র মুখেতে লাল বহয়ে প্রচুর॥
বরুণের যত কষ্ট না যায় কথন।
আর আজ্ঞা নহে দেব মথন-কারণ॥
শিব বলে আমা হেতু মথ একবার।
আসিবার অকারণ না হয় আমার॥
হরবাক্য কার শক্তি লঙ্ঘিবারে পারে।
পুনরপি মন্দর ধরিল দেবাসুরে॥
শ্রমেতে অশক্ত কলেবর সর্ব্বজনা।
ঘনশ্বাস বহে যেন আগুনের কণা॥

অত্যন্ত ঘর্ষণে পুনঃ মন্দর পর্ব্বত।
তপত হইল যেন জলদগ্নিবৎ ॥
ছিঁড়ি খণ্ড খণ্ড হইল নাগের শরীর।
ক্ষীরোদ-সাগরে সব বহিল রুধির ॥
অত্যন্ত ঘর্ষণ নাগ সহিতে নারিল।
সহস্র মুখের পথে গরল স্রবিল ॥
সিন্ধুর ঘর্ষণ-অগ্নি সর্পের গরল।
দেবের নিঃশ্বাস আর মন্দর-অনল ॥
চারি অগ্নি মিশ্রিত হইয়া এক হৈল।
সমুদ্র হৈতে আচম্বিতে বাহিরিল ॥
প্রাতঃ হৈতে যেন দিনকর তেজ বাড়ে।
দাবানল বাড়ে যে শুষ্ক বন পোড়ে ॥
যুগান্তের কালে যেন সমুদ্রের জল।
মুহূর্ত্তেকে ব্যাপিলেক সংসার সকল ॥
দহিল সভার অঙ্গ বিষম জ্বলনে।
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল সর্ব্বজনে ॥
পলায় সহস্রচক্ষু কুবের বরুণ।
পবন শমন অগ্নি পলায় অরুণ ॥
অষ্টবসু নবগ্রহ অশ্বিনীকুমার।
অসুর কিন্নর যক্ষ যত ছিল আর ॥
পলাইয়া গেল যত ত্রৈলোক্যের জন।
বিষণ্ণ বদনে চাহে দেব ত্রিলোচন ॥
দূর হৈতে সব দেবগণ করে স্তুতি।
রক্ষা কর ভূতনাথ অনাথের গতি

আপন অর্জ্জিত সৃষ্টি বিষে করে নাশ।
হৃদয়ে চিন্তিয়া আশু হৈলা কৃত্তিবাস॥
সমুদ্র জুড়িয়া বিষ আকাশ পরশে।
আকর্ষণ করি হর করিল গণ্ডূষে॥
দূর হইতে সুরাসুর দেখয়ে কৌতুকে।
করিল গরল পান একই চুম্বকে॥
অঙ্গীকৃত কারণ লৈল ধর্ম্ম দেখাবারে।
কণ্ঠেতে রাখিলা বিষ না লৈলা উদরে॥
নীলবর্ণকণ্ঠ অদ্যাপিহ বিশ্বনাথ।
নীলকণ্ঠ নাম সেই হৈতে হৈল খ্যাত॥

কাশীরাম দাস

কবি ও কবিতা

পান করি কবিতার সুরস মধুর।
শোক তাপ যত আছে সব হয় দূর ॥
কবিতা অমৃত-ফলে যে না নিলে তার।
অধিক কি কব ধিক্ বৃথা জন্ম তার ॥
হও তুমি সুপণ্ডিত বিদ্যার সাগর।
গদ্য লিখে বাধ্য করি হও প্রিয়বর ॥
কবিতার প্রতি যদি প্রেম নাহি ধর।
কবির কবিতা-গুণ ব্যাখ্যা নাহি কর ॥
কি রস নীরস তুমি বিরস বিকট।
কিসে তুমি যশ পাবে গুণীর নিকট ?
কবিতার প্রেমে যদি না হও প্রেমিক।
কোথা তব রসবোধ কিসের রসিক ?
কাকের ডাকের ন্যায় কর্কশ কু ...
তাহে তুমি কত গুণ করিবে প্রকাশ ?
ভাব রস প্রেম আছে কোথায় তোমার ?
কার বলে কর তুমি পুস্তক-প্রচার ?
কবিগণ মহাজন নাহি রাখে ধার।
ব্যয় করে পুঁজিপাটা শুধু আপনার ॥
তোমার কি আছে পুঁজি সকলেরি ধারো
ধার-করা ভাব লয়ে যা করিতে পারো

ধেয়ো হ'য়ে হেয়ো হলে মুখে বল জিৎ।
জানিতে না পারো কিছু কারে বলে হিত॥
যদি জানি নানারূপ নিধির নিধান।
সাগরের লোণা জল তবে করি পান॥
সাগর ডাগর নাম বিহীন রতন।
এমন সাগরে আমি করি না যতন॥
'কবিতা' অমৃত-সিন্ধু ভাব যার ঢেউ।
এ সাগরে প্রেম-জল নাহি খায় কেউ॥
মনের এ খেদ কারে করিব প্রকাশ।
হায় হায়! এই দুঃখ কে করিবে নাশ?
কেহ আর নাহি চায় মধুর সুরস।
কাঠেতে কামড় মেরে গান করে যশ॥
মিছা বাক্-আড়ম্বর নাহি জ্ঞান বল।
কার বলে বল করে কি আছে সম্বল?
কবির মনের মাঝে অক্ষয় ভাণ্ডার।
কিছুতেই কোনও কালে ক্ষয় নাই তার॥
সাগরের যত ঢেউ হতেছে উদ্ভব।
কবির ভাবের কাছে তারা পরাভব॥
এক যায় আর হয় ক্রমেই উদয়।
নিয়ত লহরী খেলে বিশ্রাম না হয়॥
সীমার ভিতরে আছে সমুদ্রের নীর।
এ সাগরে কত জল কিছু নাহি স্থির॥
সে সাগর শুকাইয়া কত দ্বীপ হয়।
এ সাগর কোন কালে শুকাবার নয়॥

সে সাগরে জোর-ভাঁটা হ্রাস-বৃদ্ধি ভাই।
ইথে নাহি জোর ভাঁটা সমান সদাই॥
কূল নাই সীমা নাই তুফান না হয়।
নিরমল নিরাকার নীরাকার নয়॥
সাগরে ডুবিলে পরে প্রাণে মরে জীব।
এ সাগরে যদি ডোবে জীব হয় শিব॥
সে সাগর ধরিয়াছে নাম রত্নাকর।
এ সাগর ভোগ মোক্ষ ধনের আকর॥
ঈশ্বরের এই সৃষ্টি নাম যার ভূত।
কবি যাহা সৃষ্টি করে সে ভূত অদ্ভুত॥
জগতের এক ভাব দেখ চরাচরে।
অভাবে স্বভাবে কবি কত ভাব ধরে॥
কতকেলে এই সৃষ্টি—অতি পুরাতন।
কবি সব সৃষ্টি করে নূতন নূতন॥
সেই সৃষ্টি, অনাসৃষ্টি, সৃষ্টিছাড়া ভাই।
কবি তাহা সৃষ্টি করে—সৃষ্টিতে যা নাই॥

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

পৌষ-পার্ব্বণ

(সুখের শিশির-কাল সুখে পূর্ণ ধরা
এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা ॥)
ধনুর তনুর শেষ মকরের যোগ।
সন্ধিক্ষণে তিন দিন মহা সুখভোগ ॥
মকর-সংক্রান্তি-স্নানে জন্মে মহাফল।
মকর, মিতিন, সই, চল্ চল্ চল্ ॥
সারানিশি জাগিয়াছি দেখ সব বাসি।
গঙ্গাজলে, গঙ্গাজল, অঙ্গ ধুয়ে আসি ॥
অতি ভোরে ফুল লয়ে গিয়াছেন মাসী।
একা আমি আসিয়াছি সঙ্গে লয়ে দাসী ॥
এসেছি বাপের কাছে ছেলে-মেয়ে ফেলে।
রাঁধা-বাড়া হবে সব আমি নেয়ে এলে ॥
ঘোর জাঁক বাজে শাঁক যত সব রামা।
কুটিছে তণ্ডুল সুখে করি ধামা-ধামা ॥
বাউনি আউনি ঝাড়া পোড়া আখ্যা আর।
মেয়েদের নব শাস্ত্র অশেষ প্রকার ॥
খোলায় পিটুলি দেন হয়ে অতি শুচি।
ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দ হয় ঢাকা দেন মুচি ॥
উনুনে ছাউনি করি বাউনি বাঁধিয়া।
চাউনি কর্ত্তার পানে কাঁদুনি কাঁদিয়া ॥

চেয়ে দেখ সংসারেতে কতগুলি ছেলে।
বল দেখি কি হইবে নয় রেক্ চেলে॥
ক্ষুদ কুঁড়া গুঁড়া করি কুটিলাম ঢেঁকি।
কেমনে চালাই সব তুমি হলে ঢেঁকি॥
আড় করি পাড় দিতে সিকি গেল গড়ে।
লেখা করি নাহি হয় আদ পোয়া গড়ে॥
ছাঁই করি রাখিলাম অর্দ্ধভাগ কেটে।
হাতে হাতে গেল তিল তিল তিল বেটে॥
ঝোলা গুড় তোলা ছিল সিকের উপরে।
তোলা তোলা খেতে দিয়ে ফুরাইল ঘরে॥
পোয়া কাঁচ্চা কি করিবে নহে এক মণ।
বাড়ীর লোকের তাহে নহে একমন॥
একমনে খায় যদি আধ মণে সারি।
একমনে না খাইলে দশ মণে হারি॥
ভাঙ্গা মণে পূরো মণ মন যদি খোলে।
পূরো মণে কি হইবে ভাঙ্গা মন হলে॥
তুমি ভাব ঘরে আছে কত মণ তোলা।
জান না কি ঘরে আছে কত মণ তোলা॥
কারে বা কহিব আর বোঝা হল দায়।
খুলে দিলে মন কি হে তুলে রাখা যায়॥
বিষম দুরন্ত ওটা মেজ বৌর বেটা।
কোন মতে শুনে নাকো ছোঁড়া বড় ঠেঁটা॥
না দিলে ধমক দেয় দুই চক্ষু রেঙ্গে।
ঘটি বাটি হাঁড়ি কুঁড়ি সব ফেলে ভেঙ্গে॥

পুলি সব উঠে গেল কিছু নাই ছাই।
নারিকেল তেল গুড় ফের সব চাই॥
অদৃষ্টের দোষ সব মিছে দিই গালি।
চর্ব্বণে উঠিয়া গেল পার্ব্বণের চালি॥
আমি লই মোটা চাল সরু চেলে চেলে।
বুঝিতে না পারি তুমি চল কোন্ চেলে॥
ও বাড়ীর মেয়েদের বলিয়াছি খেতে।
নূতন জামাই আজ আসিবেন রেতে॥
তোমার কি ঘর পানে কিছু নাহি টান।
হাবাতের হাতে যায় অভাগীর প্রাণ॥
মেয়েদের নাহি আর তিন রাত্রি ঘুম।
গড়াগড়ি ছড়াছড়ি রন্ধনের ধূম॥
সাবকাশ নাই মাত্র এলোচুল বাঁধে।
ডাল ঝোল মাছ ভাত রাশি রাশি রাঁধে॥
কত তার কাঁচা থাকে কত যায় পুড়ে।
সাধে রাঁধে পরমান্ন নলেনের গুড়ে॥

এইরূপ ধূমধাম প্রতি ঘরে ঘরে।
নানা মত অনুষ্ঠান আহারের তরে॥
ভাজা ভাজা ভাজা-পুলি ভেজে ভেজে তোলে।
সারি সারি হাঁড়ি হাঁড়ি কাঁড়ি করে কোলে॥
আলু তিল গুড় ক্ষীর নারিকেল আর।
গড়িতেছে পিঠেপুলি অশেষ প্রকার॥

বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ কুটুম্বের মেলা।
হায় হায় দেশাচার ধন্য তোর খেলা॥
পায়েসে পিটুলি দিয়া করিয়াছে চুসি।
গৃহিণীর অনুরোধে শুধু তাই চুষি॥
ধন্য ধন্য পল্লীগ্রাম ধন্য সব লোক।
কাহনের হিসাবেতে আহারের ঝোঁক॥
প্রবাসী পুরুষ যত পোষড়ার রবে।
ছুটি নিয়া ছুটাছুটি বাড়ী আসে সবে॥
সহরের কেনা দ্রব্যে বেড়ে যায় জাঁক।
বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ মেয়েদের ডাক
কর্ত্তাদের গালগল্প গুড়ুক টানিয়া।
কাঁটালের গুঁড়ি প্রায় ভুঁড়ি এলাইয়া॥
দুই পার্শ্বে পরিজন মধ্যে বুড়া ব'সে।
চিটে গুড় ছিটে দিয়ে পিঠে খান ক'সে॥
তরুণী রমণী যত একত্র হইয়া।
তামাসা করিছে সুখে জামাই লইয়া॥
আহারের দ্রব্য ল'য়ে কৌশল কৌতুক।
মাঝে মাঝে হাস্য-রবে সুখের যৌতুক॥

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

বঙ্গভাষা

হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,—
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি',
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি'।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি'
অনিদ্রায়, অনাহারে সঁপি' কায়, মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি',—
কেলিনু শৈবালে, ভুলি' কমল-কানন।
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী ক'য়ে দিলা পরে,—
"ওরে বাছা, মাতৃ-কোষে রতনের রাজি;
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে, ফিরি ঘরে"

পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষারূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে।

মধুসূদন দত্ত

রাবণ ও চিত্রাঙ্গদা

হেন কালে চারি দিকে সহসা ভাসিল
রোদন-নিনাদ মৃদু ; তা সহ মিশিয়া
ভাসিল নূপুরধ্বনি, কিঙ্কিণীর বোল
ঘোর রোলে। হেমাঙ্গী সঙ্গিনীদল-সাথে,
প্রবেশিলা সভাতলে চিত্রাঙ্গদা দেবী!
আলু-থালু হায় এবে কবরী-বন্ধন!
আভরণহীন দেহ, হিমানীতে যথা
কুসুমরতন-হীন বন-সুশোভিনী
লতা। অশ্রুময় আঁখি, নিশার শিশির-
পূর্ণ পদ্ম-পর্ণ যেন! বীরবাহু-শোকে
বিবশা রাজমহিষী বিহঙ্গিনী যথা,
যবে গ্রাসে কাল-ফণী কুলায়ে পশিয়া
শাবকে! শোকের ঝড় বহিল সভাতে!
সুরসুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল ; মুক্ত-কেশ মেঘমালা ; ঘন
নিঃশ্বাস প্রলয়-বায়ু ; অশ্রুবারি ধারা
আসার ; জীমূতমন্দ্র হাহাকার রব।
চমকিলা লঙ্কাপতি কনক-আসনে।
ফেলিল চামর দূরে তিতি' নেত্রনীরে
কিঙ্করী, কাঁদিল ফেলি' ছত্র ছত্রধর ;
ক্ষোভে, রোষে দৌবারিক নিষ্কোষিলা অসি।

কতক্ষণে মৃদুস্বরে কহিলা মহিষী
চিত্রাঙ্গদা, চাহি' সতী রাবণের পানে,—
"একটি রতন মোরে দিয়াছিল বিধি
কৃপাময়, দীন আমি থুয়েছিনু তারে
রক্ষা-হেতু, তব কাছে, রক্ষঃকুলমণি,
তরুর কোটরে রাখে শাবকে যেমতি
পাখী। কহ কোথা তুমি রেখেছ তাহারে,
লঙ্কানাথ? কোথা মম অমূল্য রতন?
দরিদ্র-ধন-রক্ষণ রাজধর্ম্ম, তুমি
রাজকুলেশ্বর; কহ, কেমনে রেখেছ,
কাঙ্গালিনী আমি, রাজা, আমার সে ধনে?"
উত্তর করিলা তবে দশানন বলী,—
"এ বৃথা গঞ্জনা, প্রিয়ে, কেন দেহ মোরে?
গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে, সুন্দরি?
হায়, বিধি-বশে, দেবি, সহি এ যাতনা
আমি! বীরপুত্র-ধাত্রী এ কনক-পুরী,
দেখ, বীরশূন্য এবে; নিদাঘে যেমতি
ফুলশূন্য বনস্থলী, জলশূন্য নদী!
বরজে সজারু পশি' বারুইর যথা
ছিন্ন-ভিন্ন করে তারে, দশরথাত্মজ
মজাইছে লঙ্কা মোর! আপনি জলধি
পরেন শৃঙ্খল পায়ে তার অনুরোধে!
এক পুত্র-শোকে তুমি আকুলা, ললনে,
শতপুত্র শোকে বুক আমার ফাটিছে

দিবানিশি! হায়, দেবি, যথা বনে বায়ু
প্রবল, শিমুল-শিম্বী ফুটাইলে বলে,
উড়ি যায় তুলারাশি, এ বিপুল-কুল-
শেখর রাক্ষস যত পড়িছে তেমতি
এ কাল-সমরে। বিধি প্রসারিছে বাহু
বিনাশিতে লঙ্কা মম, কহিনু তোমারে।"

নীরবিলা রক্ষোনাথ; শোকে অধোমুখে
বিধুমুখী চিত্রাঙ্গদা, গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী,
কাঁদিলা,—বিহ্বলা, আহা, স্মরি পুত্রবরে।
কহিতে লাগিলা পুনঃ দাশরথি-অরি,—
"এ বিলাপ কভু, দেবি, সাজে কি তোমারে?
দেশ-বৈরী নাশি' রণে পুত্রবর তব
গেছে চলি স্বর্গ-পুরে; বীর-মাতা তুমি;
বীর-কর্ম্মে হত পুত্রহেতু কি উচিত
ক্রন্দন? এ বংশ মম উজ্জ্বল হে আজি
তব পুত্র-পরাক্রমে, তবে কেন তুমি
কাঁদ, ইন্দুনিভাননে, তিত অশ্রুনীরে?"
উত্তর করিলা তবে চারুনেত্রা দেবী
চিত্রাঙ্গদা,—"দেশবৈরী নাশে যে সমরে,
শুভক্ষণে জন্ম তার; ধন্য ব'লে মানি
হেন বীরপ্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবতী।
কিন্তু ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লঙ্কা তব;
কোথা সে অযোধ্যাপুরী? কিসের কারণে,
কোন্ লোভে, কহ, রাজা, এসেছে এ দেশে

রাঘব ? এ স্বর্ণ-লঙ্কা দেবেন্দ্র-বাঞ্ছিত,
অতুল ভব-মণ্ডলে ; ইহার চৌদিকে
রজত-প্রাচীর-সম শোভেন জলধি।
শুনেছি সরযূ-তীরে বসতি তাহার—
ক্ষুদ্র নর। তব হৈম সিংহাসন-আশে
যুঝিছে কি দাশরথি ? বামন হইয়া
কে চাহে ধরিতে চাঁদে ? তবে দেশরিপু
কেন তারে বল, বলী ? কাকোদর সদা
নম্রশিরঃ ; কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি
কেহ, ঊর্দ্ধফণা ফণী দংশে প্রহারকে।
কে কহ, এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে ? হায়, নাথ, নিজ কর্ম্মফলে
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি।"
এতেক কহিয়া বীরবাহুর জননী,
চিত্রাঙ্গদা কাঁদি', সঙ্গে সঙ্গিদল ল'য়ে
প্রবেশিলা অন্তঃপুরে। শোকে অভিমানে
ত্যজি' সু-কনকাসন উঠিলা গর্জ্জিয়া
রাঘবারি।—"এতদিনে," কহিলা ভূপতি,
"বীরশূন্য লঙ্কা মম ! এ কাল-সমরে
আর পাঠাইব কারে ? কে আর রাখিবে
রাক্ষসকুলের মান ? যাইব আপনি।
সাজ হে বীরেন্দ্রবৃন্দ লঙ্কার ভূষণ !
দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুলমণি।
অ-রাম বা অ-রাবণ হবে ভব আজি !"

মধুসূদন দত্ত

প্রমীলার চিতারোহণ

বাহিরিল মৃদুগতি রথবৃন্দ-মাঝে
রথবর ঘনবর্ণ, বিজলীর ছটা
চক্রে ; ইন্দ্রচাপরূপী ধ্বজ চূড়াদেশে ;—
কিন্তু কান্তিশূন্য আজি, শূন্যকান্তি যথা
প্রতিমাপঞ্জর, মরি, প্রতিমাবিহনে
বিসর্জ্জন-অন্তে।   কাঁদে ঘোর কোলাহলে
রক্ষোরথী, ক্ষণ বক্ষঃ হানি' মহাক্ষেপে
হতজ্ঞান !   রথমধ্যে শোভে ভীমধনুঃ,
তূণীর, ফলক, খড়্গ, শঙ্খ, চক্র, গদা-
আদি অস্ত্র ; সু-কবচ ; সৌরকর-রাশি-
সদৃশ কিরীট ; আর বীর-ভূষা যত।
সকরুণ গীতে গীতী গাইছে কাঁদিয়া
রক্ষোদুঃখ !   স্বর্ণমুদ্রা ছড়াইছে কেহ,
ছড়ায় কুসুম যথা নড়ি' ঘোর ঝড়ে
তরু !   সুবাসিত জল ঢালে জলবহ,
দমি' উচ্চগামী রেণু, বিরত সহিতে
পদভর।   চলে রথ সিন্ধুতীরমুখে।

সুবর্ণ-শিবিকাসনে, আবৃত কুসুমে,
বসেন শবের পাশে প্রমীলা সুন্দরী,—
মর্ত্ত্যে রতি মৃত-কাম-সহ সহগামী !
ললাটে সিন্দুরবিন্দু, গলে ফুলমালা ;

কঙ্কণ মৃণালভুজে ; বিবিধ ভূষণে
ভূষিতা রাক্ষসবধূ। ঢুলাইছে কাঁদি'
চামরিণী সু-চামর ; কাঁদি' ছড়াইছে
ফুলরাশি বামাবৃন্দ। আকুল বিষাদে,
রক্ষঃকুল-নারীকুল কাঁদে হাহা রবে।
হায় রে, কোথা সে জ্যোতিঃ ভাতিত যে সদা
মুখচন্দ্রে ? কোথা, মরি, সে সুচারু হাসি,
মধুর অধরে নিত্য শোভিত যে, যথা
দিনকরকররাশি তোর বিম্বাধরে,
পঙ্কজিনি ? মৌনব্রতে ব্রতী বিধুমুখী—
পতির উদ্দেশে প্রাণ ও-বরাঙ্গ ছাড়ি
গেছে যেন যথা পতি বিরাজেন এবে !
শুকাইলে তরুরাজ, শুকায় বে লতা,
স্বয়ংবরা বধূ ধনী। কাতারে কাতারে,
চলে রক্ষোরথী-সাথে, কোষশূন্য অসি
করে, রবিকর তাহে ঝলে ঝলঝলে,
কাঞ্চন-কঞ্চুকবিভা নয়ন ঝলসে !
উচ্চে উচ্চারয়ে বেদ বেদজ্ঞ চৌদিকে ;
বহে হবির্ব্বহ হোত্রী মহামন্ত্র জপি' ;
বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র, চন্দন, কস্তুরী,
কেশর, কুঙ্কুম, পুষ্প বহে রক্ষোবধূ
স্বর্ণপাত্রে, স্বর্ণকুম্ভে পূত অম্ভোরাশি
গাঙ্গেয়। সুবর্ণ-দীপ দীপে চারি দিকে।
বাজে ঢাক, বাজে ঢোল, কাড়া কড়কড়ে ;.

বাজে করতাল, বাজে মৃদঙ্গ, তুম্বকী ;
বাজিছে ঝাঁঝরী, শঙ্খ ; দেয় হুলাহুলি
সধবা রাক্ষসনারী আর্দ্র নেত্রনীরে—
হায় রে, মঙ্গলধ্বনি অমঙ্গল দিনে !
   বাহিরিলা পদব্রজে রক্ষঃকুলরাজ
রাবণ ,—বিশদ বস্ত্র, বিশদ উত্তরী,
ধুতুরার মালা যেন ধূর্জ্জটির গলে ;
চারি দিকে মন্ত্রিদল দূরে নতভাবে ।
নীরব কর্ব্বুরপতি অশ্রুপূর্ণ আঁখি,
নীরব সচিববৃন্দ, অধিকারী যত
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ । বাহিরিল কাঁদিয়া পশ্চাতে
রক্ষঃপুরবাসী রক্ষঃ—আবাল-বনিতা-
বৃদ্ধ ; শূন্য করি' পুরী, আঁধার রে এবে
গোকুলভবন যথা শ্যামের বিহনে !
ধীরে ধীরে সিন্ধুমুখে, তিতি' অশ্রুনীরে,
চলে সবে, পূরি' দেশ বিষাদ-নিনাদে !
   উতরি' সাগরতীরে, রচিলা সত্বরে
যথাবিধি চিতা রক্ষঃ ; বহিল বাহকে
সুগন্ধি চন্দনকাষ্ঠ, ঘৃত ভারে ভারে ।
মন্দাকিনী পূতজলে ধুইয়া যতনে
শবে, সু-কৌষিক বস্ত্র পরাই', থুইল
দাহস্থানে রক্ষোদল ; পড়িলা গম্ভীরে
মন্ত্র রক্ষঃপুরোহিত । অবগাহি' দেহ
মহাতীর্থে, সাধ্বী সতী প্রমীলা সুন্দরী

খুলি' রত্ন-আভরণ, বিতরিলা সবে ;
প্রণমিয়া গুরুজনে মধুরভাষিণী,
সম্ভাষি' মধুরভাষে দৈত্যবালাদলে,
কহিলা,—"লো সহচরি, এত দিনে আজি
ফুরাইল জীব-লীলা জীবলীলা-স্থলে
আমার ! ফিরিয়া সবে যাও দৈত্যদেশে ।
কহিও পিতার পদে এ সব বারতা,
বাসন্তি ! মায়েরে মোর—" হায় রে, বহিল
সহসা নয়নজল ! নীরবিলা সতী ;—
কাঁদিল দানববালা হাহাকার রবে !
মুহূর্ত্তে সংবরি' শোক কহিলা সুন্দরী,—
"কহিও মায়েরে মোর, এ দাসীর ভালে
লিখিলা বিধাতা যাহা, তাই লো ঘটিল
এত দিনে ! যাঁহার হাতে সঁপিলা দাসীরে
পিতা মাতা, চলিনু লো আজি তাঁর সাথে :
পতি বিনা অবলার কি গতি জগতে ?
আর কি কহিব, সখি ! ভুল না লো তারে—
প্রমীলার এই ভিক্ষা তোমা সবা-কাছে ।"

চিতায় আরোহি' সতী (ফুলাসনে যেন !)
বসিলা আনন্দমতি পতি-পদতলে ;
প্রফুল্ল কুসুমদাম কবরী-প্রদেশে ।
বাজিল রাক্ষসবাদ্য ; উচ্চে উচ্চারিল
বেদ বেদী ; রক্ষোনারী দিল হুলাহুলি ;
সে রবের সহ মিশি' উঠিল আকাশে

হাহারব ! পুষ্পবৃষ্টি হইল চৌদিকে ।
বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র, চন্দন, কস্তুরী,
কেশর, কুঙ্কুম-আদি দিল রক্ষোবালা
যথাবিধি ; পশুকুলে নাশি' তীক্ষ্ণশরে
ঘৃতাক্ত করিয়া রক্ষঃ যতনে থুইল
চারি দিকে, যথা মহানবমীর দিনে,
শাক্ত ভক্ত-গৃহে, শক্তি, তব পীঠতলে !
অগ্রসরি' রক্ষোরাজ কহিলা কাতরে,—
"ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে,—
সঁপি' রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব
মহাযাত্রা ! কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা ?—ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে !
ছিল আশা, রক্ষঃকুলরাজসিংহাসনে
জুড়াইব আঁখি, বৎস, দেখিয়া তোমারে,
বামে রক্ষঃকুললক্ষ্মী রক্ষোরাণীরূপে
পুত্রবধূ ! বৃথা আশা ! পূর্ব্বজন্ম-ফলে
হেরি তোমা-দোঁহে আজি এ কাল-আসনে !
কর্ব্বুর-গৌরব-রবি চির-রাহু-গ্রাসে !
সেবিনু শিবেরে আমি বহু যত্ন করি',
লভিতে কি এই ফল ? কেমনে ফিরিব,—
হায় রে, কে কবে মোরে, ফিরিব কেমনে
শূন্য লঙ্কাধামে আর ? কি সান্ত্বনাছলে
সান্ত্বনিব মায়ে তব, কে কবে আমারে ?

'কোথা পুত্র-পুত্রবধূ আমার ?' সুধিবে
যবে রাণী মন্দোদরী,—'কি সুখে আইলে
রাখি দোঁহে সিন্ধুতীরে, রক্ষঃকুলপতি ?'—
কি ক'য়ে বুঝাব তারে ? হায় রে, কি ক'য়ে ?
হা পুত্র ! হা বীরশ্রেষ্ঠ ! চিরজয়ী রণে !
হা মাতঃ রাক্ষসলক্ষ্মীঃ ! কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে ?"
অধীর হইলা শূলী কৈলাস-আলয়ে !
আদেশিলা অগ্নিদেবে বিষাদে ত্রিশূলী,—
"পবিত্রি', হে সর্ব্বশুচি, তোমার পরশে
আন শীঘ্র এ সু-ধামে রাক্ষস-দম্পতী।"
ইরম্মদরূপে অগ্নি ধাইলা ভূতলে !
সহসা জ্বলিল চিতা। সচকিতে সবে
দেখিলা আগ্নেয় রথ ; সুবর্ণ-আসনে
সে রথে আসীন বীর বাসববিজয়ী
দিব্যমূর্ত্তি ! বামভাগে প্রমীলা রূপসী,
অনন্ত যৌবনকান্তি শোভে তনুদেশে,
চিরসুখহাসিরাশি মধুর অধরে !
উঠিল গগন-পথে রথবর বেগে ;
বরষিলা পুষ্পাসার দেবকুল মিলি' ;
পূরিল বিপুল বিশ্ব আনন্দ-নিনাদে !
দুগ্ধধারে নিবাইল উজ্জ্বল পাবকে
রাক্ষস। পরম যত্নে কুড়াইলা সবে
ভস্ম, অম্বুরাশিতলে বিসর্জ্জিলা তাহে।

ধৌত করি' দাহস্থল জাহ্নবীর জলে
লক্ষ রক্ষঃশিল্পী আশু নির্ম্মিল মিলিয়া
স্বর্ণ-পাটিকেলে মঠ চিতার উপরে ;—
ভেদি' অভ্র, মঠচূড়া উঠিল আকাশে।
করি' স্নান সিন্ধুনীরে, রক্ষোদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পানে, আর্দ্র নেত্রনীরে—
বিসর্জ্জি' প্রতিমা যেন দশমী-দিবসে!
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে!

মধুসূদন দত্ত

নীলধ্বজের প্রতি জনা

বাজিছে রাজ-তোরণে রণবাদ্য আজি ;
হ্রেষে অশ্ব ; গর্জ্জে গজ ; উড়িছে আকাশে
রাজকেতু, মুহুর্মুহুঃ হুঙ্কারিছে মাতি'
রণমদে রাজসৈন্য,—কিন্তু কোন্ হেতু ?
সাজিছ, কি নররাজ ! যুঝিতে সদলে
প্রবীর পুত্রের মৃত্যু প্রতিবিধিৎসিতে,—
নিবাইতে এ শোকাগ্নি ফাল্গুনীর লোহে ?
এই ত সাজে তোমারে, ক্ষত্রমণি তুমি,
মহাবাহু ! যাও বেগে, গজরাজ যথা
যমদণ্ডসম শুণ্ড আস্ফালি' নিনাদে,
টুট কিরীটীর গর্ব্ব আজি রণস্থলে,
খণ্ড মুণ্ড তার আন শূল-দণ্ড-শিরে ।
অন্যায় সমরে মূঢ় নাশিল বালকে ;
নাশ, মহেষ্বাস ! তারে ;—ভুলিব এ জ্বালা,—
এ বিষম জ্বালা, দেব ! ভুলিব সত্বরে ।
জন্মে মৃত্যু,—বিধাতার এ বিধি জগতে ।
ক্ষত্রকুল-রত্ন পুত্র প্রবীর সুমতি
সম্মুখ-সমরে পড়ি' গেছে স্বর্গধামে,—
কি কাজ বিলাপে প্রভু ? পাল, মহীপাল,
ক্ষত্রধর্ম্ম—ক্ষত্রধর্ম্ম সাধ ভুজবলে ।

হায়, পাগলিনী জনা! তব সভামাঝে
নাচিছে নর্ত্তকী আজি, গায়ক গাইছে,
উথলিছে বীণাধ্বনি! তব সিংহাসনে
ব'সেছে পুত্রহা-রিপু—মিত্রোত্তম এবে!
সেবিছ যতনে তুমি অতিথি-রতনে!—
কি লজ্জা! দুঃখের কথা, হায়, কব কারে?
হতজ্ঞান আজি কি হে পুত্রের বিহনে,
মাহেশ্বরী-পুরীশ্বর নীলধ্বজ রথী?
যে দারুণ বিধি, রাজা! আঁধারিলা আজি
রাজ্য, হরি' পুত্রধনে, হরিলা কি তিনি
জ্ঞান তব? তা না হ'লে, কহ মোরে, কেন
এ পাষণ্ড পাণ্ডুরথী পার্থ তব পুরে
অতিথি? কেমনে তুমি, হায়, মিত্রভাবে
পরশ সে কর, যাহা প্রবীরের লোহে
লোহিত? ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম এই কি নৃমণি?
কোথা ধনুঃ, কোথা তূণ, কোথা চর্ম্ম, অসি?
না ভেদি' রিপুর বক্ষঃ তীক্ষ্ণতম শরে
রণক্ষেত্রে, মিষ্টালাপে তুষিছ কি তুমি
কর্ণ তার সভাতলে? কি কহিবে, কহ,—
যবে দেশ-দেশান্তরে জনরব লবে
এ কাহিনী;—কি কহিবে ক্ষত্রপতি যত?
নরনারায়ণ-জ্ঞানে শুনিনু পূজিছ
পার্থে, রাজা! ভক্তিভাবে; একি ভ্রান্তি তব?
জানি আমি কহে লোক রথিকুল-পতি

পার্থ। মিথ্যা কথা, নাথ! বিবেচনা কর;
সূক্ষ্ম বিবেচক তুমি বিখ্যাত জগতে।
ছদ্মবেশে লক্ষ রাজে ছলিল দুর্ম্মতি
স্বয়ংবরে। যথাসাধ্য কে যুঝিল, কহ,
ব্রাহ্মণ ভাবিয়া তারে, কোন্ ক্ষত্ররথী,
সে সংগ্রামে? রাজদলে তেঁই সে জিনিল।
দহিল খাণ্ডব দুষ্ট কৃষ্ণের সহায়ে।
শিখণ্ডীর সহকারে কুরুক্ষেত্র-রণে
পৌরব-গৌরব ভীষ্ম বৃদ্ধ পিতামহে
সংহারিল মহাপাপী। দ্রোণাচার্য্য গুরু—
কি কু-ছলে নরাধম বধিল তাঁহারে,
দেখ স্মরি'? বসুন্ধরা গ্রাসিলা সরোষে
রথচক্র যবে, হায়, যবে ব্রহ্মশাপে
বিকল সমরে, মরি, কর্ণ মহাযশাঃ,
নাশিল বর্ব্বর তাঁরে। কহ মোরে, শুনি,
মহারথি-প্রথা কি হে এই, মহারথী?
আনায়-মাঝারে আনি মৃগেন্দ্রে কৌশলে
বধে ভীরুচিত ব্যাধ; সে মৃগেন্দ্র যবে
নাশে রিপু, আক্রমে সে নিজ পরাক্রমে।
কি না তুমি জান, রাজা? কি কব তোমারে?
জানিয়া-শুনিয়া তবে কি ছলনে ভুল
আত্মশ্লাঘা, মহারথী? হায় রে, কি পাপে,
রাজ-শিরোমণি রাজা নীলধ্বজ আজি
নতশিরঃ, হে বিধাতঃ! পার্থের সমীপে?

কোথা বীরদর্প তব? মানদর্প কোথা?
চণ্ডালের পদধূলি ব্রাহ্মণের ভালে?—
কুরঙ্গীর অশ্রুবারি নিবায় কি কভু
দাবানলে? কোকিলের কাকলী-লহরী
উচ্চনাদী প্রভঞ্জনে নীরবয়ে কবে?
ভীরুতার সাধনা কি মানে বলবাহু?
কিন্তু বৃথা এ গঞ্জনা; গুরুজন তুমি,—
পড়িব বিষম পাপে গঞ্জিলে' তোমারে।
কুলনারী আমি, নাথ! বিধির বিধানে
পরাধীনা। নাহি শক্তি মিটাই স্ববলে
এ পোড়া মনের বাঞ্ছা। দুরন্ত ফাল্গুনী
(এ কৌন্তেয় যোধে ধাতা সৃজিলা নাশিতে
বিশ্বসুখ!) নিঃসন্তানা করিল আমারে।
তুমি পতি, ভাগ্যদোষে বাম মম প্রতি
তুমি। কোন্ সাধে প্রাণ ধরি ধরাধামে?
হায় রে, এ জনাকীর্ণ ভবস্থল আজি
বিজন জনার পক্ষে। এ পোড়া ললাটে
লিখিলা বিধাতা যাহা, ফলিল তা কালে!
হা প্রবীর! এই হেতু ধরিনু কি তোরে
দশ মাস দশ দিন নানা কষ্ট স'য়ে
এ উদরে? কোন্ জন্মে, কোন্ পাপে পাপী
তোর কাছে অভাগিনী, তাই দিলি বাছা,
এ তাপ? আশার লতা তাই রে ছিঁড়িলি?
হা পুত্র! শোধিলি কি রে তুই এইরূপে

মাতৃ-ধার? এই কিরে ছিল তোর মনে?—
কেন বৃথা, পোড়া আঁখি বরষিস্ আজি
বারিধারা? রে অবোধ! কে মুছিবে তোরে?
কেন বা জ্বলিস্ মনঃ? কে জুড়াবে আজি
বাক্য-সুধারসে তোরে? পাণ্ডবের শরে
খণ্ড শিরোমণি তোর; বিবরে লুকায়ে,
কাঁদি' খেদে মর্, অরে মণিহারা ফণী!
যাও চলি, মহাবল! যাও কুরুপুরে
নবমিত্র পার্থসহ। মহাযাত্রা করি'
চলিল অভাগী জনা পুত্রের উদ্দেশে!
ক্ষত্রকুলবালা আমি, ক্ষত্রকুলবধূ,
কেমনে এ অপমান সব ধৈর্য্য ধরি'?
ছাড়িব এ পোড়া প্রাণ জাহ্নবীর জলে;
দেখিব বিস্মৃতি যদি কৃতান্ত-নগরে
লভি অন্তে। যাচি চিরবিদায় ও-পদে।
ফিরি' যবে রাজপুরে প্রবেশিবে আসি,
নরেশ্বর! "কোথা জনা?" বলি' ডাক যদি,
উত্তরিবে প্রতিধ্বনি "কোথা জনা?" বলি।

মধুসূদন দত্ত

মোগল রাজলক্ষ্মী

চপল চরণে গঙ্গা চলিতে চলিতে,
পলাশীর মাঠে এলো দেখিতে দেখিতে।
প্রকাণ্ড প্রান্তর এই সংগ্রামের স্থল,
হেরিলে হৃদয়ে হয় আতঙ্ক প্রবল।
এ মাঠের প্রান্তভাগে পাদপের মূলে
কাঁদিতেছে কন্যা এক কল্লোলিনীকূলে ;
আভাহীনা, আভাময়ী তবু জানা যায়,
চিক্কণ নীরদে ঢাকা যেন রবি-কায় ;
আ-নিতম্ব-বিলম্বিত ছিল এক বেণী,
সঙ্কলিত ছিল তায় মণি-মুক্তা-শ্রেণী ;
এবে বিষাদিনী, বেণী খুলেছে খানিক,
ছিন্ন-ভিন্ন মুক্তা-পুঞ্জ পড়েছে মাণিক।
হীরক-নিন্দিয়ে জলে নয়ন উজ্জ্বল,
শোভে তায় অপরূপ নিবিড় কজ্জল,
পড়িতেছে গলে' তাহা অশ্রুবারি-সনে,
বিলাপ হরণ করে সুখের ভূষণে ;
ওড়নার এক ভাগ আছে বাম কাঁধে,
লুণ্ঠিত অপর ভাগ ধরায় বিষাদে ;

ছড়াইয়া আছে বালা চরণ-যুগল
বিবর্ণ পায়ের বর্ণে স্ববর্ণের মল ;
দুই হস্ত স্থিত দুই জানুর উপর,
দশাঙ্গুলে দশাঙ্গুরী-দীপ্তি মনোহর ;
ভাবনায় ভাসমানা, ভীতা সঙ্কুচিতা,
অশোক-বিপিনে যেন জনক-দুহিতা।
সম্ভাষিয়ে সুরধুনী রমণী-রতনে
জিজ্ঞাসিল স্নেহ-ভরে মধুর বচনে,—
"কে বাছা সুন্দরি! তুমি হেথা একাকিনী,-
কেন হেন পরিতাপ, কিসে বিষাদিনী ?"
গঙ্গারে নিরখি' বালা, সহ সমাদর
মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে করিল উত্তর,—
"নিশ্চয় সিদ্ধান্ত, মাতা, জানিলাম মনে,
চিরস্থায়ী কিছু নহে নশ্বর ভুবনে।
সসাগর ধরাধামে রাজত্ব করিয়ে,
অবশেষে মরে ভূপ দ্বীপান্তরে গিয়ে।
বীরদম্ভ, ভীমনাদ, বিজয়, গৌরব,
সময়-সাগরে জলবিম্ব অনুভব।
কোথা গেল আধিপত্য শাসন ভীষণ,
কোথা গেল মণিময় শিখি-সিংহাসন ?
আমি, মাতা, কাঙ্গালিনী অতি অভাগিনী,
পাগলিনী যেন মণি-বিহীনা ফণিনী ;
পরিচয় দিতে মম বিদরে হৃদয়,
শিহরি' লজ্জায়, শোক নবীভূত হয়—

'মোগলের রাজলক্ষ্মী' পরিচয় সার,
এই মাঠে হারায়েছি মুকুট আমার !"

বাণী শেষ করি' বালা হ'ল অন্তর্দ্ধান,
মিশাইল সমীরণে হয় অনুমান।

দীনবন্ধু মিত্র

হিমালয়

(১)

অসীম নীরদ নয়,
ও-ই গিরি হিমালয় !
উথুলে উঠেছে যেন অনন্ত জলধি ;
ব্যেপে দিগ্‌দিগন্তর,
তরঙ্গিয়া ঘোরতর,
প্লাবিয়া গগনাঙ্গন জাগে নিরবধি ।

(২)

বিশ্ব যেন ফেলে পাছে
কি এক দাঁড়ায়ে আছে !
কি এক প্রকাণ্ড কাণ্ড মহান্‌ ব্যাপার !
কি এক মহান্‌ মূর্ত্তি,
কি এক মহান্‌ স্ফূর্ত্তি,
মহান্‌ উদার সৃষ্টি প্রকৃতি তোমার !

(৩)

পদে পৃথ্বী, শিরে ব্যোম,
তুচ্ছ তারা সূর্য্য সোম,
নক্ষত্র, নখাগ্রে যেন গণিবারে পারে !

সম্মুখে সাগরাম্বরা
ছড়িয়ে রয়েছে ধরা,
কটাক্ষে কখন যেন দেখিছে তাহারে!

(৪)

ঝটিকা দুরন্ত মেয়ে
বুকে খেলা করে ধেয়ে,
ধরিত্রী গ্রাসিয়া সিন্ধু লোটে পদতলে!
জ্বলন্ত অনল ছবি
ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বলে রবি,
কিরণ জ্বলন জ্বালা মালা শোভে গলে।

(৫)

ও-ই কিবা ধবধব
তুঙ্গ তুঙ্গ শৃঙ্গ সব
ঊর্দ্ধমুখে ধেয়ে গেছে ফুঁড়িয়া অম্বর।
দাঁড়াইয়া পাদ-দেশে
ললিত হরিত বেশে
নধর নিকুঞ্জরাজি সাজে থরে থর!

(৬)

ও-ই গণ্ডশৈল-শিরে
গুল্মরাজি চিরে চিরে
বিকাশে গৈরিক ঘটা ছটা রক্তময়!

তৃণ তরু লতা-জাল,
অপরূপ লালে লাল ;
মেঘের আড়ালে যেন অরুণ উদয়!

(৭)

কিবা ও-ই মনোহারী
দেবদারু সারি সারি,
দেদার চলিয়া গেছে কাতারে কাতার।
দূর দূর আলবালে,
কোলাকুলি ডালে ডালে,
পাতায় মন্দির গাঁথা মাথায় সবার !

(৮)

তলে তৃণ লতা পাতা
সবুজ বিছানা পাতা,
ছোট ছোট কুঞ্জবন হেথায় হোথায়।
কেমন পেখম ধরি,
কেকারব করি করি,
ময়ূর ময়ূরী সব নাচিয়া বেড়ায়।

(৯)

ফেনিল সলিল-রাশি,
বেগভরে পড়ে আসি,
চন্দ্রলোক ভেঙ্গে যেন পড়ে পৃথিবীতে !

সুধাংশু-প্রবাহ-পারা
শত-শত ধায় ধারা,
ঠিকরে অসংখ্য তারা ছোটে চারিভিতে!

(১০)

শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঠেকে ঠেকে,
লম্ফে লম্ফে ঝোঁকে ঝোঁকে,
জেলের জালের মত হয়ে ছত্রাকার,
ঘুরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে,
ফেনার আরসি ওড়ে,
উড়েছে মরাল যেন হাজার হাজার !

(১১)

নেমে নেমে ধারাগুলি,
করি করি কোলাকুলি,
একবেণী হয়ে হয়ে নদী বয়ে যায় ;
ঝরঝর কলকল
ঘোর রবে ভাঙ্গে জল
পশু পক্ষী কোলাহল করিয়া বেড়ায়।

(১২)

কিবা ভৃগু-পাদ-মূলে
উথুলে উথুলে দুলে
ট'লে ঢ'লে চলেছেন দেবী সুরধুনী ;

কবির, যোগীর ধ্যান,
ভোলা মহেশ্বর-প্রাণ,
ভারত-সুরভি-গাভী, পতিতপাবনী।
পুণ্যতোয়া গিরিবালা!
জুড়াও প্রাণের জ্বালা!
জুড়াও ত্রিতাপ-জ্বালা মা তোমার জলে।

বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী

ভারতসঙ্গীত *

"আর ঘুমাইও না দেখ চক্ষু মেলি
দেখ দেখ চেয়ে অবনীমণ্ডলী,
কিবা সুসজ্জিত কিবা কুতূহলী,
বিবিধ-মানব-জাতিরে ল'য়ে।
মনের উল্লাসে, প্রবল আশ্বাসে,
প্রচণ্ড বেগেতে গভীর বিশ্বাসে,
বিজয়ী পতাকা উড়ায়ে আকাশে,
দেখ হে ধাইছে অকুতোভয়ে।

হোথা আমেরিকা নব অভ্যুদয়,
পৃথিবী গ্রাসিতে করেছে আশয়,

* ভারতবর্ষে যখন মোগল বাদশাহদিগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব এবং মোগল সৈন্যগণ ক্রমে ক্রমে ভারতভূমি আচ্ছন্ন করিয়া মহারাষ্ট্র-অঞ্চল আক্রমণ করে, তখন মাধবাচার্য্য নামে একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ স্বদেশের হীনতায় একান্ত দুঃখিত হইয়া স্বদেশের স্বাধীনতা-রক্ষার নিমিত্ত নগরে নগরে এবং পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিয়া বীরত্ব এবং উৎসাহ-প্রবর্দ্ধক গান করিয়া বেড়াইতেন। শিবাজীর সময় হইতে তাঁহার প্রণীত সঙ্গীত মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে সর্ব্বত্র প্রচলিত এবং অত্যন্ত আদরণীয় হয়। মাধবাচার্য্যের মৃত্যুর পর অন্যান্য গায়কেরা দেশে দেশে সেই গান করিয়া বেড়াইতেন। এই প্রবাদ অবলম্বন করিয়া ভারতসঙ্গীত লিখিত হইয়াছে।

হয়েছে অধৈর্য্য নিজ বীর্য্যবলে,
ছাড়ে হুহুঙ্কার, ভূমণ্ডল টলে,
যেন বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে,
নূতন করিয়া গড়িতে চায়।
মধ্যস্থলে হেথা আজন্মপূজিতা
চির-বীর্য্যবতী বীর-প্রসবিতা,
অনন্ত-যৌবনা য়ুনানী-মণ্ডলী,
মহিমা-ছটাতে জগৎ উজলি
কৌতুকে ভাসিয়া চলিয়া যায়।

আরব্য, মিশর, পারস্য, তুরকী,
তাতার, তিব্বত—অন্য কব কি ?
চীন, ব্রহ্মদেশ, নবীন জাপান,
তারাও স্বাধীন তারাও প্রধান,
দাসত্ব করিতে করে হেয়জ্ঞান,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয় !
বাজ্ রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রৎ মানের গৌরবে,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।"

এই কথা বলি মুখে শিঙ্গা তুলি,
শিখরে দাঁড়ায়ে গায়ে নামাবলী,
নয়ন-জ্যোতিতে হানিয়ে বিজলী,
গায়িতে লাগিল জনেক যুবা,—

আয়তলোচন উন্নতললাট,
সুগৌরাঙ্গ তনু সন্ন্যাসীর ঠাট,
শিখরে দাঁড়ায়ে গায়ে নামাবলী,
নয়নজ্যোতিতে হানিল বিজলী,
বদনে ভাতিল অতুল আভা।

নিনাদিল শৃঙ্গ করিয়া উচ্ছ্বাস,
"বিংশতি কোটী মানবের বাস,
এ ভারতভূমি যবনের দাস?
রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা!
আর্য্যাবর্ত্তজয়ী পুরুষ যাহারা
সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা?
জন কত শুধু প্রহরী পাহারা
দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধা?

ধিক্ হিন্দুকুলে! বীরধর্ম্ম ভুলে
আত্ম-অভিমান ডুবায়ে সলিলে
দিয়াছে সঁপিয়া শত্রু-করতলে
সোণার ভারত করিতে ছার!
হীনবীর্য্য-সম হয়ে কৃতাঞ্জলি
মস্তকে ধরিতে বৈরি-পদধূলি,
হাদে দেখ ধায় মহাকুতূহলী
ভারতনিবাসী যত কুলাঙ্গার!

এসেছিল যবে আর্য্যাবর্ত্তভূমে
দিক্ অন্ধকার করি তেজোধূমে,
রণ-রঙ্গ-মত্ত পূর্ব্বপিতৃগণ,
যখন তাহারা করেছিলা রণ,
করেছিলা জয় পঞ্চনদগণ,
তখন তাহারা ক'জন ছিল?

আবার যখন জাহ্নবীর কূলে,
এসেছিলা তারা জয়ডঙ্কা তুলে,
যমুনা, কাবেরী, নর্ম্মদা-পুলিনে,
দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ, দাক্ষিণাত্য-বনে,
অসংখ্য বিপক্ষ পরাজয়ি রণে,
তখন তাহারা ক'জন ছিল?

এখন তোরা যে শত কোটী তার,
স্বদেশ উদ্ধার করা কোন্ ছার,
পারিস্ শাসিতে হাসিতে হাসিতে
সুমেরু অবধি কুমেরু হইতে,
বিজয়ী পতাকা ধরায় তুলিতে,
বারেক জাগিয়া করিলে পণ!

তবে ভিন্নজাতি শত্রুপদতলে,
কেন রে পড়িয়া থাকিস্ সকলে?
কেন না ছিঁড়িয়া বন্ধন-শৃঙ্খলে,
স্বাধীন হইতে করিস্ মন?

অই দেখ সেই মাথার উপরে,
রবি, শশী, তারা দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত যেরূপে দিক্ শোভা ক'রে
ভারত যখন স্বাধীন ছিল।
সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখনো বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যগিরি এখনো উন্নত,
সেই ভাগীরথী এখনো ধাবিত,
পুরাকালে তারা যেরূপ ছিল।

কোথা সে উজ্জ্বল হুতাশন-সম
হিন্দু বীরদর্প, বুদ্ধি, পরাক্রম,
কাঁপিত যাহাতে স্থাবর-জঙ্গম,
গান্ধার অবধি জলধি-সীমা?
সকলি ত আছে সে সাহস কই?
সে গম্ভীর জ্ঞান নিপুণতা কই?
প্রবল তরঙ্গ সে উন্নতি কই?
কোথা রে আজি সে জাতি-মহিমা!

হয়েছে শ্মশান এ ভারতভূমি,
কারে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছি আমি?
গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি!—
আর কি ভারত সজীব আছে?
সজীব থাকিলে এখনি উঠিত,
বীরপদভরে মেদিনী দুলিত,

ভারতের নিশি প্রভাত হইত,
হায় রে সে দিন ঘুচিয়া গেছে।"

এই কথা বলি অশ্রুবিন্দু ফেলি,
ক্ষণমাত্র যুবা শৃঙ্গনাদ ভুলি,
পুনর্ব্বার শৃঙ্গ মুখে নিল তুলি,
গর্জ্জিয়া উঠিল গম্ভীর স্বরে,—
"এখনো জাগিয়া উঠ রে সবে,
এখনো সৌভাগ্য উদয় হবে,
রবি-কর-সম দ্বিগুণ প্রভাবে,
ভারতের মুখ উজ্জ্বল ক'রে।

একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে,
ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র মিলে
কর দৃঢ় পণ এ মহীমণ্ডলে
তুলিতে আপন মহিমা-ধ্বজা।
জপ, তপ, আর যোগ, আরাধনা,
পূজা, হোম, যাগ, প্রতিমা-অর্চ্চনা—
এ সকলে এবে কিছুই হবে না,
তূণীর-কৃপাণে কর রে পূজা।

যাও সিন্ধুনীরে ভূধর-শিখরে
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন ক'রে,
বায়ু উল্কাপাত বজ্রশিখা ধ'রে
স্বকার্য্য-সাধনে প্রবৃত্ত হও।

তবে সে পারিবে বিপক্ষ নাশিতে,
প্রতিদ্বন্দ্বি-সহ সমকক্ষ হ'তে,
স্বাধীনতারূপ রতনে মণ্ডিতে,
যে শিরে এক্ষণে পাদুকা বও।

ছিল বটে আগে তপস্যার বলে,
কার্য্যসিদ্ধি হ'ত এ মহীমণ্ডলে,
আপনি আসিয়া ভক্ত-রণস্থলে
সংগ্রাম করিত অমরগণ।
এখন সে দিন নাহিক রে আর,
দেব-আরাধনে ভারত-উদ্ধার
হবে না—হবে না—খোল তরবার,
এ সব দৈত্য নহে তেমন।

অস্ত্র-পরাক্রমে হও বিশারদ,
রণ-রঙ্গ-রসে হও রে উন্মাদ—
তবে সে বাঁচিবে, ঘুচিবে বিপদ্
জগতে যদ্যপি থাকিতে চাও
কিসের লাগিয়া হ'লি দিশেহারা,
সেই হিন্দুজাতি, সেই বসুন্ধরা,
জ্ঞানবুদ্ধিজ্যোতি তেমতি প্রখরা,
তবে কেন ভূমে প'ড়ে লুটা'

অই দেখ সেই মাথার উপরে,
রবি, শশী, তারা দিন দিন ঘোরে,

ঘুরিত যেরূপে দিক্ শোভা ক'রে
ভারত যখন স্বাধীন ছিল।
সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখনো বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যাচল এখনো উন্নত,
সে জাহ্নবী-বারি এখনো ধাবিত,
কেন সে মহত্ত্ব হবে না উজ্জ্বল ?

বাজ্ রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে ;
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রৎ মানের গৌরবে,
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে ?"

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সতীশূন্য কৈলাস

ছিন্ন হইল সতী-দেহ, শূন্য হইল শিব-গেহ,
বামদেব বিরস-বদন।
চাহেন কৈলাসময়, দেখেন কৈলাস নয়,
অন্ধকার বিঘোর ভুবন ॥
সতীমুখ-বিভাসিত যে আলোক শোভা দিত,
পুলকিত কুসুম-কানন।
পেয়ে যে কিরণমালা সুবর্ণ মণি উজলা,
সে আলোক নহে দরশন ॥
শুষ্ক-কল্পতরু-সারি, শুষ্ক মন্দাকিনী-বারি,
শূন্যকোলে সতী-সিংহাসন।
নিস্তব্ধ জগৎ-প্রাণ, নিরুদ্ধ সৌরভঘ্রাণ,
কণ্ঠে বদ্ধ বিহঙ্গ-কূজন ॥
নন্দী শুয়ে রেণু'পর, কান্দিছে বৃষভবর,
প্রাণ-শূন্য মৃগেন্দ্র বাহন।
হেরিয়া ত্রিপুরহর, দূরে রাখি বাঘাম্বর,
বসিলেন মুদি' ত্রিনয়ন ॥
আনন্দ-আলয় যিনি, আজি চিন্তাময় তিনি,
ধ্যানে ধরি' সতী-দেহ-ছায়া।
ছুড়ে ফেলি' হাড়-মাল, করে দলি' ভস্মজাল,
বিভূতি-বিহীন কৈলা কায়া ॥

মুখে "সতী"—"সতী" স্বর, বিনির্গত নিরন্তর,
দিগম্বর বাহ্যজ্ঞান-হীন।
করে জপমালা চলে, মুখে "বববম্" বলে,
অন্য শব্দ সকলি মলিন॥
জটালগ্ন ফণি-মালা মিলাইয়ে জিহ্বাজ্বালা,
লুকাইল জটার ভিতর।
নিস্পন্দ পবনস্বন, নিরানন্দ পুষ্পগণ,
অপ্রস্ফুট ঝরে রেণু'পর॥
থামিল গঙ্গার রব, নির্ব্বাক্ প্রমথ সব,
কৈলাস-জগৎ অচেতন।
কদাচিৎ "মা মা" নাদে, অসংবিৎ নন্দী কাঁদে,
"বম্" শব্দ-সহ সম্মিলন॥
কৈলাস-অম্বরময়, তারা-সূর্য্য অমুদয়,
ক্ষণকালে নিবিল সকল।
তমশ্ছন্ন দিগাকাশ, কেবলি করে উল্লাস,
নীলকণ্ঠ-কণ্ঠের গরল॥
ধ্যানমগ্ন ভোলানাথ স্কন্ধে কভু তুলি' হাত,
সতীরে করেন অন্বেষণ।
পরশিতে পুনর্ব্বার, সুকুমার তনু তাঁর,
মমতার অভ্যাস যেমন॥
তখন নয়ন ঝরে, পূর্ব্ব কথা মনে সরে,
ঝরে যথা নদী-প্রস্রবণ।
বিশ্বনাথ শোকময়, নিমীলিত নেত্রত্রয়,
প্রস্ফুটিয়া করেন ক্রন্দন॥

হারায়ে অর্দ্ধাঙ্গ সতী, কাঁদেন কৈলাসপতি,
কেবল সতীর কথা মনে।
জগতের জড়জীব কাঁদিছেন হেরি' শিব,
কাঁদিতে লাগিলা তাঁর সনে॥

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শিবের নিকট ইন্দ্রের আবেদন

হেথায় কুমেরু-শৈল ছাড়িয়া বাসব
ইন্দ্রায়ুধ অস্ত্রাদিতে হ'য়ে সুসজ্জিত—
চলিলা কৈলাসধামে নিয়তি-আদেশে,
নিত্য বিরাজিত যেথা উমা, উমাপতি।
উঠিতে লাগিলা শূন্যে, নিম্নে ধরাতল—
জলধি পর্ব্বত-মালা তরুতে সজ্জিত—
দেখাইছে একেবারে আলেখ্য যেমন
বিভূষিত বেশভূষা চারু অবয়ব।
শব্দশূন্য, বর্ণশূন্য, প্রশান্ত, গম্ভীর,
ব্যাপৃত সে ব্যোমদেশ, ব্যাস-অন্তহীন,
বিকীর্ণ তাহার মাঝে ছায়ার আকার,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-মূর্ত্তি কোটি কোটি কত!
বিশ্বপ্রতিবিম্ব হেন দশ দিক্ যুড়ি'
বিরাজিছে সে গগনে দেখিলা বাসব—
ফুটিতেছে, মিশিতেছে, অনন্ত শরীরে,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, কোটি জলবিম্ববৎ।

বসিয়া তাহার মাঝে শম্ভু ব্যোমকেশ
ঐশ্বর্য্য-ভূষিত অঙ্গ, সংযত মূরতি,
প্রকাশিত বক্ত্র, ভালে প্রগাঢ় ভাবনা,
তনু মনোহর যেন রজতের গিরি।

গাঙ্গেয় সলিল-কণা কণা-পরিমাণে
ঝরিতেছে জটাজুটে—ঝরিছে তেমতি,
হিমাদ্রি অচল অঙ্গে উত্তুঙ্গ শিখর,
ধবলগিরিতে যথা হিম-বরিষণে।
বসিয়া নিমগ্ন-চিত্ত গভীর কথনে;
গভীর কথনে মগ্ন উমা বামদেশে।
হেন কালে সুরপতি আসিয়া সেথায়
সম্ভ্রমে বন্দিলা উমা, উমাপতি হরে।

বাসবে দেখিয়া দুর্গা মধুর বচনে
কুশল জিজ্ঞাসি' তারে কৈল সম্ভাষণ,
জিজ্ঞাসিলা,—"কি কারণে গত এতকাল,
না আইলা পুরন্দর, কৈলাস-পুরীতে?
কি হেতু মলিন দেহ, বদন বিরস?
সর্ব্বাঙ্গ বিমর্ষ শুষ্ক সমাধিতে যেন,
কিংবা যেন রণস্থলে ছিলে কতকাল—
কি বিপদ্ উপস্থিত আবার ত্রিদিবে?"

কহিলা মেঘবাহন,—"হে আদ্যা প্রকৃতি,
ভুলিলা কি সর্ব্বকথা দেবের দুর্দ্দশা—
কি করিলা বৃত্রাসুর মহেশ্বর-বরে?
দেবগণ স্বর্গচ্যুত, জ্যোতিঃশূন্য দেহ,
শিবদত্ত মহাশূল-আঘাতে তাড়িত,
রক্ষা পাইল কোনমতে পাতালে পশিয়া;
সুরভোগ্য স্বর্গ এবে দৈত্যের আবাস।
শচী বৈজয়ন্ত-হারা ভ্রমিছে ধরায়,

অরণ্যে নিবাস নিত্য অহর্নিশকাল ;
অন্য দেবীগণ যত স্বর্গচ্যুত সবে,
না জানি কি ভাবে কোথা আছে লুকাইয়া !
ত্রিদিব-বিজয়াবধি নিয়তি-পূজায়
নিমগ্ন ছিলাম আমি কুমেরু-জঠরে ;
পরাজিত, পরাশ্রিত, শক্র-তিরস্কৃত—
বিপদ্ ইহার হ'তে কি আর, ভবানি ?
ভুলিলা কি, মহেশ্বরি, মহেশের মত,
সুরবৃন্দে একেবারে ? ভুলিলা বাসবে ?
ভুলিলা কি ইন্দ্রাণীরে ? পর্ব্বতনন্দিনি
পার্ব্বতি, ভুলিলা কি গো পুত্র ষড়াননে ?
জানি নাই—ভাবি নাই বিপদ্ নূতন
হৈল কিনা উপস্থিত অন্য কিছু আর—
নিয়তি-আদেশে নিত্য অন্তরীক্ষ পথে
চলেছি ক্রমশঃ এই কৈলাস-উদ্দেশে ।"
ভবানী কহিলা,—"সত্য ওহে ভগবন্,
ভ্রান্ত হ'য়ে এত দিন তত্ত্ব-আলাপনে
ছিলাম ঈশান-সঙ্গে রত এইরূপে ।
জান ত আনন্দ কত সে তত্ত্ব-শ্রবণে ।
কি কব সে মৃত্যুঞ্জয়ে সদা আশুতোষ,
যে যাহা বাসনা করে না ভাবি পশ্চাৎ
দেন তারে অচিরাৎ বর আকাঙ্ক্ষিত,
আপনি নিমগ্ন সদা এই চিন্তা-সুখে !
এতক্ষণ ইন্দ্র তুমি উপস্থিত হেথা,

কথোপকথন এত তোমায় আমায়,
হের সে নিবিষ্টচিত্ত তথাপি তেমতি
উমাপতি সমভাব—সংজ্ঞা-বিরহিত।
অমরে যন্ত্রণা এত দিল বৃত্রাসুর!
আহা ইন্দ্র, এত কষ্ট ভুঞ্জিলা হে তুমি!
ইন্দ্র, আমি এইক্ষণে কহিব শঙ্করে,
তাঁর আশীর্ব্বাদ-পুষ্ট দৈত্য দুরাচার
করিল উচ্ছিন্ন স্বর্গ দেবে তিরস্কারি',
করুন এখনি দৈত্য-নিধন-উপায়।"
এত কহি কাত্যায়নী চাহি' মহাদেবে
কহিলা,—"শঙ্কর, হের আইলা বাসব
কৈলাস-ভুবনে, দেব, তোমার আশ্রয়ে,
তব বরপুষ্ট বৃত্র দৈত্যের পীড়নে।
হে শূলিন্, সদা তুমি এরূপে বিভ্রাট
ঘটাও অমরবৃন্দে দৈত্যে আশ্বাসিয়া;
দেখ স্বর্গরাজ্য এবে হয় ছারখার—
দানব-দৌরাত্ম্যে দেব না পারে তিষ্ঠিতে।
মায়া নাই, দয়া নাই, স্নেহ-বিরহিত,
দেব-দেবীগণে সবে নিক্ষেপি' বিপাকে,
ভুলিয়া আপন পুত্র পার্ব্বতী-তনয়ে,
আছ নিত্য এই ধ্যান-সুখে নিমীলিত।
রক্ষিতে না পার যদি সৃষ্টির নিয়ম,
আশু তুষ্ট হ'য়ে তবে কেন দুষ্ট জনে
বর দিয়া পাড় এত বিষম উৎপাত?

উমাপতি, কর বৃত্র-নিধন-উপায়।"
ত্রিপুর-অন্তক শম্ভু শিবানীরে চাহি'
কহিলা,—"হে হৈমবতি, বৃত্রের সংহার
এখনো কি না হইল? পাপিষ্ঠ দনুজ
এখনো কি সুরবৃন্দে করে নিপীড়ন?
রহ গৌরি, ক্ষণকাল," বলি', চিন্তা করি',
কহিলেন শূলপাণি,—"শুন হে বাসব,
দুঃখ-অবসান তব হইবে সত্বর,
বৃত্রের নিধন ব্রহ্ম-দিবা অবসানে!"
ইন্দ্র কহে,—"দেবদেব, জানি সে সংবাদ;
অদৃষ্ট পূজিয়া বহুকষ্টে বহুকাল,
আদেশে তাঁহার এবে এসেছি কৈলাসে,
বৃত্র-বিনাশের প্রথা জানিতে বিশেষ।
ইন্দ্রের যাতনা, দেব, পারিবে বুঝিতে,
বৃত্রভুজদর্পে রণে হ'য়ে পরাজিত,
বাসবের বলবীর্য্য নহে অবিদিত,
ত্র্যম্বক, তোমার আর উমার নিকটে।
আপন মহিমা ব্যক্ত করিতে আপনি
না পারি—নাহি সম্ভবে আখণ্ডলে কভু—
ত্রিপুরারি, তবু চিত্ত-বেদনার বেগ
দমন করিতে নারি চেতনা থাকিতে।
ছিলাম স্বর্গের পতি সুরেন্দ্র বিখ্যাত,
অসুরের রণে কভু নহে পরাভব;
আজি সে ইন্দ্রত্ব মম বৃত্রাসুরে দিয়া,

ভ্রমি হের নানা স্থানে ভিক্ষুক-সদৃশ।
এ কোদণ্ড-তেজে দৈত্য না বধেছি কারে,
বৃত্র কি সে অস্ত্রাঘাত সহিত আমার ?
কি কব, করিলা যুদ্ধে অজেয় তাহারে
আপন ত্রিশূল দৈত্যে দিয়া, শূলপাণি !"
কহিতে কহিতে ইন্দ্র কৈলা আকর্ষণ
ভীমতেজে আপনার ভীষণ কার্ম্মুক,
ইন্দ্রের পরশে গাঢ় চমকে চমকে,
জ্বলিতে লাগিল তাহে জ্যোতি অপরূপ !
হেন কালে অকস্মাৎ ব্যোমকেশ-জটা
ঈষৎ কাঁপিল শীর্ষে শঙ্করে চেতায়ে।
খসিয়া পড়িল ধনু আখণ্ডল-করে,
উমার অশ্রুর বিন্দু গণ্ডেতে ঝরিল,
সহসা উদ্বেগ চিত্তে হইল সবার,
বিপদে স্মরিছে যেন অনুগত কেহ।
জিজ্ঞাসিলা মহেশ্বর চাহিয়া উমারে,—
"কেন হৈমবতি, হেন হয় অকস্মাৎ ?
বিপদে স্মরণ শিবে করিছে কেহ বা !
না ফুরাতে শিববাক্য কহিলা পার্ব্বতী,—
"হে উমেশ, শচী আজ করিছে স্মরণ,
বিপদে পড়িয়া ঘোর দৈত্যের পীড়নে ;
নৈমিষ হইতে দৈত্য করিছে হরণ !"
ভবানীর বাক্যারম্ভে দেবেন্দ্র বাসব
জানিতে পারিয়া সর্ব্ব, ছাড়ি' হুহুঙ্কার,

তুলিয়া কার্ম্মুক শূন্যে দিব্য জ্যোতির্ম্ময়,
স্বর্গ-অভিমুখে শীঘ্র হইলা ধাবিত।
"তিষ্ঠ, ইন্দ্র, ক্ষণকাল," বলিয়া মহেশ
হস্ত প্রসারিয়া তারে কৈলা নিবারণ।
শিব-করে আকর্ষিত হ'য়ে আখণ্ডল,
গর্জ্জিতে লাগিলা যেন ক্রোধিত অর্ণব—
যবে বাত্যা-উত্তেজিত মেদিনী গ্রাসিয়া,
ধায় ক্রোধে যাদঃপতি, অবরোধে যদি
সে বেগ নিবারি' অঙ্গে উচ্চ শৈলকুল,
বেষ্টি' চতুর্দ্দিক্ দৃঢ় পাষাণ-ভিত্তিতে।
গর্জ্জি' হেন ক্ষণকাল শান্ত ভাবে কিছু,
কহিলা,—"ধূর্জ্জটি, তৃপ্ত নহ কি অদ্যাপি? শিবের নাম
যা ছিল ইন্দ্রের শেষ তাহাও দনুজে
সমর্পিলা এতদিনে, মৃত্যুঞ্জয়ী দেব?
পুত্র মূর্চ্ছাগত, পত্নী দৈত্য-অপহৃত,
রক্ষা-হেতু যাই তারে—করহ নিষেধ?
বাসনা কি, শিব, তব ইন্দ্রের লাঞ্ছনা
না থাকিবে বাকি কিছু বৃত্রাসুর-কাছে,
কেন তবে সৃষ্টি-মাঝে রেখেছ অমর?
কেন এ ব্রহ্মাণ্ড যত বিধি-বিরচিত
নাহি চূর্ণ কর তবে?—কেন হে বিধাতঃ,
করিলে দেবের সৃষ্টি যন্ত্রণা ভুগিতে?
শিবের শিবত্ব শুধু এই কি কারণে?
অমরে অপ্রীতি সদা সম্প্রীতি অসুরে?

এই কি সে সর্ব্বজন-পূজিত শঙ্কর ?
নাহি চাহি কোন ভিক্ষা, না চাহি জানিতে
বৃত্রবধ কি উপায়ে ; ছাড়হ আমায়,
দেখ পশুপতি, একে কোদণ্ড-সহায়ে
একা ইন্দ্র কি সাধিতে পারে স্বর্গপুরে !
 ইন্দ্রের ভর্ৎসনা শুনি' ত্রিপুর-অন্তক
কহিলা আনিতে শূল বীরভদ্রে চাহি',
কহিলা বাসবে,—"শান্ত হও, সুরপতি,
শচীর স্মরণে চিত্ত হয়েছে ব্যাকুল ।—
এত দর্প দনুজের অমরা হরিয়া,
অমরাবতীর শোভা—শচী পুলোমজা—
পরশে শরীর তার ?—হা রে বৃত্রাসুর,
শিবের প্রদত্ত বর ঘৃণিত করিলি !"
 বলিতে বলিতে ক্রোধ হইল মহেশে,
ব্রহ্মাণ্ডের বিশ্ব যত শূন্যে মিশাইল,
পরশিল জটাজূট অনন্ত আকাশে,
গরজিল শিরে গঙ্গা বিভীষণ নাদে,—
গর্জ্জিলা তেমতি যথা হিমাদ্রি বিদারি'
ভাগীরথী ধায় মর্ত্ত্যে গোমুখী-গহ্বরে ;
জ্বলিল ললাট-বহ্নি প্রদীপ্ত শিখায়,
বহ্নিময় হৈল সেই শূন্যব্যাপী দেশ ;
ধরিলা সংহার-মূর্ত্তি রুদ্র ব্যোমকেশ,
গর্জ্জিয়া সংহার-শূল করিয়া ধারণ,
তুলিলা বিষাণ তুণ্ডে, দীপ্ত শ্বেত-তনু,

অনল-সমুদ্রে যেন ভাসিল মৈনাক।
ভয়ে পুরন্দর শীঘ্র সম্মুখ ছাড়িয়া
ঈশানী-পশ্চাতে আসি কৈলা অধিষ্ঠান
বীরভদ্র সন্ত্রাসিত দাঁড়াইলা দূরে,
পার্ব্বতী ঈশানে উচ্চ করিলা সম্ভাষ,—
"সংবর, সংবর দেব, সংহার-ত্রিশূল,
না কর বিষাণে ঘোর প্রলয়ের ধ্বনি,
অকালে হইবে সর্ব্ব-সৃষ্টি-বিনাশন,
সংবরণ কর শীঘ্র সংহার-মূরতি।
কি দোষ করিলা কহ বিশ্ববাসিগণ?
কি দোষ করিলা অন্য প্রাণী যে সকল?
কোন্ দোষে দোষী, দেব, দেবতা-মানব,
একা বৃত্রে বিনাশিতে বিশ্ব ধ্বংস কর?
কহ ইন্দ্রে বৃত্রনাশ-বিধি, ত্রিপুরারি,
নিক্ষেপে সংহার-শূল সৃষ্টিনাশ হবে;
ভবিতব্য-লিপি, দেখ, না কর খণ্ডন,
সংবর সংহার-মূর্ত্তি, ঈশ উমাপতি।"
পার্ব্বতী-বাক্যেতে রুদ্র ত্যজি' উগ্র বেশ,
ধরিলা আবার পূর্ব্ব প্রশান্ত মূরত্তি—
রজতগিরিসন্নিভ ধবল অচল
ভূষিয়া' বরষে যথা হিমানীর কণা।
সহাস্য-বদনে ইন্দ্রে সম্ভাষি' কহিলা,—
"আখণ্ডল, বৃত্রবধ অনুচিত মম—
পার্ব্বতী কহিলা সত্য —এ শূল-নিক্ষেপে

সমূহ ব্রহ্মাণ্ড নষ্ট হবে অকস্মাৎ।
পুরন্দর, ভাগ্যে তার মৃত্যু তব হাতে,
যাও শীঘ্র দধীচি মুনির সন্নিধানে,
মহাতেজঃপুঞ্জ ঋষি, দেব-উপকারে
ত্যজিবে আপন দেহ, পবিত্রহৃদয়।
দধীচির পূত অস্থি বিশ্বকর্ম্মা-করে
হইবে অদ্ভুত অস্ত্র অমোঘ-সন্ধান;
সংহার-ত্রিশূল-তুল্য তেজ সে আয়ুধে,
প্রলয়-বিষাণ-শব্দ নিনাদিবে সদা,
অব্যর্থ হবে সে অস্ত্র তীব্র বহ্নিময়,
সর্ব্বত্র সকল কালে সর্ব্বসংহারক।
ত্রিদিবে না রবে আর দানব-উৎপাত,
বজ্র নামে সেই অস্ত্র হবে অভিহিত।
বদরী-আশ্রমে ঋষি দধীচি এক্ষণে
তপস্যা করিছে বিষ্ণু-আরাধনা ধরি',
সেইখানে, সুরপতি ইন্দ্র, কর গতি,
অস্থি লভি' বৃত্রাসুরে বিনাশ বজ্রেতে।"
   শুনিয়া শঙ্কর-বাক্য সহর্ষ বাসব
বিশ্বমাতা উমারে বন্দিয়া ভক্তিভাবে,
বন্দি' গাঢ় ভক্তিসহ দেব উমাপতি,
চলিলা দধীচি-পার্শ্বে শূন্যেতে মিশায়ে।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

জুড়াইতে চাই

জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই,
কোথা হ'তে আসি, কোথা ভেসে যাই,
ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি,
কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই!

কে খেলায়, আমি খেলি বা কেন?
জাগিয়া ঘুমাই কুহকে যেন;
এ কেমন ঘোর, হ'বে নাকি ভোর!
অধীর অধীর যেমতি সমীর,
অবিরাম গতি নিয়ত ধাই!

জানি না কে বা, এসেছি কোথায়,
কেন বা এসেছি, কে বা নিয়ে যায়,
যাই ভেসে ভেসে, কত কত দেশে,—
চারি দিকে গোল, উঠে নানা রোল,
কত আসে যায়, হাসে কাঁদে গায়,
এই আছে আর তখনি নাই!

কি কাজে এসেছি, কি কাজে গেল,
কে জানে কেমন কি খেলা হ'ল!
প্রবাহের বারি,—রহিতে কি পারি?
যাই—যাই কোথা? কূল কি নাই?

কর হে চেতন, কে আছ চেতন,
কত দিনে আর ভাঙ্গিবে স্বপন !
যে আছ চেতন ঘুমায়ো না আর,
দারুণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার ;
কর তমোনাশ, হও হে প্রকাশ,—
তোমা বিনা আর নাহিক উপায়,
তব পদে তাই শরণ চাই !

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

ভীম ও দ্রৌপদী

ভীম। কোথা তৃপ্তি—কীচকের একমাত্র প্রাণ !
ছার সূতের নন্দন !—
পদাঘাতে, পদাঘাত হবে কিবা শোধ !
মৃত্যু দেখি, দয়াশীল যুধিষ্ঠির হ'তে।
ক্ষুদ্র বক্ষ ধরে দুঃশাসন,—
বিদারি', শোণিত-তৃষা মিটিবে কি মোর ?
দুর্য্যোধন,—হুতাশন হুতাশন জ্বলে—
ছার মুখে ধর্ম্মরাজে নিন্দিল পামর ;
পদাঘাতে কিবা হবে প্রতিশোধ !
বধিব না—বধিব না তারে,
উরুভঙ্গে কুঞ্চিত বদন,
উর্দ্ধদৃষ্টে চাহিবে যখন—
ধীরে ধীরে করিব চরণাঘাত ;
গিরি চূর্ণ হয় যে প্রহারে,
সে চরণ না হানিব বলে।
কভু না বধিব,
শৃগালে অর্পিব সেই ভার।—
পড়ে মনে কীচকের ঘূর্ণিত নয়ন,—
জীবিত থাকিতে খর নখে উপাড়িব !

ফাটে প্রাণ, যুধিষ্ঠির ভৃত্যাসনে !
নপুংসক—গাণ্ডীবী ফাল্গুনি !
হায়, প্রাণের নকুল,
অরিকুল আকুল যাহারে হেরি—
পরাশ্রিত অশ্বরজ্জু-করে !
দেবাকার দেব-বীর্য্য সহদেব—
ত্যজি' দিগ্বিজয়ী ধনু,
ধেনুপাল ল'য়ে ফেরে !
লক্ষ রাজা জিনি'
আনিলাম লক্ষ্মী-স্বরূপিণী ঘরে,
চুলে ধ'রে কীচক প্রহারে পায় !—
দেখিলাম—বল্লভ ব্রাহ্মণ !
কুক্ষণে—কুক্ষণে—
আরে দুঃশাসন, আরে দুর্য্যোধন,
আরে নরাধম সূত-সুত,
বিরাট-শ্যালক,
ভীমসেনে কুক্ষণে করিলি অরি !—
কত দিন—কত দিন আর
কণ্টক-শয্যায় শোব ?

[ভীমের শয়ন]

[দ্রৌপদীর প্রবেশ]

দ্রৌপদী। ধিক্, ধিক্ ধর্ম্মনিষ্ঠা তার—
ধিক্ দয়া !—
ধিক্, ধিক্,—বীরাঙ্গনা বলি' মনে করি অভিমান।

এ মনোবেদনা,
তপশ্চারী যুধিষ্ঠির কি বুঝিবে ?
ভীম বিনা কারে জানাইব ব্যথা ?
তিন দিন যদি ব'য়ে যায়,
কীচক না হারায় পরাণ,
ভগবান্, আত্মহত্যা না ডরিব—
পাসরিব দুঃশাসনে—
বেণী না বাঁধিয়া,
জলে তনু দিব বিসর্জ্জন ।—
নিদ্রিত, কি শুইয়াছ মহানিদ্রা-কোলে-
উঠ—উঠ, সূপকার !

ভীম । কহ—কহ, সহদেব,
অজ্ঞাত হইল অবসান ?
এ কি,—যাজ্ঞসেনী !
গভীর রজনী, ডরি পাছে কেহ দেখে ।

দ্রৌপদী । সূতপুত্র প্রহারিল পায়—
হেন অবলায় নাহি স্পর্শে অপমান ।

ভীম । কৃষ্ণা—কৃষ্ণা, হুতাশনে ঘৃত নাহি ঢাল ।
বহু কষ্টে ধর্ম্মরাজে চাহি' ধরি দেহ ।

দ্রৌপদী । মরিবে ? মরণে প্রস্তুত আমি ।
অজ্ঞাতে পাণ্ডব নাম হৌক অবসান—
অপমান গোপনে রহিবে ।
মুক্ত-ভাষে কহি,
দুর্য্যোধন, দুঃশাসন রহুক কুশলে ।

ভীম। কৃষ্ণা, অল্পদিন—রাজার নিষেধ!
আছে অল্পদিন,
পুনঃ
দেব-নাগ-নরে দেখিবে তোমারে—
রাজচক্রবর্ত্তি-বামে।
শুন যাজ্ঞসেনি, কহি সত্য বাণী,
যেই দিনে হইব প্রকাশ,
কীচকেরে সবংশে মারিব,—
শিরায় শিরায় উষ্ণ স্রোত ধায়,
হের, কাঁপে কলেবর, দেবি!
কি করিব, রাজার নিষেধ;
নহে মৎস্যরাজ্য-চিহ্ন না রহিত।
জ্বলি যে জ্বালায়—কি কব তোমারে আর!

দ্রৌপদী। জানিতাম, সহিবারে নারীর সৃজন—
সহ্যগুণ পুরুষে অধিক দেখি!
শাস্ত্রে অতি সুপণ্ডিত,—
ভার্য্যা ত্যজি' রাজ্য যদি হয়,
ভার্য্যা-হেতু পুনঃ কেবা যায় বনে!
ভার্য্যা মাত্র পণের কারণ!

ভীম। শুন রাজরাণী, দিন নাহি রবে,
নিজ হাতে বেঁধে দিব বেণী তোর;
দুর্য্যোধন-শোণিত-সহিত,
গদা দেখাইব আনি;
মুকুটের রেণু দেখাইব এই পদে;

স্থতপুত্র কীচকেরে—
তিল তিল করি দেহ তার,
মিশাইব ধূলি-সনে, উড়িবে গগনে—
আত্মীয়ে না পাবে তনু সংকারের হেতু !
অনেক সহেছ—ধৈর্য্য ধর চাহি' মো-সবারে,-
ফাটে বুক, কি করি স্থন্দরি !

দ্রৌপদী। সহিয়াছি—
রমণীর সহিতে উচিত যাহা,—
পরবাসে আছি সৈরিন্ধ্রীর বেশে ;
আমা হেতু কভু নাহি ভাবি দুখ।
স্বামী রাজ্যেশ্বর, আছিলাম রাণী,
পরগৃহ-নিবাসিনী পতি-সনে ;—
অপমান সভাতলে,—
অপমান জয়দ্রথ-ছলে,—
তিল না গণিনু,
আঁখি-বারি অঞ্চলে মুছিনু,
চলিলাম সিংহিনী-সমান—
মৃগরাজ পাছে পাছে !
কিন্তু ভেকে কভু স্পর্শেনি করিণী !
গোপরাজ্যে রাজা,—
শ্যালক তাহার করে মোর অপমান !
শুন শেষ-উত্তর, বৃকোদর,
সতী নারে অধিক সহিতে !

ভীম। হা পাঞ্চালি, হেন দশা হইল তোমার !

পুনঃ যাব বনে—
পাপাচারে বিনাশিব।
না—না, ধর্ম্মরাজে না লঙ্ঘিব।—
কি করিব.— রাজার নিষেধ।

দ্রৌপদী। জনে জনে না লব বিদায় ;
নিশা গতপ্রায়,
চরণে মেলানি মাগি।
জানা'য়ো রাজারে—
জানাইয়ো—জানাইয়ো স্বামিগণে,
সবার চরণে নমস্কার করে দাসী।

ভীম। শান্ত হও, কৃষ্ণা গুণবতি !
যে হয় সে হয়—কীচকে মারিব আমি।
আছে কি উপায় গোপনে বধিতে তারে ?
পার তারে ল'য়ে যেতে শূন্য কোন স্থানে ?

দ্রৌপদী। শূন্য স্থান—নাট্যশালা—যামিনীতে।

ভীম। সুচরিত্রে, নাট্যশালা বধ্য-ভূমি তার।
শুন সতি, ইঙ্গিতে ভুলায়ে
নিশাকালে আন নাট্যশালে।
ঘূর্ণিত নয়ন তার উপাড়িব নখে।

দ্রৌপদী। ভাল,
নৃত্যগৃহে আনিতে আমার ভার।

ভীম। নিজ কর্ম্মে যাও, সতি !
প্রভাত নিকট।

[দ্রৌপদীর প্রস্থান]

ধৈর্য্য ধর, অধীর অন্তর !
রোষ-অগ্নি বাহিরিবে লোমকূপে—
মুর্চ্ছা যাবে লোকে,
স্ফীত শিরা ললাটে হেরিবে,
উগ্রমূর্ত্তি ক্ষুদ্র মৎস্যদেশে কে সহিবে ?
নিশা-আবরণে আবার ঢাকিবে ধরা,
নীরবে—যামিনীর ঝিল্লীরবে
মিশাইবে রোষপূর্ণ দীর্ঘ-শ্বাস,
শিহরিবে ভুজঙ্গ গহ্বরে শুনি',
শৃগালের নাদে আর্ত্তনাদ মিশাইবে তার
না করিব রুধির-পতন,
সে পাপ-রুধিরে অপবিত্র হবে ক্ষিতি ।-
ধৈর্য্য ধর—ধৈর্য্য ধর, প্রাণ !

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

সিন্ধুতট

নির্ম্মল আনন্দরাশি, নির্ম্মল আনন্দ-হাসি,
প্রভাসের মহাসিন্ধু! আনন্দ নির্ম্মল,—
জলরাশি; হাসি,—লীলা তরঙ্গ চঞ্চল;
অপরাহ্ন, বসন্তের শুক্লা চতুর্দ্দশী।
আনন্দ রবির কর, আনন্দ সুনীলাম্বর,
প্রকৃতি আনন্দময়ী ষোড়শী রূপসী।
আনন্দের সচঞ্চল লীলা রত্নাকর!
আনন্দের অচঞ্চল লীলা নীলাম্বর!
নীলিমায় নীলিমায়, মহিমায় মহিমায়,
মিশাইয়া পরস্পরে—মহা আলিঙ্গন!
মহাদৃশ্য!—অনন্তের অনন্ত মিলন!
নীলসিন্ধু, শ্বেতবেলা; বেলায় তরঙ্গ-খেলা—
দিতেছে বেলায় সিন্ধু শ্বেতপুষ্পহার,
গাহিয়া আনন্দগীত, চুম্বি' অনিবার।
সিন্ধু-বক্ষে বেলা, যেন বিষ্ণু-বক্ষে বাণী,—
সান্ধ্য রবিকরে হাসে বেলা সিন্ধুরাণী।
বিচিত্র শিবিরশ্রেণী, শত সংখ্যাতীত,
বিচিত্র কেতন শিরে, শোভিতেছে সিন্ধুতীরে,
সিন্ধু মত সিন্ধুপ্রিয়া করি তরঙ্গিত।
আসিছে যাদবগণ—আসিয়াছে কত,—

গজপৃষ্ঠে, অশ্বে, রথে, নানা দিকে, নানা পথে,
কল্লোলিত সিন্ধুপ্রিয়া করি' সিন্ধু মত।
কিছু দূরে মনোহর বঙ্কিম বেলায়,
নীল গগনের পটে অমল বিভায়,
কৃষ্ণের শিবিরশ্রেণী তুলি' ঊর্দ্ধে শির
শোভিতেছে যেন দেব-পবিত্রমন্দির।
শিবির-চূড়ায় স্বর্ণ-ধ্বজে নিরুপম,
নীল কেতনের বক্ষে, পীত সুদর্শন,
কি লীলা সমুদ্রতীরে, সমদ্র-অনিলে ধীরে
করিছে মহিমময়! সিন্ধু অবিরাম
অসংখ্য তরঙ্গ-করে করিছে প্রণাম।

নবীনচন্দ্র সেন

নারীধর্ম্ম

সুলোচনা। অভাগি ! এরূপে কি লো অনিদ্রায় অনাহারে
খোয়াইবি দেহ আপনার ?
নাহি রাত্রি, নাহি দিন—থাক প্রলেপের মত
লাগি' অঙ্গে আহত সবার !
শিবিরে শিবিরে ঘুরি আহতের শুশ্রূষায়
হইয়াছে কি দশা তোমার।
বসিয়া গিয়াছে চোক, মলিন বিবর্ণ মুখ,
ধূলায় ধূসর কেশভার।
আজি একাদশ দিন বাধিল এ পোড়া রণ,
দেখি নাই তব হাসিমুখ।
এইরূপে রাত্রিদিন মরিয়া মড়ার তরে
নাহি জানি পাও কিবা সুখ !

সুভদ্রা। তদধিক রমণীর আছে কিবা সুখ !
রোগে শান্তি, দুঃখে দয়া, শোকেতে সান্ত্বনা-ছায়া,
দিদি ! এই ধরাতলে রমণীর বুক।
এতাধিক রমণীর আছে কিবা সুখ ?
(যেমতি অনল-জল সৃজিলেন নারায়ণ,
সৃজি' সেইরূপ, দিদি ! রোগ, শোক, দুখ,
সৃজিলা অনন্ত-প্রেম-পূর্ণ নারীবুক।)
আছে আর কিবা সুখ, হায়, এইরূপে যদি
ঢালিয়া অমৃত মৃতে, শান্তি যন্ত্রণায়,
রমণী-জীবন-গঙ্গা বহিয়া না যায়।

ওই দেখ, নিত্য নিত্য কতই পুরুষ-রত্ন
পালিয়া স্বধর্ম্ম কিবা ত্যজিছে জীবন!
পালিতেছি আমরা কি স্বধর্ম্ম তেমন?

সুলোচনা। মানিলাম নারীধর্ম্ম আর্ত্ত-আহতের সেবা,
কিন্তু শত্রুদের সেবা কেন?
তাহাদের মড়া নিয়া তাহারা মরুক গিয়া,
তোর কেন মাথাব্যথা হেন?

সুভদ্রা। শত্রু!—শত্রু কি মানুষ নহে লো আমার মত?
রক্তমাংস নাহি কি তাহার?
(তোমার আমার প্রাণ নহে কি শত্রুর প্রাণ?
একজল—ভিন্ন জলাধার!
তাও একধাতুময় অস্ত্রে, একরূপে হয়
সর্ব্বদেহ ক্ষত ও বিক্ষত;
সহে একরূপ ব্যথা, একরূপ মৃত্যুমুখে
শত্রুমিত্র হয় নিপাতিত।)
শত্রু!—এক ভগবান্ সর্ব্বদেহে অধিষ্ঠান,
সর্ব্বময় এক অদ্বিতীয়!
কেবা তুমি, কেবা আমি, কেবা শত্রু, মিত্র কেবা?
কারে বল প্রিয় বা অপ্রিয়?

সুলোচনা। শত্রুকেও তাহা বলি' করিব কি মিত্র-জ্ঞান?
মিত্র ওই কর্ণ-দুর্য্যোধন?
দুর্জ্জনেরো দুঃখে দুঃখী হইব কি? সমভাবে
বিষামৃত করিব গ্রহণ?

সুভদ্রা। যেই জন পুণ্যবান্, কে না তারে বাসে ভাল ?
তাহাতে মহত্ত্ব কিবা আর ?
পাপীরে যে ভালবাসে, আমি ভালবাসি তারে,
সেই জন প্রেম-অবতার।
সুগন্ধ নির্গন্ধ ফুল বিরাজিছে সমভাবে
দেখ অঙ্কে মাতা বসুধার !
সমুজ্জ্বল রত্নসহ অনন্ত বালুকা-রাশি
বহিতেছে গর্ভে পারাবার।
জগতের সাম্যনীতি, সুখময় প্রেমগীতি,
মানবের কি শিক্ষার স্থান !
সর্ব্বত্র সমান প্রেম, সর্ব্বত্র সমান দয়া,
সর্ব্বত্র কি একত্ব মহান্ !
না, দিদি !—আমরা নারী বিশ্বজননীর ছবি
আমাদের শত্রু-মিত্র নাই।
বরিষার ধারা মত অজস্র জননীপ্রেম
সর্ব্বত্র ঢালিয়া চল যাই !
মিত্রকে যে ভালবাসে, সকাম সে ভালবাসা,
সে ত ক্ষুদ্র ব্যবসায় ছার !
শত্রু-মিত্র-তরে যার সমভাবে কাঁদে প্রাণ,
সেই জন দেবতা আমার !
প্রেমধর্ম্ম এই, দিদি ! কালি কৃষ্ণার্জ্জুন মত
দেখিতাম সকল সংসার ;
মাতৃস্নেহ-পূর্ণ বুকে আজি দেখিতেছি সব
অভিমন্যু-উত্তরা আমার !

পিতা, মাতা, ভগ্নী, ভ্রাতা, পতি, পুত্র, মহাবিশ্বে
এই প্রেম তৃপ্তি নাহি পায়!
অনন্ত এ বিশ্ব ছাড়ি' কি যে লো অনন্ত আছে,
প্রেমসিন্ধু সেই দিকে ধায়!

নবীনচন্দ্র সেন

বিজয়া *

বিনামেঘে বজ্রাঘাত,
অকস্মাৎ ইন্দ্রপাত,
বিনাবাতে নিভে গেল মঙ্গল-প্রদীপ।
শমন পাইত শঙ্কা,
সম্মুখে শোনাতে ডঙ্কা,
প্রবাসে তস্করবেশে হইল প্রতীপ॥

দুর্দ্দম প্রতাপে পুষ্ট,
স্পষ্টবাদে শুদ্ধ তুষ্ট,
অশিষ্ট-শাসনপটু শিষ্টের সহায়।
বিদ্যাপীঠে গোষ্ঠিপতি,
একচেষ্ট হৃষ্টমতি,
জয়পত্র-লিপ্ত ভালে সর্ব্বত্র সভায়॥

দ্বিজবুদ্ধি, তেজে ক্ষত্র,
কর্ম্মক্ষেত্রে যত্র তত্র,
অধিপতি একচ্ছত্র—জন্ম-অধিকার।
প্রতিভার পূর্ণদৃষ্টি,
করিত নূতন সৃষ্টি,
ধ্বংসমুখী নহে মাত্র, চিত্ত অবিকার॥

* স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু-উপলক্ষে

কেশাগ্র-নখাস্তে দীপ্ত,
জাগ্রৎ জীবন লিপ্ত,
সুস্থ দেহ দীপ্ত মন সুবিরাট্ কায়।
মরণের হলো বশ্য,
মুহূর্ত্তে হইল ভস্ম,
অধরের চিরহাস্য নিমেষে শুখায়॥

বঙ্গ-কণ্ঠ শূন্য ক'রে,
বিহার কি হার হ'রে,
অগ্নি জেলে দিলি দ্বেষে ভগ্নীর অন্তরে।
অহিংসার জন্মভূমি,
বুদ্ধের জননী তুমি,
বিস্মৃতিতে বিসর্জ্জিলি গৌতম-মন্তরে॥

ধ্যানে যাঁর ছিল দৃষ্টি,
নবীন নালন্দা-সৃষ্টি,
ভারতের ভারতীরে জাগাতে আবার।
আলো দিতে এ জগতে,
জ্ঞান-জ্যোতি প্রাচ্য হ'তে,
পুনরায় যায় যাতে বারিতে আঁধার॥

না হইতে কর্ম্ম-সাঙ্গ,
মধ্যপথে ব্রত-ভঙ্গ,
বঙ্গের বরাঙ্গ বীর লুকাল কোথায়
তন্দ্রাহীন কর্ম্ম-রঙ্গে
বিরোধ বিশ্রাম সঙ্গে,
আলস্য উপাস্য চির হলো ছলনায়॥

সার্থক পুরুষ নাম,
পৌরুষের পূর্ণধাম,
ক্ষমবান্ দম্ভি-দর্প করিবারে চূর্ণ।
দীনজনে আশুতোষ,
বিদ্রোহীরে রুদ্ররোষ,
বিদ্বানে বন্ধুত্ব-বাঁধে বেঁধে নিতে তূর্ণ।

এ বঙ্গের যত ছাত্র,
ছিল তব স্নেহপাত্র,
তারাই ত পুত্র মিত্র স্বাগত অতিথি।
অনর্গল গৃহদ্বার,
ঢল ঢল হৃদাধার,
কত অশ্রুজল, দেব, মুছায়েছ নিতি॥

মাতৃ-গোত্রে প্রীতি অতি,
আশুতোষ সরস্বতী—
উপাধি-ভূষণ তব বিজয়-নিশান।
দেখিতে দেখিতে হায়,
সরস্বতীপূজা সায়
বিষাদের বিজয়ায় প্রতিমা-ভাসান॥

এ নগরী নিরানন্দে,
সাজাইয়া পুষ্প-গন্ধে
দেব-দেহ লয়ে স্কন্ধে করিল বহন।
জগৎ জাগায়ে নামে,
ফিরে গেলে নিজ ধামে,
আদিগঙ্গা-তীর্থ-তীরে দেহের দাহন॥

অমৃতলাল বসু

ধূলা

কোন্ ঐন্দ্রজালিকের অস্থি-অবশেষ
কহ তুমি, লো কণিকে, মোর কাণে-কাণে?
সমীর-বাহিনী তন্বী কে না তোমা জানে?
উড়ে' উড়ে' কর সদা কাহার উদ্দেশ?
হেন স্থান নাহি যথা নাহি তব গতি!
প্রকাশ্য নিবাস-পথে, যাও পায় পায়—
ঘৃণাভরে ফেলে ঝেড়ে' কেবা না তোমায়?

নিরভিমানিনি অয়ি! তবু কর স্থিতি
লুকায়ে, গৃহের কোণে, অযত্ন-পালিতা
দরিদ্র বালিকা-মত ধনীর ভবনে;
দীনেরো কুটিরে তুমি নহ সম্মানিতা।
লো মলিনে! অই তব মলিন বসনে
ঢাকা যে সৌন্দর্য্যরাশি, বিশ্বানুলেপন,
মোরা বিজ্ঞ, মোরা অজ্ঞ! চিনেও চিনি না!

জগৎ-জননী-রূপা! তোমারে সে চিনে
স্বভাব-দীক্ষিত-শিশু, মহানন্দ মনে
মাখে গায় নিয়ে তুলে অঞ্জলি-অঞ্জলি;
নগ্ন অঙ্গে কিবা শোভা ধর তুমি ধূলি!

সর্ব্বাঙ্গে বুলা'য়ে কর দাও সাজাইয়া,
নেহারি' সন্ন্যাসী নাগা মুগ্ধ হয় হিয়া !

বাল্যসখি, চিনি' তব মধুর মূরতি,—
করিয়াছি এক দিন সাদরে আরতি !
আদ্যন্ত-রূপিণি, তব মহিমা অশেষ,
অবসান তোরি মাঝে সর্ব্ব-গর্ব্ব-লেশ !

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

ভারতলক্ষ্মী

অয়ি ভুবনমনোমোহিনী !
অয়ি নির্ম্মল সূর্য্যকরোজ্জ্বল ধরণী
জনক-জননী-জননী !

নীল-সিন্ধু-জল-ধৌত চরণতল,
অনিল-বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল,
অম্বর-চুম্বিত ভাল হিমাচল,
শুভ্র-তুষার-কিরীটিনী !

প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে,
জ্ঞানধর্ম্ম কত কাব্যকাহিনী !

চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশ-বিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবী-যমুনা-বিগলিত করুণা
পুণ্যপীযূষ স্তন্যবাহিনী !

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভাষা ও ছন্দ

যে দিন হিমাদ্রিশৃঙ্গে নামি আসে আসন্ন আষাঢ়,
মহানদ ব্রহ্মপুত্র, অকস্মাৎ দুর্দ্দাম দুর্ব্বার
দুঃসহ অন্তরবেগে তীর-তরু করিয়া উন্মূল,
মাতিয়া খুঁজিয়া ফিরে আপনার কূল-উপকূল,
তট-অরণ্যের তলে তরঙ্গের ডম্বরু বাজায়ে
ক্ষিপ্ত ধূর্জ্জটির প্রায় ; সেই মত বন্যানীর ছায়ে
স্বচ্ছ শীর্ণ ক্ষিপ্রগতি স্রোতস্বতী তমসার তীরে
অপূর্ব্ব উদ্বেগভরে সঙ্গিহীন ভ্রমিছেন ফিরে
মহর্ষি বাল্মীকি কবি,—রক্তবেগ-তরঙ্গিত বুকে,
গম্ভীর জলদমন্দ্রে বারম্বার আবর্ত্তিয়া মুখে
নব ছন্দ ; বেদনায় অন্তর করিয়া বিদারিত
মুহূর্ত্তে নিল যে জন্ম পরিপূর্ণ বাণীর সঙ্গীত,
তারে লয়ে কি করিবে, ভাবে মুনি কি তার উদ্দেশ,—
তরুণ গরুড়সম কি মহৎ ক্ষুধার আবেশ
পীড়ন করিছে তারে, কি তাহার দুরন্ত প্রার্থনা,
অমর বিহঙ্গশিশু কোন্ বিশ্বে করিবে রচনা
আপন বিরাট্ নীড় ?—অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেয়, তার বক্ষে বেদনা অপার,—
তার নিত্য জাগরণ ! অগ্নিসম দেবতার দান
ঊর্দ্ধশিখা জ্বালি চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ !

অস্তে গেল দিনমণি। দেবর্ষি নারদ সন্ধ্যাকালে
শাখাসুপ্ত পাখীদের সচকিয়া জটারশ্মিজালে,
স্বর্গের নন্দনগন্ধে অসময়ে শ্রান্ত মধুকরে
বিস্মিত ব্যাকুল করি, উত্তরিলা তপোভূমি 'পরে।
নমস্কার করি কবি, শুধাইলা সঁপিয়া আসন,—
"কি মহৎ দৈবকার্য্যে, দেব, তব মর্ত্ত্যে আগমন?"
নারদ কহিলা হাসি,—"করুণার উৎসমুখে, মুনি,
যে ছন্দ উঠিল ঊর্দ্ধে, ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা তাহা শুনি'
আমারে কহিলা ডাকি, যাও তুমি তমসার তীরে,
বাণীর বিদ্যুৎ-দীপ্ত ছন্দোবাণবিদ্ধ বাল্মীকিরে
বারেক শুধায়ে এস,—বোলো তারে, 'ওগো ভাগ্যবান্!
এ মহা-সঙ্গীতধন কাহারে করিবে তুমি দান?
এই ছন্দে গাঁথি লয়ে কোন্ দেবতার যশঃকথা
স্বর্গের অমরে কবি মর্ত্ত্যলোকে দিবে অমরতা?'"

কহিলেন শির নাড়ি ভাবোন্মত্ত মহামুনিবর,—
"দেবতার সামগীতি গাহিতেছে বিশ্বচরাচর,
ভাষাশূন্য অর্থহারা। বহ্নি ঊর্দ্ধে মেলিয়া অঙ্গুলি
ইঙ্গিতে করিছে স্তব; সমুদ্র তরঙ্গবাহু তুলি'
কি কহিছে, স্বর্গ জানে; অরণ্য উঠায়ে লক্ষশাখা
মর্ম্মরিছে মহামন্ত্র; ঝটিকা উড়ায়ে রুদ্র পাখা
গাহিছে গর্জ্জন গান; নক্ষত্রের অক্ষৌহিণী হ'তে
অরণ্যের পতঙ্গ অবধি, মিলাইছে এক স্রোতে

সঙ্গীতের তরঙ্গিণী বৈকুণ্ঠের শান্তিসিন্ধু-পারে।
মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারিধারে,
ঘুরে মানুষের চতুর্দ্দিকে। অবিরত রাত্রিদিন
মানবের প্রয়োজনে প্রাণ তার হ'য়ে আসে ক্ষীণ।
পরিস্ফুট তত্ত্ব তার সীমা দেয় ভাবের চরণে;
ধূলি ছাড়ি' একেবারে ঊর্দ্ধমুখে অনন্তগগনে
উড়িতে সে নাহি পারে সঙ্গীতের মতন স্বাধীন
মেলি দিয়া সপ্তসুর সপ্তপক্ষ অর্থভারহীন।
প্রভাতের শুভ্র ভাষা—বাক্যহীন প্রত্যক্ষ কিরণ—
জগতের মর্ম্মদ্বার মুহূর্ত্তেকে করি উদ্‌ঘাটন
নির্ব্বারিত করি দেয় ত্রিলোকের গীতের ভাণ্ডার;
যামিনীর শান্তিবাণী ক্ষণমাত্রে অনন্ত সংসার
আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, বাক্যহীন পরম নিষেধ
বিশ্বকর্ম্ম-কোলাহল মন্ত্রবলে করি দিয়া ভেদ
নিমেষে নিবায়ে দেয় সর্ব্ব খেদ, সকল প্রয়াস,
জীবলোক-মাঝে আনে মরণের বিপুল আভাস;
নক্ষত্রের ধ্রুব ভাষা—অনির্ব্বাণ অনলের কণা—
জ্যোতিষ্কের সূচিপত্রে আপনার করিছে সূচনা
নিত্যকাল মহাকাশে; দক্ষিণের সমীরের ভাষা
কেবল নিশ্বাসমাত্রে নিকুঞ্জে জাগায় নব আশা,
দুর্গম পল্লব-দুর্গে অরণ্যের ঘন অন্তঃপুরে
নিমেষে প্রবেশ করে, নিয়ে যায় দূর হতে দূরে
যৌবনের জয়গান;—সেই মত প্রত্যক্ষ প্রকাশ
কোথা মানবের বাক্যে, কোথা সেই অনন্ত আভাস,

কোথা সেই অর্থভেদী অভ্রভেদী সঙ্গীত উচ্ছ্বাস,
আত্মবিদারণকারী মর্ম্মান্তিক মহান্ নিশ্বাস ?'
মানবের জীর্ণ বাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর,
অর্থের বন্ধন হ'তে নিয়ে তারে যাবে কিছু দূর
ভাবের স্বাধীন লোকে, পক্ষবান্ অশ্বরাজ-সম
উদ্দাম সুন্দর গতি,—সে আশ্বাসে ভাসে চিত্ত মম।
সূর্য্যেরে বহিয়া যথা ধায় বেগে দিব্য অগ্নিতরী
মহাব্যোম-নীলসিন্ধু প্রতিদিন পারাপার করি;
ছন্দ সেই অগ্নিসম বাক্যেরে করিব সমর্পণ,
যাবে চলি মর্ত্যসীমা অবাধে করিয়া সন্তরণ,
গুরুভার পৃথিবীরে টানিয়া লইবে উর্দ্ধপানে,
কথারে ভাবের স্বর্গে, মানবেরে দেবপীঠস্থানে।
মহাম্বুধি যেই মত ধ্বনিহীন স্তব্ধ ধরণীরে
বাঁধিয়াছে চতুর্দ্দিকে অন্তহীন নৃত্যগীতে ঘিরে,—
তেমনি আমার ছন্দ, ভাষারে ঘেরিয়া আলিঙ্গনে,
গাবে যুগে যুগান্তরে সকল গম্ভীর কলস্বনে
দিক্ হতে দিগন্তরে মহামানবের স্তবগান,—
ক্ষণস্থায়ী নরজন্মে মহৎ মর্য্যাদা করি দান।

"হে দেবর্ষি, দেবদূত, নিবেদিয়ো পিতামহ-পায়ে
স্বর্গ হ'তে যাহা এল স্বর্গে তাহা নিয়ো না ফিরায়ে।
দেবতার স্তবগীতে দেবেরে মানব করি' আনে,
তুলিব দেবতা করি' মানুষেরে মোর ছন্দে গানে।
ভগবন্, ত্রিভুবন তোমাদের প্রত্যক্ষে বিরাজে
কহ মোরে, কার নাম অমর বীণার ছন্দে বাজে।

কহ মোরে, বীর্য্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি' সুকঠিন ধর্ম্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মত,
মহৈশ্বর্য্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয়নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে ল'য়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম,—
কহ মোরে সর্ব্বদর্শী হে দেবর্ষি, তাঁর পুণ্যনাম।"
নারদ কহিলা ধীরে, "অযোধ্যার রঘুপতি রাম!"

"জানি আমি, জানি তাঁরে, শুনেছি তাঁহার কীর্ত্তিকথা,"
কহিলা বাল্মীকি, "তবু নাহি জানি সমগ্র বারতা,
সকল ঘটনা তাঁর—ইতিবৃত্ত রচিব কেমনে?
পাছে সত্যভ্রষ্ট হই, এই ভয় জাগে মোর মনে!"
নারদ কহিলা হাসি', "সেই সত্য, যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো!"
এত বলি' দেবদূত মিলাইল দিব্য-স্বপ্ন-হেন
সুদূর সপ্তর্ষিলোকে। বাল্মীকি বসিলা ধ্যানাসনে,
তমসা রহিল মৌন, স্তব্ধতা জাগিল তপোবনে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শা-জাহান

এ কথা জানিতে তুমি, ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান,
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান।
শুধু তব অন্তর-বেদনা
চিরন্তন হ'য়ে থাক্ সম্রাটের ছিল এ সাধনা।
রাজশক্তি বজ্র-সুকঠিন
সন্ধ্যারক্তরাগসম তন্দ্রা-তলে হয় হোক্ লীন,
কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস
নিত্যউচ্ছ্বসিত হ'য়ে সকরুণ করুক্ আকাশ
এই তব মনে ছিল আশ।
হীরামুক্তামাণিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা
যায় যদি লুপ্ত হ'য়ে যাক্,
শুধু থাক্
একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল ॥

হায় ওরে মানব-হৃদয়
বার বার
কারো পানে ফিরে চাহিবার
নাই যে সময়,
নাই নাই।

জীবনের খরস্রোতে ভাসিছ সদাই
ভুবনের ঘাটে ঘাটে।
এক হাটে লও বোঝা, শূন্য ক'রে দাও অন্য হাটে।

দক্ষিণের মন্ত্র-গুঞ্জরণে
তব কুঞ্জবনে
বসন্তের মাধবী-মঞ্জরী
যেই ক্ষণে দেয় ভরি'
মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল,
বিদায়-গোধূলি আসে ধূলায় ছড়ায়ে ছিন্নদল।
সময় যে নাই,
আবার শিশিররাত্রে তাই
নিকুঞ্জে ফুটায়ে তোল নব কুন্দরাজি
সাজাইতে হেমন্তের অশ্রুভরা আনন্দের সাজি।
হায় রে হৃদয়
তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।
নাই নাই, নাই যে সময়।

হে সম্রাট্, তাই তব শঙ্কিত হৃদয়
চেয়েছিল করিবারে সময়ের হৃদয় হরণ
সৌন্দর্য্যে ভুলায়ে।
কণ্ঠে তার কি মালা দুলায়ে
করিলে বরণ

রূপহীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে।
রহে না যে
বিলাপের অবকাশ
বারো মাস,
তাই তব অশান্ত ক্রন্দনে
চিরমৌন জাল দিয়ে বেঁধে দিলে কঠিন বন্ধনে॥

জ্যোৎস্নারাতে নিভৃত মন্দিরে
প্রেয়সীরে
যে নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে
সেই কাণে-কাণে ডাকা রেখে গেলে এইখানে
অনন্তের কাণে।

প্রেমের করুণ কোমলতা
ফুটিল তা
সৌন্দর্য্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে।
হে সম্রাট্ কবি,
এই তব হৃদয়ের ছবি,
এই তব নব মেঘদূত,
অপূর্ব্ব অদ্ভুত
ছন্দে গানে
উঠিয়াছে অলক্ষ্যের পানে
যেথা তব বিরহিণী প্রিয়া
র'য়েছে মিশিয়া

প্রভাতের অরুণ-আভাসে
ক্লান্ত-সন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিশ্বাসে,
পূর্ণিমায় দেহ-হীন চামেলির লাবণ্য-বিলাসে,
ভাষার অতীত তীরে
কাঙাল নয়ন যেথা দ্বার হ'তে আসে ফিরে ফিরে।

তোমার সৌন্দর্য্য-দূত যুগ যুগ ধরি'
এড়াইয়া কালের প্রহরী
চলিয়াছে বাক্যহারা এই বার্ত্তা নিয়া
"ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া॥"

চ'লে গেছ তুমি আজ,
মহারাজ,
রাজ্য তব স্বপ্নসম গেছে ছুটে,
সিংহাসন গেছে টুটে,
তব সৈন্যদল
যাদের চরণ-ভরে ধরণী করিত টলমল
তাদের স্মৃতি আজ বায়ু-ভরে
উড়ে যায় দিল্লীর পথের ধূলি-পরে।
বন্দীরা গাহে না গান,
যমুনা-কল্লোলসাথে নহবৎ মিলায় না তান

তব পুরসুন্দরীর নূপুর নিক্কণ
ভগ্ন প্রাসাদের কোণে
ম'রে গিয়ে ঝিল্লীস্বনে
কাঁদায় রে নিশার গগন।

তবুও তোমার দূত অমলিন,
শ্রান্তি-ক্লান্তি-হীন,
তুচ্ছ করি' রাজ্য ভাঙা-গড়া,
তুচ্ছ করি' জীবন মৃত্যুর ওঠা-পড়া,
যুগে যুগান্তরে
কহিতেছে একস্বরে
চিরবিরহীর বাণী নিয়া
"ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া॥"

মিথ্যা কথা, কে বলে যে ভোলো নাই।
কে বলে রে খোলো নাই
স্মৃতির পিঞ্জর দ্বার।
অতীতের চির অস্ত-অন্ধকার
আজো হৃদয় তব রেখেছে বাঁধিয়া,

বিস্মৃতির মুক্তিপথ দিয়া,
আজ কি সে হয়নি বাহির।
সমাধি-মন্দির

এক ঠাঁই রহে চিরস্থির,
ধরার ধূলায় থাকি'
স্মরণের আবরণে মরণেরে যত্নে রাখে ঢাকি'।

জীবনেরে কে রাখিতে পারে,
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্ব্বাচলে আলোকে আলোকে।

স্মরণের গ্রন্থি টুটে
সে যে যায় ছুটে
বিশ্বপথে বন্ধন-বিহীন।
মহারাজ, কোনো মহারাজ্য কোনোদিন
পারে নাই তোমারে ধরিতে।
সমুদ্রস্তনিত পৃথ্বী, হে বিরাট্, তোমারে ভরিতে
নাহি পারে,
তাই এ ধরারে
জীবন-উৎসব-শেষে দুই পায়ে ঠেলে
মৃৎপাত্রের মতো যাও ফেলে॥

তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ

পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্ত্তিরে তোমার

বারংবার।

তাই

চিহ্ন তব প'ড়ে আছে, তুমি হেথা নাই।

যে প্রেম সম্মুখপানে

চলিতে চালাতে নাহি জানে,

যে প্রেম পথের মধ্যে পেতেছিল নিজ সিংহাসন,

তার বিলাসের সম্ভাষণ

পথের ধূলার মতো জড়ায়ে ধ'রেছে তব পায়ে,

দিয়েছো তা' ধূলিরে ফিরায়ে।

সেই তব পশ্চাতের পদধূলি-পরে

তব চিত্ত হ'তে বায়ুভরে

কখন্ সহসা

উড়ে পড়েছিল বীজ জীবনের মাল্য হ'তে খসা।

তুমি চ'লে গেছ দূরে

সেই বীজ অমর অঙ্কুরে

উঠেছে অম্বরপানে,

কহিছে গম্ভীর গানে,

যত দূর চাই

নাই নাই সে পথিক নাই

প্রিয়া তারে রাখিল না, রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ,
রুধিল না সমুদ্র পর্ব্বত।
আজি তার রথ
চলিয়াছে রাত্রির আহ্বানে
নক্ষত্রের গানে
প্রভাতের সিংহদ্বার পানে।
তাই
স্মৃতি-ভারে আমি প'ড়ে আছি
ভারমুক্ত সে এখানে নাই॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাধনা

দেবি, অনেক ভক্ত এসেছে তোমার' চরণতলে
অনেক অর্ঘ্য 'আনি',
আমি অভাগ্য 'এনেছি বহিয়া' অশ্রুজলে
ব্যর্থ সাধন'খানি ।
তুমি জান মোর' মনের বাসনা,
যত সাধ ছিল 'সাধ্য ছিল না,
তবু বহিয়াছি 'কঠিন কামনা
দিবস-নিশি ।
মনে যাহা ছিল 'হ'য়ে গেল আর,
গড়িতে ভাঙিয়া 'গেল বার বার,
ভালয় মন্দ 'আলোয় আঁধার
গিয়েছে মিশি' ।
তবু ওগো, দেবি,' নিশিদিন করি' 'পরাণপণ,
চরণে দিতেছি 'আনি'
মোর জীবনের 'সকল শ্রেষ্ঠ 'সাধের ধন
ব্যর্থ সাধন'খানি ।

ওগো ব্যর্থ সাধনখানি
দেখিয়া হাসিছে সার্থকফল
সকল ভক্ত প্রাণী ।

তুমি যদি দেবি, পলকে কেবল
কর কটাক্ষ স্নেহ-স্বকোমল,
একটি বিন্দু ফেল' আঁখিজল
করুণা মানি'
সব হ'তে তবে সার্থক হবে
ব্যর্থ সাধনখানি ।

দেবি, আজি আসিয়াছে অনেক যন্ত্রী শুনাতে গান
অনেক যন্ত্র আনি' ।
আমি আনিয়াছি ছিন্নতন্ত্রী নীরব ম্লান
এই দীন বীণাখানি ।
তুমি জান ওগো করি নাই হেলা,
পথে প্রান্তরে করি নাই খেলা,
শুধু সাধিয়াছি বসি' সারাবেলা
শতেক বার ।
মনে যে গানের আছিল আভাস,
যে তান সাধিতে করেছিনু আশ,
সহিল না সেই কঠিন প্রয়াস,
ছিঁড়িল তার ।
স্তবহীন তাই রয়েছি দাঁড়ায়ে সারাটি খন,
আনিয়াছি গীতহীনা
আমার প্রাণের একটি যন্ত্র বুকের ধন
ছিন্নতন্ত্রী বীণা ।

ওগো ছিন্নতন্ত্রী বীণা
দেখিয়া তোমার গুণিজন সবে
হাসিছে করিয়া ঘৃণা।
তুমি যদি এরে লহ কোলে তুলি',
তোমার শ্রবণে উঠিবে আকুলি'
সকল অগীত সঙ্গীতগুলি,
হৃদয়াসীনা।
ছিল যা আশায় ফুটাবে ভাষায়
ছিন্নতন্ত্রী বীণা॥

দেবি, এ জীবনে আমি গাহিয়াছি বসি' অনেক গান,
পেয়েছি অনেক ফল ;
সে আমি সবারে বিশ্বজনারে করেছি দান,
ভরেছি ধরণীতল।
যার ভাল লাগে সেই নিয়ে যাক্,
যত দিন থাকে তত দিন থাক্,
যশ অপযশ কুড়ায়ে বেড়াক্
ধূলার মাঝে।
বলেছি যে কথা করেছি যে কাজ
আমার সে নয়, সবার সে আজ,
ফিরিছে ভ্রমিয়া সংসার-মাঝ
বিবিধ সাজে।

যা কিছু আমার আছে আপনার শ্রেষ্ঠধন
দিতেছি চরণে আসি'—
অকৃত কার্য্য, অকথিত বাণী, অগীত গান,
বিফল বাসনা-রাশি।

ওগো বিফল বাসনা-রাশি
হেরিয়া আজিকে ঘরে পরে সবে
হাসিছে হেলার হাসি।
তুমি যদি দেবি, লহ কর পাতি',
আপনার হাতে রাখ' মালা গাঁথি',
নিত্য নবীন রবে দিনরাতি
সুবাসে ভাসি',
সফল করিবে জীবন আমার
বিফল বাসনা-রাশি॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হতভাগ্যের গান

কিসের তরে অশ্রু ঝরে,
কিসের লাগি' দীর্ঘশ্বাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোরা পরিহাস।
রিক্ত যারা সর্ব্বহারা,
সর্ব্বজয়ী বিশ্বে তারা,
গর্ব্বময়ী ভাগ্যদেবীর
নয়কো তারা ক্রীতদাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোরা পরিহাস।

আমরা সুখের স্ফীত বুকের
ছায়ার তলে নাহি চরি।
আমরা দুখের বক্রমুখের
চক্র দেখে ভয় না করি।
ভগ্ন ঢাকে যথাসাধ্য
বাজিয়ে যাব জয়বাদ্য,
ছিন্ন আশার ধ্বজা তুলে'
ভিন্ন করব নীলাকাশ।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোরা পরিহাস।

হে অলক্ষ্মী, রুক্ষকেশী,
তুমি দেবি অচঞ্চলা।
তোমার রীতি সরল অতি
নাহি জান ছলাকলা।
জ্বালাও পেটে অগ্নিকণা
নাইক তাহে প্রতারণা,
টানো যখন মরণ-ফাঁসি
বলনাক মিষ্ট ভাষ।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোরা পরিহাস।

ধরার যারা সেরা সেরা
মানুষ তারা তোমার ঘরে!
তাদের কঠিন শয্যাখানি
তাই পেতেছ মোদের তরে।
আমরা বরপুত্র তব,
যাহাই দিবে তাহাই লব,
তোমায় দিব ধন্যধ্বনি
মাথায় বহি' সর্ব্বনাশ।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোরা পরিহাস।

যৌবরাজ্যে বসিয়ে দে মা
লক্ষ্মীছাড়ার সিংহাসনে
ভাঙা কুলোয় করুক পাখা
তোমার যত ভৃত্যগণে।
দগ্ধভালে প্রলয়শিখা
দিক্ মা এঁকে তোমার টীকা,
পরাও সজ্জা লজ্জাহারা
জীর্ণ কন্থা, ছিন্নবাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোরা পরিহাস॥

লুকোক্ তোমার ডঙ্কা শুনে
কপট সখার শূন্য হাসি।
পালাক্ ছুটে পুচ্ছ তুলে
মিথ্যা চাটু মক্কা কাশী।
আত্মপরের প্রভেদ-ভোলা
জীর্ণ দুয়োর নিত্য খোলা,
থাক্‌বে তুমি থাক্‌ব আমি
সমানভাবে বারো মাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোরা পরিহাস।

শঙ্কা তরাস লজ্জা সরম,
চুকিয়ে দিলেম স্তুতি-নিন্দে
ধূলো, সে তোর পায়ের ধূলো,
তাই মেখেছি ভক্তবৃন্দে।
আশারে কই, "ঠাকুরাণী,
তোমার খেলা অনেক জানি,
যাহার ভাগ্যে সকল ফাঁকি
তারেও ফাঁকি দিতে চাস।"
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোরা পরিহাস।

মৃত্যু যেদিন বল্‌বে "জাগো,
প্রভাত হ'ল তোমার রাতি,"—
নিবিয়ে যাব আমার ঘরের
চন্দ্র সূর্য্য দুটো বাতি।
আমরা দোঁহে ঘেঁষাঘেঁষি
চিরদিনের প্রতিবেশী,
বন্ধুভাবে কণ্ঠে সে মোর
জড়িয়ে দেবে বাহুপাশ,—
বিদায়কালে অদৃষ্টেরে
করে' যাব পরিহাস।

৺ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বধূ

"বেলা যে প'ড়ে এলো, জল্‌কে চল্‌,"—
পুরানো সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে,
কোথা সে-ছায়া সখি, কোথা সে-জল।
কোথা সে-বাঁধাঘাট, অশথ-তল।
ছিলাম আনমনে একেলা গৃহকোণে,
কে যেন ডাকিল রে "জল্‌কে চল্‌॥"

কলসী লয়ে কাঁখে পথ সে বাঁকা,
বামেতে মাঠ শুধু সদাই করে ধূধূ,
ডাহিনে বাঁশবন হেলায়ে শাখা।
দীঘির কালো জলে সাঁঝের আলো ঝলে,
দু'ধারে ঘন বন ছায়ায় ঢাকা।
গভীর থির নীরে ভাসিয়া যাই ধীরে,
পিক কুহরে তীরে অমিয়-মাখা।
পথে আসিতে ফিরে, আঁধার তরু-শিরে
সহসা দেখি চাঁদ আকাশে আঁকা॥

অশথ উঠিয়াছে প্রাচীর টুটি',
সেখানে ছুটিতাম সকালে উঠি'।
শরতে ধরাতল শিশিরে ঝলমল,
করবী থোলো থোলো র'য়েছে ফুটি'।

প্রাচীর বেয়ে বেয়ে সবুজে ফেলে ছেয়ে
বেগুনী ফুলে ভরা লতিকা দুটি।
ফাটলে দিয়ে আঁখি আড়ালে ব'সে থাকি,
আঁচল পদতলে পড়েছে লুটি' ॥

মাঠের পরে মাঠ, মাঠের শেষে
সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে।
এ-ধারে পুরাতন শ্যামল তালবন
সঘন সারি দিয়ে দাঁড়ায় ঘেঁসে।
বাঁধের জলরেখা ঝলসে, যায় দেখা,
জটলা করে তীরে রাখাল এসে।
চলেছে পথখানি কোথায় নাহি জানি,
কে জানে কত শত নূতন দেশে ॥

হায় রে রাজধানী পাষাণ-কায়া।
বিরাট্ মুঠিতলে চাপিছে দৃঢ়বলে
ব্যাকুল বালিকারে নাহিক মায়া!
কোথা সে খোলা-মাঠ, উদার পথঘাট
পাখীর গান কই, বনের ছায়া ॥

কে যেন চারি দিকে দাঁড়িয়ে আছে,
খুলিতে নারি মন শুনিবে পাছে।
হেথায় বৃথা কাঁদা, দেয়ালে পেয়ে বাধা
কাঁদন ফিরে আসে আপন কাছে।

আমার আঁখিজল কেহ না বোঝে।
অবাক্ হ'য়ে সবে কারণ খোঁজে।
"কিছুতে নাহি তোষ, এ ত বিষম দোষ,
গ্রাম্য বালিকার স্বভাব ও যে।
স্বজন প্রতিবেশী এত যে মেশামেশি
ও কেন কোণে ব'সে নয়ন বোজে ॥"

কেহ বা দেখে মুখ কেহ বা দেহ,
কেহ বা ভালো বলে, বলে না কেহ।
ফুলের মালাগাছি বিকাতে আসিয়াছি,
পরখ করে সবে, করে না স্নেহ ॥

সবার মাঝে আমি ফিরি একেলা।
কেমন ক'রে কাটে সারাটা বেলা।
ইটের 'পরে ইট, মাঝে মানুষ-কীট,
নাইকো ভালোবাসা নাইকো খেলা ॥

কোথায় আছ তুমি কোথায় মা গো,
কেমনে ভুলে তুই আছিস্ হাঁ গো।
উঠিলে নব শশী, ছাদের 'পরে বসি'
আর কি উপকথা বলিবি না গো।
হৃদয়-বেদনায় শূন্য বিছানায়
বুঝি মা, আঁখিজলে রজনী জাগো।
কুসুম তুলি' ল'য়ে প্রভাতে শিবালয়ে
প্রবাসী তনয়ার কুশল মাগো ॥

হেথাও ওঠে চাঁদ ছাদের পারে।
প্রবেশ মাগে আলো ঘরের দ্বারে।
আমারে খুঁজিতে সে ফিরিছে দেশে দেশে,
যেন সে ভালোবেসে চাহে আমারে।
নিমেষ তরে তাই আপনা ভুলি'
ব্যাকুল ছুটে' যাই দুয়ার খুলি'।
অমনি চারি ধারে নয়ন উঁকি মারে,
শাসন ছুটে আসে ঝটিকা তুলি'॥

দেবে না ভালোবাসা, দেবে না আলো।
সদাই মনে হয় আঁধার ছায়াময়
দীঘির সেই জল শীতল কালো,
তাহারি কোলে গিয়ে মরণ ভালো।
ডাক্ লো ডাক্ তোরা, বল্ লো বল্—
"বেলা যে প'ড়ে এলো, জল্‌কে চল্!"
কবে পড়িবে বেলা, ফুরাবে সব খেলা,
নিবাবে সব জ্বালা শীতল জল,
জানিস্ যদি কেহ আমায় বল্!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শঙ্খ

তোমার শঙ্খ ধূলায় প'ড়ে, কেমন ক'রে সইবো।
বাতাস আলো গেল' ম'রে এ কী রে দুর্দৈব।
লড়্‌বি কে আয় ধ্বজা বেয়ে,
গান আছে যার ওঠ্‌না গেয়ে,
চল্‌বি যারা চল্‌ রে ধেয়ে, আয় না রে নিঃশঙ্ক।
ধূলায় প'ড়ে রইলো চেয়ে ঐ যে অভয়শঙ্খ ॥

চলেছিলেম পূজার ঘরে সাজিয়ে ফুলের অর্ঘ্য।
খুঁজি সারাদিনের পরে কোথায় শান্তি-স্বর্গ।
এবার আমার হৃদয়-ক্ষত
ভেবেছিলেম হবে গত,
ধুয়ে মলিন চিহ্ন যত হব' নিষ্কলঙ্ক।
পথে দেখি ধূলায় নত তোমার মহাশঙ্খ ॥

আরতি-দীপ এই কি জ্বালা, এই কি আমার সন্ধ্যা,
গাঁথ্‌ব রক্ত-জবার মালা, হায় রজনীগন্ধা।
ভেবেছিলেম যোঝাযুঝি
মিটিয়ে পাব বিরাম খুঁজি,
চুকিয়ে দিয়ে ঋণের পুঁজি লব' তোমার অঙ্ক।
হেনকালে ডাক্‌লো বুঝি নীরব তব শঙ্খ ॥

যৌবনেরি পরশমণি করাও তবে স্পর্শ।
দীপক-তানে উঠুক্ ধ্বনি' দীপ্ত প্রাণের হর্ষ।
নিশার বক্ষ বিদার ক'রে
উদ্বোধনে গগন ভ'রে
অন্ধ দিকে দিগন্তরে জাগাও না আতঙ্ক।
দুই হাতে আজ তুল্‌বো ধ'রে তোমার জয়শঙ্খ।

জানি জানি তন্দ্রা মম রইবে না আর চক্ষে।
জানি শ্রাবণধারা সম বাণ বাজিবে বক্ষে।
কেউ বা ছুটে আস্‌বে পাশে,
কাঁদ্‌বে বা কেউ দীর্ঘশ্বাসে,
দুঃস্বপনে কাঁপ্‌বে ত্রাসে, সুপ্তির পর্য্যঙ্ক।
বাজ্‌বে যে আজ মহোল্লাসে তোমার মহাশঙ্খ॥

তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলেম শুধু লজ্জা।
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে পরাও রণ-সজ্জা।
ব্যাঘাত আসুক্ নব নব,
আঘাত খেয়ে অচল রব',
বক্ষে আমার দুঃখে, তব বাজ্‌বে জয়ডঙ্কা।
দেব' সকল শক্তি, ল'ব অভয় তব শঙ্খ॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গৃহী ও যোগী

"নয়নে আনন্দ-আলো, প্রশান্ত বদন,—
যোগিবর, কিসে হেন চিত্তবিনোদন ?
অতুল করুণা-উৎস দেবতা-প্রতিম
জনক না দেখি তব ; মমতা অসীম,
ক্ষীর-প্রস্রবণ-সম, হৃদে বহে যাঁর
সে জননী শক্তিময়ী না দেখি তোমার ;
জীবনে প্রথম বন্ধু, সমান-শোণিত,
সে সোদর নাহি তব আচরিতে হিত ;
না দেখি তোমার সখা, উদার হৃদয়
বিত্তের সহায়, আর চিত্তে বিনিময় ;
শরীরে চন্দনলেপ, নয়নে অমিয়া,
হৃদয়ে ত্রিদিবানন্দ, নাহি তব প্রিয়া ;
স্নেহের জমাটবাঁধা, প্রাণের সমান,
(দীপ হ'তে দীপ যথা), নাহিক সন্তান।"

যোগী কহে,—"কিসে চিত্তে সুখ নিরুপম ?—
আত্মতত্ত্বজ্ঞান পিতা ; মাতা মোর সত্য ;
সোদর আমার ধর্ম্ম ; দয়া, সখা মম ;
শান্তিই রমণী মোর ; ক্ষমা সে অপত্য।"

বরদাচরণ মিত্র

মা আমার

যেই দিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন,
হাসি, অশ্রু সেই দিন করিয়াছি বিসর্জ্জন।
হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর,
দুঃখিনী জনমভূমি—মা আমার, মা আমার।

অনল পুষিতে চাহি আপনার হিয়ামাঝে,
আপনারে অপরেরে নিয়োজিতে তব কাজে;
ছোটখাট সুখদুঃখ কে হিসাব রাখে তার,
তুমি যবে চাহ কাজ,—মা আমার, মা আমার।

অতীতের কথা কহি' বর্ত্তমান যদি যায়,
সে কথাও কহিব না, হৃদয়ে জপিব তায়,
গাহি যদি কোন গান, গাব তবে অনিবার:
'মরিব তোমারি তরে,'—মা আমার, মা আমার

মরিব তোমারি কাজে, বাঁচিব তোমারি তরে,
—নহিলে বিষাদময় এ জীবন কেবা ধরে?—
যত দিনে না ঘুচিবে তোমার কলঙ্কভার,
থাক্ প্রাণ, যাক্ প্রাণ,—মা আমার, মা আমার।

কামিনী রায়

সুখ

গিয়াছে ভাঙ্গিয়া সাধের বীণাটি,
ছিঁড়িয়া গিয়াছে মধুর তার,
গিয়াছে শুকায়ে সরস মুকুল ;
সকলি গিয়াছে—কি আছে আর ?

নিবিল অকালে আশার প্রদীপ,
ভেঙ্গে-চুরে গেল বাসনা যত,
ছুটিল অকালে সুখের স্বপন,
জীবন-মরণ একই মত !

হেরিনু সংসার মরীচিকাময়ী
মরুভূমি মত রয়েছে পড়ে',
বাসনা-পিয়াসে উন্মত্ত মানব
আশার ছলনে মরিছে পুড়ে' ।

লক্ষ তারা ভূমে খসিয়া পড়িল,
আঁধারে আলোক ডুবিয়া গেল,
তমস হেরিতে ফুটিল নয়ন,
ভাঙ্গিয়ে হৃদয় শতধা হ'ল ।

যাক্ যাক্ প্রাণ, নিবুক্ এ জ্বালা,
আয়, ভাঙ্গা বীণে, আবার গাই—
যাতনা—যাতনা—যাতনাই সার,
নরভাগ্যে সুখ কখনো নাই ।

বিষাদ, বিষাদ, সর্ব্বত্র বিষাদ,
নরভাগ্যে সুখ লিখিত নাই ;
কাঁদিবার তরে মানব-জীবন,
যত দিন বাঁচি কাঁদিয়া যাই।

নাই কিরে সুখ ? নাই কিরে সুখ ?
এ ধরা কি শুধু বিষাদময় ?
যাতনে জ্বলিয়া, কাঁদিয়া মরিতে
কেবলই কি নর জনম লয় ?

বল্ ছিন্ন বীণে, বল্ উচ্চৈঃস্বরে,—
না,—না,—না, মানবের তরে
আছে উচ্চ লক্ষ্য, সুখ উচ্চতর,
না সৃজিলা বিধি কাঁদাতে নরে।

কার্য্যক্ষেত্র অই প্রশস্ত পড়িয়া,
সমর-অঙ্গন সংসার এই,
যাও বীরবেশে কর গিয়ে রণ ;
যে জিনিবে, সুখ লভিবে সেই।

পরের কারণে স্বার্থে দিয়া বলি,
এ জীবন-মন সকলি দাও,
তার মত সুখ কোথাও কি আছে ?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।

পরের কারণে মরণেও সুখ,
'সুখ', 'সুখ' করি' কেঁদ না আর,
যতই কাঁদিবে, যতই ভাবিবে,
ততই বাড়িবে হৃদয়-ভার।

গেছে, যাক্ ভেঙ্গে সুখের স্বপন,
স্বপন অমন ভেঙ্গেই থাকে,
গেছে, যাক্ নিবে আলেয়ার আলো,
গৃহে এস, আর ঘুর না পাঁকে।

যাতনা! যাতনা! কিসেরি যাতনা?
বিষাদ এতই কিসেরি তরে?
যদিই বা থাকে, যখন তখন
কি কাজ জানায়ে জগৎ ভরে'?

লুকান' বিষাদ, আঁধার অমায়
মৃদুভাতি স্নিগ্ধ তারার মত,
সারাটি রজনী নীরবে নীরবে
ঢালে সুমধুর আলোক কত।

লুকান' বিষাদ মানব-হৃদয়ে
গম্ভীর নিশীথ-শান্তির প্রায়;—
দুরাশার ভেরী, নৈরাশ চীৎকার,
আকাঙ্ক্ষার রব ভাঙ্গে না তায়।

বিষাদ—বিষাদ—বিষাদ বলিয়ে
কেনই কাঁদিবে জীবন ভ'রে' ?
মানবের মন এত কি অসার ?
এতই সহজে নুইয়া পড়ে ?

সকলের মুখ হাসিভরা দেখে'
পার না মুছিতে নয়ন-ধার ?
পরহিতব্রতে পার না রাখিতে
চাপিয়া আপন বিষাদ-ভার ?

আপনারে লয়ে' বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী'পরে,—
সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে ।

কামিনী রায়

বঙ্গনারী

স্বাধীনে অধীন তুমি, অধীনে স্বাধীন !
স্বাধীনে অধীন, যথা করদ ভূপতি
এ জগতে—ছত্র, দণ্ড ঔজ্জ্বল্য-বিহীন
শোভে সাথে, কিন্তু সখি ! দেবতা যেমতি
ভক্তের হৃদি-মন্দিরে পূজা ও আরতি
পান নিত্য, বন্দিরূপে অধীনে স্বাধীন
এই গৃহ-অন্তঃপুরে তুমিও তেমতি ;
তব লাগি ধূপ-ধুনা জ্বলে নিশিদিন !
পাশ্চাত্ত্য ললনা-সম বিদ্যুৎ-বরণী
নহ তুমি ; নহে তব অবারিত গতি
সবজ্র বিদ্যুৎ-সম ; আদর্শ জননী,
সু-ভগিনী, গৃহলক্ষ্মী, তবু তুমি, সতি !
নারীত্ব হয়েছে, সখি, দেবত্বে বিলীন,—
অধীন কথার কথা, তুমি গো স্বাধীন !

দেবেন্দ্রনাথ সেন

বর্ষা-সুন্দরী

রাত-দিন ঝম্‌-ঝম
রাত-দিন টুপ্‌-টুপ,
কি সাজে সেজেছ, রাণী !
এ কি আজ অপরূপ !

আননে বিজলী-হাসি,
গলায় কদম-হার,
আঁচলে কেতকী-ছটা—
এ আবার কি বাহার!

শিখী নাচে, ভেকে গায়,
মেঘে গুরু গরজন,
বসুধা আনন্দভরে
কত করে আয়োজন !

ডুবেছে রবির ছবি,
ডুবেছে চাঁদিয়া তারা,
আকাশ গলিয়া পড়ে
তরল রজত-ধারা !

উথলিছে গঙ্গা, পদ্মা,
পরাণে ধরে না সুখ,
মরমে রয়েছে ছেয়ে
তোমারি স্নেহের মুখ !

রাত-দিন ঝম্‌-ঝম
রাত-দিন টুপ্‌-টুপ,
দেখেছি অনেকতর
দেখিনি ত এত রূপ !

জলদ বিজলী তা'রা
এ উহার কর ধরে'
চলেছে পিছল পথে,
পা যেন পড়ে না সরে' !

ভিজে গেল—ভেসে গেল—
ডুবে গেল ধরাখান,
গ'লে গেল, মেতে গেল
মানবের ক্ষুদ্র প্রাণ !

প্রকৃতি ঢেকেছে মুখ
শ্যামল সুন্দর বাসে,
চাহিলে তাহার পানে
কত-কি-যে মনে আসে !

জোছনার ফুল যারা
ফুটিবে বসন্ত-বা'য়,
আমি নিতি জেগে থাকি
বরিষার নীলিমায় !

প্রাণ গলে—মন গলে—
দিগন্ত অনন্ত গলে,
ব্রহ্মাণ্ড ডুবায়ে যেন
প্রেমের তুফান চলে !

কে যেন লুকিয়ে আছে,
সে যেন সুমুখে নাই ;
কারে যেন ডাকি নিতি
শত প্রাণ দিয়ে তাই !

সসীমে অসীমে আজ
হ'য়ে গেল মিশামিশি,
বুঝিনে আপন-পর
চিনিনে সে দিবানিশি !

শরৎ বসন্ত শীত
জানে শুধু হাসাহাসি,
বরিষা ! তোমারি বুকে
অনন্ত প্রেমের রাশি !

সাধে কি বেসেছি ভাল,
সাধে কি আপনা-ভুলে
দিয়েছি হৃদয়খানি
তোমারি চরণ-মূলে !

জোছনার ফুল যারা
ফুটিবে বসন্ত-বা'য়,
ঢালিব আমারি প্রাণ
বরিষার নীলিমায় !

সবি ত ডুবিছে, রাণী !
আমিও ডুবিয়া যাব,
চির-সাধনার ফল
তোমাতে ডুবিলে পাব ॥

মানকুমারী বসু

পিঞ্জর-মুক্ত

আর কেন বাঁধি তোরে—শিকল দিলাম খুলি'।
কত বর্ষ অনভ্যাসে উড়িতে গিয়াছে ভুলি',
ঝাপটি' পড়িল ভূমে, ভয়ে কাঁপে পাখা দুটি ;
পুত্র কন্যা দেয় তাড়া—করে ঘরে ছুটাছুটি।

ল'য়ে গেনু গৃহ-শিরে অতি সন্তর্পণে ধরি',
সর্ব্বাঙ্গে বুলানু কর কত না আদর করি' ;
ক্রমে সুস্থ, তুলি' গ্রীবা চাহিল আকাশ-পানে—
মুখরিত উপবন কূজনে গুঞ্জনে গানে।

স্ফুরিল কাকলী মুখে, সহসা উড়িল টিয়া—
উড়িছে হরিৎ-পক্ষে স্বর্ণ-রৌদ্র আলোড়িয়া।
কি আলোক, পরিপূর্ণ! কি বায়ু পাগল-করা!
প্রকৃতি মায়ের মত হাস্যমুখী মনোহরা!

ধায় ছাড়ি' গ্রাম, নদী ; দূর মাঠে যায় দেখা
দিগন্তে অরণ্য-শীর্ষ শ্যামল বঙ্কিম রেখা।
ল'য়ে শত শূন্য নীড় ডাকে ধরা অবিরত—
নীল স্থির নভস্তলে ভাসে ক্ষুদ্র মরকত।

চকিতে সরিল মেঘ—কোথা কিছু নাহি আর !
চকিতে ভাতিল মেঘে অমরার সিংহদ্বার !
ঝটিতি মিশিল বায়ে মিলনের কলধ্বনি—
ত্রিদিব পেয়েছে ফিরে' যেন তার হারামণি !

এই মৃত্যু—এই মুক্তি ! হে দেব, হে বিশ্বস্বামী !
আমিও ত বদ্ধজীব, আমিও ত মুক্তিকামী !
আমিও কি ফেলি' দেহ—বিস্ময়ে আতঙ্কহীন—
অসীম সৌন্দর্য্যে তব হইব আনন্দে লীন ?

অক্ষয়কুমার বড়াল

মানব-বন্দনা

১

সেই আদি-যুগে যবে অসহায় নর
নেত্র মেলি' ভবে,
চাহিয়া আকাশ-পানে—কারে ডেকেছিল,
দেবে, না মানবে ?
কাতর আহ্বান সেই মেঘে মেঘে উঠি'
লুটি' গ্রহে গ্রহে,
ফিরিয়া কি আসে নাই, না পেয়ে উত্তর,
ধরায় আগ্রহে ?
সেই ক্ষুব্ধ অন্ধকারে, মরুত-গর্জ্জনে,
কার অন্বেষণ ?
সে নহে বন্দনা-গীতি, ভয়ার্ত্ত—ক্ষুধার্ত্ত
খুঁজিছে স্বজন !

২

আরক্ত প্রভাত-সূর্য্য উদিল যখন
ভেদিয়া তিমিরে,
ধরিত্রী অরণ্যে ভরা, কর্দ্দমে পিচ্ছিল—
সলিলে শিশিরে।

শাখায় ঝাপটি' পাখা গরুড় চীৎকারে,
কাণ্ডে সর্পকুল ;
সম্মুখে শ্বাপদ-সঙ্ঘ বদন ব্যাদানি'
আছাড়ে লাঙ্গুল ;
দংশিছে দংশক গাত্রে, পদে সরীসৃপ,
শূন্যে শ্যেন উড়ে ;—
কে তাহারে উদ্ধারিল ? দেব, না মানব—
প্রস্তরে লগুড়ে ?

৩

শীর্ণ অবসন্ন দেহ, গতিশক্তি-হীন,
ক্ষুধায় অস্থির ;
কে দিল তুলিয়া মুখে স্বাদু পক্ক ফল,
পত্রপুটে নীর ?
কে দিল মুছায়ে অশ্রু ? কে বুলা'ল কর
সর্ব্বাঙ্গে আদরে ?
কে নব-পল্লবে দিল রচিয়া শয়ন
আপন গহ্বরে ?
দিল করে পুষ্পগুচ্ছ, শিরে পুষ্পলতা,
অতিথি-সৎকার ;
নিশীথে বিচিত্র স্বরে বিচিত্র ভাষায়
স্বপন-সঞ্চার !

৪

শৈশবে কাহার সাথে জলে স্থলে ভ্রমি'
শিকার-সন্ধান ?
কে শিখাল ধনুর্ব্বেদ, বহিত্র-চালনা,
চর্ম্ম-পরিধান ?
অর্দ্ধ-দগ্ধ মৃগমাংস কার সাথে বসি'
করিনু ভক্ষণ ?
কাষ্ঠে কাষ্ঠে অগ্নি জ্বালি' কার হস্ত ধরি'
কুন্দন নর্ত্তন ?
কে শিখাল শিলাস্তূপে, অশ্বত্থের মূলে
করিতে প্রণাম ?
কে শিখাল ঋতুভেদ, চন্দ্র-সূর্য্য-মেঘে
দেব-দেবী নাম ?

৫

কৈশোরে কাহার সনে মৃত্তিকা-কর্ষণে
হইনু বাহির ?
মধ্যাহ্নে কে দিল পাত্রে শালি-অন্ন ঢালি'
দধি দুগ্ধ ক্ষীর ?
সায়াহ্নে কুটীরচ্ছায়ে কার কণ্ঠ-সাথে
নিৱিদ্ উচ্চারি ?
কার আশীর্ব্বাদ ল'য়ে অগ্নি সাক্ষী করি'
হইনু সংসারী ?

কে দিল ঔষধি রোগে, ক্ষতে প্রলেপন—
স্নেহে অনুরাগে ?
কার ছন্দে—সোম-গন্ধে—ইন্দ্র অগ্নি বায়ু
নিল যজ্ঞ-ভাগে ?

৬

যৌবনে সাহায্যে কার নগর-পত্তন,
প্রাসাদ-নির্ম্মাণ ?
কার ঋক্ সাম যজুঃ, চরক সুশ্রুত,
সংহিতা পুরাণ ?
কে গঠিল দুর্গ, সেতু, পরিখা, প্রণালী,
পথ, ঘাট, মাঠ ?
কে আজ পৃথিবী-রাজ—জলে স্থলে ব্যোমে
কার রাজ্যপাট ?
পঞ্চভূত বশীভূত, প্রকৃতি উন্নীত,
কার জ্ঞানে বলে ?
ভুঞ্জিতে কাহার রাজ্য—জন্মিলেন হরি
মথুরা কোশলে ?

প্রবীণ সমাজ-পদে, আজি প্রৌঢ় আমি
জুড়ি' দুই কর,
নমি, হে বিবর্ত্ত-বুদ্ধি! বিদ্যুৎ-মোহন,

চরণে ঝটিকাগতি—ছুটিছ উধাও
দলি' নীহারিকা।
উদ্দীপ্ত তেজসনেত্র—হেরিছ নির্ভয়ে
সপ্তসূর্য্য-শিখা!
গ্রহে গ্রহে আবর্ত্তন—গভীর নিনাদ
শুনিছ শ্রবণে!
দোলে মহাকাল-কোলে অণু পরমাণু—
বুঝিছ স্পর্শনে!

৮

নমি, হে সার্থক-কাম! স্বরূপ তোমার
নিত্য অভিনব!
মর-দেহে নহ মর, অমর-অধিক
স্থৈর্য্য ধৈর্য্য তব!
ল'য়ে সলাঙ্গুল দেহ, স্থূলবুদ্ধি তুমি
জন্মিলে জগতে,—
শুষিলে সাগর শেষে, রসাইলে মরু,
উড়ালে পর্ব্বতে!
গঠিলে আপন মূর্ত্তি—দেবতা-লাঞ্ছন,
কালের পৃষ্ঠায়!
গড়িছ—ভাঙিছ তর্কে, দর্শনে, বিজ্ঞানে
আপন স্রষ্টায়!

৯

নমি, হে বিশ্বগ-ভাব! আজন্ম চঞ্চল,
বিচিত্র, বিপুল!
হেলিছ—দুলিছ সদা, পড়িছ আছাড়ি',
ভাঙ্গি' সীমা—কূল!
কি ঘর্ষণ—কি ধর্ষণ, লম্ফন—গর্জ্জন,
দ্বন্দ্ব—মহামার!
কে ডুবিল—কে উঠিল, নাহি দয়ামায়া,
নাহিক নিস্তার!
নাহি তৃপ্তি, নাহি শ্রান্তি, নাহি ভ্রান্তি ভয়!
কোথায়—কোথায়!
চিরদিন এক লক্ষ্য,—জীবন-বিকাশ
পরিপূর্ণতায়!

১০

নমি তোমা, নরদেব! কি গর্ব্বে গৌরবে
দাঁড়ায়েছ তুমি!
সর্ব্বাঙ্গে প্রভাত-রশ্মি, শিরে চূর্ণ মেঘ,
পদে শষ্পভূমি।
পশ্চাতে মন্দির-শ্রেণী, সুবর্ণ-কলস
ঝলসে কিরণে;
বালকণ্ঠ-সমুত্থিত নবীন উদ্‌গীথ
গগনে পবনে

হৃদয়-স্পন্দন-সনে ঘুরিছে জগৎ,
চলিছে সময় ;
ভ্রূভঙ্গে—ফিরিছে সঙ্গে—ক্রম ব্যতিক্রম,
উদয় বিলয় !

১১

নমি আমি প্রতিজনে,—আদ্বিজ-চণ্ডাল,
প্রভু ক্রীতদাস !
সিন্ধুমূলে জলবিন্দু, বিশ্বমূলে অণু,
সমগ্রে প্রকাশ !
নমি, কৃষি-তন্তু-জীবী, স্থপতি, তক্ষণ,
কর্ম্ম-চর্ম্ম-কার !
অদ্রিতলে শিলাখণ্ড—দৃষ্টি-অগোচরে
বহ অদ্রি-ভার !
কত রাজ্য, কত রাজা গড়িছ নীরবে
হে পূজ্য, হে প্রিয় !
একত্বে বরেণ্য তুমি, শরণ্য এককে,—
আত্মার আত্মীয় !

অক্ষয়কুমার বড়াল

দেবতা-ভিখারী

ও কে, গান গেয়ে গেয়ে চ'লে যায়
পথে পথে ঐ নদীয়ায় !
ও কে, নেচে নেচে চলে, মুখে 'হরি' বলে
চ'লে চ'লে পাগলেরই প্রায় ।

ও কে, যায় নেচে নেচে, আপনায় বেচে,
পথে পথে শুধু প্রেম যেচে যেচে,
ও কে, দেবতা-ভিখারী মানব-দুয়ারে
দেখে যা রে তোরা দেখে যা ।

(ও সে) বলে 'কৈ ত কেউ পর নাই,'
(ও সে) বলে 'সবাই যে নিজ ভাই,'
(ও সে) বলে 'শুধু হেসে, শুধু ভালবেসে
(আমি) ভ্রমি দেশে দেশে—এই চাই ।'

ও কে, প্রেমে মাতোয়ারা, চোখে বহে ধারা,
কেঁদে কেঁদে সারা, কেন ভাই ?
সব দ্বেষ-হিংসা ছুটি' আসি' পড়ে লুটি'
(ও তার) ধূলি-মাখা দু'টি রাঙা পায় ।

বলে, 'ছেড়ে দাও মোদের, মোরা চ'লে যাই ;
নৈলে, প্রভু, তোমার প্রেমে গ'লে যাই !
এ যে, নূতন মধুর প্রণয়েরই পুর
হেথা আমাদের কোথা ঠাঁই ?'

(ঐ যে) নরনারী সব পিছে ধায়,
(ওই প্রতিধ্বনি ওঠে নীলিমায় ;
(তোরা) আয় সবে চ'লে, মুখে 'হরি' ব'লে,
(তোদের ছেঁড়াপুঁথি ফেলে চ'লে আয় ।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

মেবার-পতন

১

ভেঙ্গে গেছে মোর স্বপ্নের ঘোর,
ছিঁড়ে গেছে মোর বীণার তার ;
এ মহাশ্মশানে ভগ্ন পরাণে
আজি, মা, কি গান গাহিব আর
মেবার পাহাড় হইতে তাহার
নেমে গেছে এক গরিমা, হায় ;
ঘন মেঘরাশ ঘেরিয়া আকাশ
হানিয়া তড়িৎ চলিয়া যায় !

মেবার পাহাড়—শিখরে তাহার
রক্ত নিশান উড়ে না আর !
এ হীন সজ্জা, এ ঘোর লজ্জা
ঢেকে দে গভীর অন্ধকার !

২

গাহে নাকো আর কুঞ্জে তাহার
পিকবর আজ হরষ-গান ;
ফোটে নাকো ফুল, আসে না আকুল
ভ্রমর করিতে সে মধুপান !

আর নাহি বয় শিহরি' মলয় ;

আর নাহি হাসে আকাশে চাঁদ ;

মেবার নদীর ম্লান দু'টি তীর

করে নাকো আর সে কলনাদ !

মেবার পাহাড়—শিখরে তাহার·

৩

মেবারের বন বিষাদ-মগন ;

আঁধার বিজন নগর গ্রাম ;

পুরবাসী সব মলিন নীরব ;

বিষাদ-মগন সকল ধাম !

নাহি করে আর খর তরবার

আস্ফালন সে মেবার-বীর ;

নাহি আর হাসি, ম্লান রূপরাশি

ত্রস্ত মেবার সুন্দরী॰

মেবার পাহাড়—শিখরে তাহার·

৪

এ ঘন আঁধার ! কিবা আছে তার !

সান্ত্বনা আর কে করে দান,

চারণ কবির বিনা সে গভীর

অতীত মেবার মহিমা-গান !

গেছে যদি সব সুখ-কলরব,
অতীতের বাণী বাঁচিয়া থাক,
চারণের মুখে সান্ত্বনা সুখে
শূন্য মেবারে ধ্বনিয়া যাক !

মেবার পাহাড়—শিখরে তাহার............

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

সেথা আমি কি গাহিব গান

সেথা আমি কি গাহিব গান ?

যেথা, গভীর ওঙ্কারে, সামঝঙ্কারে
কাঁপিত দূর বিমান।

যেথা, স্বরসপ্তকে বাঁধিয়া বীণা,
বাণী শুভ্রকমলাসীনা,
রোধি' তটিনী-জল-প্রবাহ,
তুলিত মোহন তান।

যেথা, আলোড়ি' চন্দ্রালোক শারদ,
করি' হরিগুণ গান নারদ,
মন্ত্রমুগ্ধ করিত ভুবন,
টলাইত ভগবান্।

যেথা, যোগীশ্বর-পুণ্যপরশে,
মূর্ত্ত রাগ উদিল হরষে ;
মুগ্ধ কমলাকান্ত-চরণে
জাহ্নবী জনম পান।

যেথা, বৃন্দাবন-কেলিকুঞ্জে,
মুরলী-রবে পুঞ্জে পুঞ্জে,
পুলকে শিহরি' ফুটিত কুসুম,
যমুনা যেত উজান।

আর কি ভারতে আছে সে যন্ত্র,
আর কি আছে সে মোহন মন্ত্র,
আর কি আছে সে মধুর কণ্ঠ,
আর কি আছে সে প্রাণ ?

রজনীকান্ত সেন

সৃষ্টির বিশালতা

লক্ষ লক্ষ সৌর জগত
নীল-গগন-গর্ভে,
তীব্রবেগ, ভীমমূর্ত্তি
ভ্রমিছে মত্ত গর্ব্বে।
কোটি কোটি, তীক্ষ্ণ-উগ্র
অনল-পিণ্ড-তারা
দৃপ্তনাদে, ঝলকে ঝলকে,
উগরে অনল-ধারা।
এ বিশাল দৃশ্য, যাঁর
প্রকটে শক্তি-বিন্দু—
নমি সে সর্ব্ব-শক্তিমান,
চির-কারণ-সিন্ধু!

রজনীকান্ত সেন

সাগর-সঙ্গীত

আজি মেঘপূর্ণ দিন, ধূসর আঁধার!
তরঙ্গ তরঙ্গ'পরে ঝাঁপায়ে পড়িছে
অশ্রান্ত বেদনা-ভরে ছুলিছে ফুলিছে,
কাঁপিছে গর্জ্জিছে যেন মহা হাহাকার!—
আজি যে আকাশভরা ধূসর আঁধার!

আজি যে বক্ষের মাঝে মহা হাহাকার!
একি সুখ? একি দুঃখ? প্রণয় গভীর
একি? উত্তাল, উন্মাদ, অশান্ত অধীর!
কি গাহিছে, কি চাহিছে হৃদয় আমার?
আজি যে আকাশভরা ধূসর আঁধার!

আজি যে আঁধারভরা তোমার আকাশ।
আজি যে পাগল-করা তোমার বাতাস!
আজি যে ফেলেছে ছায়া প্রলয়-তুফান
তোমার আঁধার বুকে! আজি তব গান
অন্তহীন দিশাহারা, উন্মাদের মত
আমার হৃদয়তলে গরজে সতত।

তবে এস, ভেসে এস, উন্মাদ আমার!
খুলিয়া রেখেছি বক্ষ আঁধারে তোমার।
ভাসিব, ডুবিব, আজ প্রলয় আভাসে,
মরণ-আঁধার ভরা আকাশে বাতাসে!

ঘন ঘোর ঝঞ্ঝা-বায়ু আঁধার পরশে,
ভীষণ-ভৈরব একি প্রলয় বরষে !

লক্ষ লক্ষ দানবের বিকট চীৎকারে
মন্দ্রিছে মরণ-গীতি অনন্ত আঁধারে !
অনন্ত এ প্রভঞ্জন মোর বক্ষ ভরি',
ছিন্ন-পাল ভগ্ন-হাল ডুবে মন তরী !
প্রলয়-পয়োধি-জলে মরণের পারে
আশ্রয়-বিহীন প্রাণ অনন্ত আধারে
এস তবে মৃত্যুরূপে ওগো সিন্ধুরাজ
অবারিত বক্ষ মাঝে তুমি রবে আ

অন্তর্য্যামী

যখনি দেখিতে নারি, অন্ধকার আসে,
পথ খুঁজে মরে প্রাণ, তারি চারি পাশে !
কোথা হ'তে জ্বাল দীপ, সম্মুখে তাহার ?
নয়নে দরশ আসে, চলে সে আবার !
যখনি হৃদয়-যন্ত্রে ছিঁড়ে যায় তার,
সুরহীন হ'য়ে আসে সঙ্গীতের ধার—
কোথা হ'তে অলক্ষিতে তুমি দাও সুর ?
মহান্ সঙ্গীতে হয় প্রাণ ভরপুর !

চিত্তরঞ্জন দাশ

জীবন-প্রভাত

শীতের কুয়াসাজালে আচ্ছন্ন জীবন,
অন্ধ আঁখি মোহ-আবরণে।
চলেছে কালের স্রোতে ভাসিয়া পরাণ,
পথহারা পথ নাহি জানে।
অসীম অনন্তে ধায় কত আশা ল'য়ে,
হেথা হোথা খুঁজিতেছে পথ।
সংসার ফিরিছে পিছে শিকল লইয়ে,
আঁখি মেলি' হেরিছে জগৎ!

এখনো গাহেনি পাখী, উঠে নাই রবি,
কুয়াসায় আঁধার গগন।
এখনো সকলি যেন ঘেরা-ঘোরা ছবি,
যেন হেরে নিশীথ-স্বপন।
একটি তারকা শুধু চেয়ে' ধরা পানে,
মুমূর্ষুর অশ্রুজল প্রায়।
সঙ্গীহারা চেয়ে' আছে আকুল নয়নে,
ওই বুঝি নিভে যায় যায়!

সম্মুখে সংসার-চিত্র হেরিছে নয়ানে,
অন্তরেতে স্বরগের ছায়া।
কে বেঁধে রেখেছে তার অবশ পরাণে
কার বল' এ মোহিনী মায়া?
যত খুলিবারে চাই রাখিতেছে ধ'রে,
ধূলিজালে ঢাকিছে নয়ান!
আকুল নিশ্বাস তার পরশিছে মোরে,
মূরছিয়া পড়িছে পরাণ!

যত আমি ছুটে যাই পিছু পিছু ধায়—
জেগে' যেন দিতেছে পাহারা;
পারে না পরাণ আর বহিতে গো, হায়!
তারি মাঝে হয় আত্মহারা।
ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, বেঁধো নাক' আর
অসীমেতে যেতে দাও মোরে।
নয়নে স্বরগ-ছবি জাগিছে আমার,
বেঁধো নাক' আর ধূলি-ডোরে!

একি হায়! কেন মোরে এনেছ হেথায়?
কোথা যাব নাহি জানি পথ!
সম্মুখে গরজি' সিন্ধু পড়িছে বেলায়,
তপ্ত মরু রয়েছে পশ্চাৎ।

উপরে রয়েছে চেয়ে' অসীম আকাশ,
কোথা যাব, বল গো, কোথায় ?
সমীর বহে না হেথা, পড়ে না নিশ্বাস,
পরাণ করিছে হায় হায় !

সম্মুখে রয়েছে সিন্ধু, শ্যাম উপকূলে
কি করিব থাকি' হায় বসে' ।
প্রভাত হয় গো যদি কভু হায় ভুলে,
যদি কেহ এইখানে আসে !
কাজ নাই প্রভাতে গো, ভাঙুক স্বপন ;
সম্মুখে গরজে পারাবার !
পড়িব তাহাতে আজ মুদিয়া নয়ন,
হবে যাহা আছে গো হবার !

সরোজকুমারী দেবী

মেঘের দল

মেঘেরা দল বেঁধে যায় কোন্ দেশে,
—ও আকাশ বল্ আমারে।
কেউ বা রঙীন ওড়্না গায়ে, কেউ সাদা, কেউ নীল বেশে।

তারা কোন্ যমুনার নীরে ভর্‌বে গাগরী,
কার বাঁশরী শুন্‌ল এরা সাগর-নাগরী, মরি মরি!
তারা বাজিয়ে নূপুর ঝুমুর ঝুমুর, যায় চ'লে কার উদ্দেশে?
—ও আকাশ বল্ আমারে।

কভু বাজিয়ে ডমরু তারা উল্লাসে নাচে,
কভু ভানুর সনে খেলে হোলি, প্রভাতে সাঁঝে, মরি মরি!
তারা বিধুর সনে কি কথা কয় উজ্জ্বল মধুর হেসে!
—ও আকাশ বল্ আমারে।

আকাশ বল্‌রে আমায় বল্, আমার আঁখি-জল
তাদের মত জীবনখানি কর্‌বে কি শ্যামল—আমায় বল্ রে।
(আমি তাদের মত) আমার বঁধুর সনে মধুর খেলা,
খেল্‌ব কি দিনের শেষে?
—ও আকাশ বল্ আমারে।

অতুলপ্রসাদ সেন

জীবন-মাধুরী

ধন্য হয় মানবের মানব-জীবন
জাগে যবে বিশ্বরঙ্গ-মাঝে,
চৌদিকে অপার সিন্ধু থাকে তরঙ্গিতে,
তার মাঝে ধায় শত কাজে।

অনন্ত-কল্যাণময় লোকহিতব্রত
মহাগর্ব্বে বহি' চলে শিরে,
পদে পদে বাধা আসি' করে পরাহত,
আত্ম-বলে সে যে উঠে ফিরে

সাথে থাকি জ্বলে নিত্য সুকৃতি সম্বল
অন্ধকারে মাণিকের মত,
একটি অতুল রত্ন, অমল উজ্জ্বল,
চারি দিকে দৈন্য শত শত।

বেড়ে যায় পুণ্যবল, ঘৃণা হয় পাপে,
ক্ষুদ্র সুখ করে পলায়ন,
গভীর গম্ভীর শান্তি সকল সন্তাপে
পাতি দেয় সুস্নিগ্ধ শয়ন।

চঞ্চলা সৌভাগ্য-লক্ষ্মী বাঁধা র'ন পাশে,
চিরদিন প্রেয়সীর প্রায়,
সিদ্ধি যত হ'তে থাকে, সাধ তত আসে
নব নব বিপুল আশায়।

স্বর্গ হ'তে নামে জ্যোতি, মানস আসনে
বিরাজেন কমল-আসীনা!
ভক্ত-হস্তে দেন তুলি' আপনি যতনে
অনাদৃত গীতহীন বীণা।

যত কিছু ফোটে তাহে মূর্ত্ত মহিমায়,
অমর অপূর্ব্ব ধ্বনি সব,
সুমেরু-শিখর-চূড়ে উঠিবারে চায়
মহোৎসাহে মর্ত্ত্যের মানব!

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

সাধনা

বক্ষে তব বক্ষ দিয়ে শুয়ে আছি আমি,
হে ধরিত্রি, জীবধাত্রি! নিত্য দিনযামি
মাতৃহৃদয়ের মোর ব্যাকুল স্পন্দন
প্রবাসী সন্তান লাগি', নিয়ত ক্রন্দন
তারি লুপ্ত স্পর্শ তরে, করি' দাও লয়
বিপুল বক্ষের তব মহা শব্দময়
অনন্ত স্পন্দন-মাঝে; শিখাও আমায়
সে পুণ্য-রহস্য-মন্ত্র—যার মহিমায়
প্রত্যেক নিমেষে সহি বিয়োগ-বেদন
লক্ষ কোটী সন্তানের, প্রশান্তবদন!
তবু ফুটাতেছ ফুল, জ্বালিছ আলোক
উজলিয়া রাত্রিদিন দ্যুলোক ভূলোক!

প্রিয়ংবদা দেবী

শ্রীক্ষেত্রে

ভো মহার্ণব, নীল-ভৈরব,
গর্জ্জদ্-জলভঙ্গে
দূর অম্বুদ-মন্দ্র-সমান
তুলিতেছ কার বন্দনা-গান ?
জগৎ-জাগান' উদ্বোধনের
দুন্দুভি বাজে রঙ্গে।

নীল-কণ্ঠের বিরাট্ পিনাক
টঙ্কারে অহোরাত্র,—
আজো কি ভোলনি মন্থন-রোল,
দেব-দানবের উন্মাদ-দোল ?
ইন্দিরা আজি উঠিবেন বুঝি
ঝরিবে অমৃতপাত্র !

দাঁড়ায়ে তোমার বেলা-বালুকায়,
হেরি বিহ্বল চিত্তে,
যোজনান্তরে গগন-সীমায়
ঢলিয়া পড়েছ মহানীলিমায়,
তরলোজ্জ্বল ফেনিলোচ্ছল
পন্নগ-ফণ-নৃত্যে।

হে দুর্নিবার, মুক্ত-উদার,
হে পূর্ণ, অফুরন্ত,
চেয়ে' চেয়ে' ঐ বিপুল উরসে,
অসীমের ভাষা অন্তরে পশে,
হেরি' নেপথ্যে অন্তবিহীন
কল্পলোকের পন্থ।

খেলিছ এমনি লীলা-উদ্বেল,
অমলিন-মণি-দীপ্ত,
কত না ভাবুক তব পাশে আসি'
এমনি হরষে আলোড়ি' উছাসি'
সঁপেছে তোমারে অনঘ অর্ঘ্য,
বিভোর অপরিতৃপ্ত।

এই সেই পুরী, এইখানে ডোবে
নবদ্বীপের চন্দ্র,
তীর্থে তীর্থে ঘুরি' অবশেষে
উদাসীন প্রাণে এইখানে এসে
সমাহিত ওই নীল অনন্তে
ভুঞ্জিতে ভূমানন্দ।

জগ-জনে তিনি দিয়াছেন কোল,
কেহ নাই অস্পৃশ্য,
হোক্ না সে দ্বিজ, হোক্ চণ্ডাল,
বিশ্বের স্রোতে ক্ষুদ্র, বিশাল,
সবারে সাদরে আলিঙ্গে কাল,—
বর্জ্জনে প্রেম নিঃস্ব ।

একদা জগদ্গুরু শঙ্কর
ভারতের বুধবৃন্দে,
নিষ্প্রভ করি' মনীষা-কিরণে
এইখানে আসি' তৃতীয়-নয়নে
নেহারিয়াছেন মহামানবের
মিলনের অরবিন্দে ।

ধন্য এখানে মানব-আত্মা
পূজি' শাশ্বত-সত্যে,
একাকার হেথা অখিল ধর্ম্ম,
টুটি' বিচারের কঠিন বর্ম্ম,—
সব ব্যবধান ডুবে গেছে ওই
পাবন সলিলাবর্ত্তে ।

কবীর নানক হরিদাস হেথা
অবিনাশ বাক্-ছন্দে
উদ্বোধিলেন শুভ আহ্বানে
চির-মুমুক্ষু মানবের প্রাণে,
লভি' সাধনায় মধুমান্ সেই
ধ্রুব সচ্চিদানন্দে।

এই শ্রীক্ষেত্রে লুটাও, ভক্ত,
অভিমান হোক্ চূর্ণ,
হউক নিরাস ভেদ-জ্ঞান-ভ্রম,
জগন্নিধান পুরুষোত্তম,
নীলমাধবের চরণোপান্তে
হোক্ মনোরথ পূর্ণ।

ভো মহার্ণব, ভীম-ভৈরব,
উত্তাল লীলাভঙ্গে
গর্জ্জি' মেঘের মন্দ্র-সমান,
গাও,—গাও তাঁরি বন্দনা-গান,
রাত্রিন্দিব মাঙ্গলিকের
ওঙ্কারধ্বনি-সঙ্গে।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

শবরীর প্রতীক্ষা

পম্পাসরোবরতীরে সূর্য্যদেব অস্ত যান ধীরে,
বুলায়ে আরক্তকর ক্লান্ত তপ্ত ধরণীর শিরে
শান্তির আশিসে ভরা। ধূসর তরল অন্ধকারে
ছেয়ে আসে জল-স্থল-অন্তরীক্ষ অস্পষ্ট আকারে।
চাহিয়া ঈর্ষ্যার দৃষ্টি স্ফুটমান কুমুদের পানে
পরিপ্রান্ত পদ্মদল মুদে আঁখি রুদ্ধ অভিমানে।
তীরাস্তৃত শৈবালের শ্যামায়িত স্বচ্ছ অবকাশে
হংস-কারণ্ডব-দলে বিশ্রামের সাড়া পড়ে' আসে
আতৃপ্ত গদ্‌গদকণ্ঠে, বিধুনিত সিক্ত পক্ষপুটে;
শষ্পগন্ধে ঝিল্লীচ্ছন্দে সন্ধ্যাকাশ পূর্ণ হয়ে উঠে।

মতঙ্গের তপোবনে সান্ধ্য হোম হয়ে এল শেষ
উদাত্ত গম্ভীর মন্ত্রে। ধীরে করি নয়ন-উন্মেষ
উঠিলা তপস্বিবর মন্দ পদে ছাড়ি দর্ভাসন,
যেথা দ্বার-প্রান্তদেশে নতজানু মুদ্রিত নয়ন
বসিয়া শ্রমণীবালা যুক্তকরে মৃত্তিকার 'পর;
কহিলা উদার কণ্ঠে—"বৎসে, আজি লব অবসর
এ বারের জীবজন্মে, ত্যজি' দেহ সমাধি-আসনে।
ইহ জগতের চিন্তা কিছু আর নাহি আজি মনে
তোমার মঙ্গল ছাড়া; অনাথিনী শবরকুমারী

আশ্রিত আশ্রমে মোর, জানি তুমি সত্যের ভিখারী।
(ঈষৎ থামিয়া) কি ভাবিছ মৌনমুখে ?"

শবরী। কি ভাবিব ? কিবা আছে আর ?
প্রভু, পিতা, এ জগতে কি আমার আছে বা চিন্তার !
সবই সুবিজ্ঞাত তব—চিন্তা, চেষ্টা, স্মরণ, মনন,—
যে দিন ও-পাদপদ্মে পতিতেরে দিয়াছ শরণ
আপনার কন্যা বলি', ইষ্টমন্ত্র সঁপি' তার কাণে ;
আজন্ম দুর্ভাগা এই গৃহহীন অনার্য্য সন্তানে
পালিয়াছ শিষ্যারূপে পবিত্র এ তপোবনবাসে।
এক প্রশ্ন, তবু দেব, আজ্ঞা কর, মনে যাহা আসে,
কোন্ অপরাধে, প্রভু, অপরাধী আজি ও-চরণে,
হেন সুদুঃসহবাণী যার লাগি' শুনিনু শ্রবণে—
মৃত্যুসম গণি যাহা ?

মতঙ্গ। অপরাধ ? নহে অপরাধ !
শান্ত হও, বৎসে, তুমি। অনর্থক না গণ প্রমাদ—
যথার্থ এ উক্তি শুনি'। চিত্ত তব পবিত্র নির্ম্মল
সর্ব্বদোষলেশহীন। তথাপি এ সঙ্কল্প নিশ্চল—
ত্যজিব এ দেহবাস আপনারি অভিপ্রায়ক্রমে।
বারংবার বলিয়াছি,—মৃত্যুরে ভেব না শেষ ভ্রমে।
অনিত্য এ দেহমায়া ! তোমারে জানাই আশীর্ব্বাদ-
পূর্ণ হোক্ ইষ্ট তব, সিদ্ধ হোক্ সাধনার সাধ।

সত্যের প্রতীক্ষা কর জীবনের অনুভূতি-মাঝে
নিষ্ঠায় বাঁধিয়া বক্ষ।

শবরী। পিতা, পিতা, কিছু জানি না যে।
কে দিবে আমারে স্থান? কোথা যাব ছাড়ি' তপোবন?

মতঙ্গ। বৎসে, এ আশ্রমভূমি তোমারে করিনু সমর্পণ;
আজি হ'তে সর্ব্বকার্য্যে তোমারে সঁপিনু অধিকার,
যোগ্যহস্তে শুদ্ধচিত্তে যদি তুমি পাল' এই ভার,
ধরি' তব সিদ্ধিরূপ মর্ত্ত্যে যিনি মূর্ত্ত নারায়ণ,
সেই রামচন্দ্র তব আশ্রমে দিবেন দরশন।
স্পর্শে যাঁর সঞ্জীবিত অভিশপ্ত অহল্যার প্রাণ,
অস্পৃশ্য নিষাদে যিনি সখ্যে বাঁধি' বক্ষে দেন স্থান,
অরণ্যের শাখামৃগ যাঁর প্রেমে বন্ধু প্রিয়তম,—
সেই রামচন্দ্র হেথা আসিবেন, শুন বাক্য মম;
প্রতীক্ষা করহ তাঁর। শিবমস্তু, আসন্ন সময়।
(ধীরপদে অন্তর্ধান)

শবরী। পিতা, পিতা!
(ভূমিতে অবলুণ্ঠিত প্রণাম ও উত্থান)
রামচন্দ্র, রামচন্দ্র! সেই দয়াময়
আসিবেন এ আশ্রমে? হেন ভাগ্য কবে হবে তার?
সাক্ষাৎ মিলিবে চক্ষে মর্ত্ত্যরূপে জগৎপিতার!
শান্ত হ' সন্দিগ্ধ মন! মিথ্যা নহে মতঙ্গের বাণী,
সত্যদ্রষ্টা ঋষিকণ্ঠ অসত্য না কহে কভু জানি।